১০ই নভেম্বর স্মরণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৫তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস
পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নসহ জুম্ম জাতির অস্তিত্ব সুরক্ষায় এগিয়ে আসুন
শোক র‍্যালী ও স্মরণ সভা
জেলা শিল্পকলা একাডেমি, রাঙ্গামাটি ■ ১০ নভেম্বর ২০১৮ ইংরেজি
সভাপতিঃ কিশোর কুমার চাকমা, সহ-সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি।
আয়োজনেঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৫তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস
পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নসহ জুম্ম জাতির অস্তিত্ব সুরক্ষায় এগিয়ে আসুন
শোক র‍্যালী ও স্মরণ সভা
জেলা শিল্পকলা একাডেমি, রাঙ্গামাটি ■ ১০ নভেম্বর ২০১৮ ইংরেজি
সভাপতিঃ কিশোর কুমার চাকমা, সহ-সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি।
আয়োজনেঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪

প্রবন্ধ: ৪-৫১

এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা– সজীব চাকমা ০৫

এম এন লারমার চিন্তাধারা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা– শেকড় ত্রিপুরা ১০

বৃহৎ বাঁধের বিরুদ্ধে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রশ্নটা কী?– পাভেল পার্থ ১৯

১০ই নভেম্বর: এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা –বাচ্চু চাকমা ২২

শহীদ অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত)– সত্যবীর দেওয়ান ২৭

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনউচ্ছেদ: কাপ্তাই বাঁধের সমকালীন এক অজানা গবেষণা– প্রধীর তালুকদার ৩০

অস্তিত্ব বিধ্বংসী উন্নয়নের চেয়ে উন্নয়নহীন অস্তিত্ব অনেক ভালো– লেলুং খুমী ৩৫

পার্বত্য সীমান্তে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা: মিথ ও বাস্তবতা– ধীমান ওয়াংঝা ৩৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আশু করণীয়– মঙ্গল কুমার চাকমা ৪৩

কবিতা ৫২-৫৬

জুমের দেশে ফিরে এসো– সৌরভ চাকমা জুম্মো ৫২

অভিলাষ– জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু ৫২

হে যৌবন– সাল ত্রিপুরা ৫৩

মোদের গর্ব মোদের আশা, হে নেতা! –দৈবারিক চাকমা ৫৩

হিল চাদিগাঙ: আমার জন্মভূমি– জড়িতা চাকমা ৫৪

আমাদের চাওয়াটা কি আসলেই বেশি কিছু?– ত্রিজিনাদ চাকমা ৫৪

এক খণ্ড বিকেল বেলায়- নিতীষ চাকমা ৫৫

১০ নভেম্বর ভোর বেলায় তোমার সাথে দেখা হবে- এস জে চাকমা ৫৫

অনুভব- শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা ৫৬

বিশেষ প্রতিবেদন ৫৭-৭০

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর: সভায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির একতরফা অভিযোগ, উস্কানীমূলক বক্তব্য ও হুমকি; জনমনে সৃষ্টি হয়েছে চরম আতঙ্ক ৫৭

তিন পার্বত্য আসনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: নজীরবিহীন কারচুপির মহোৎসব ৬৪

তিন পার্বত্য জেলায় ব্যাপক ভোট ডাকাতির মাধ্যমে ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত ৬৮

পার্বত্যাঞ্চল এখন সাজানো মামলা, জামিনপ্রাপ্তদের পুনঃগ্রেফতার, বিচার-বহির্ভূত হত্যার গারদখানা ৬৯

সংবাদ প্রবাহ ৭১-১১৯

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৭১

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল ৭২

প্রশাসন, সেনা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ৭৩

সংস্কারপন্থী ও এএলপি সন্ত্রাসীদের তৎপরতা ৯১

সংগঠন সংবাদ ৯৬

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০১৯

প্রচ্ছদ ছবি:

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইল: pcjss.info@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

মূল্য: ৫০ টাকা

সম্পাদকীয়

জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক গণপরিষদের সদস্য ও সাবেক সাংসদ, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জনগণের জাতীয় শোক দিবসে জনসংহতি সমিতি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছে মহান নেতার অমূল্য আত্মত্যাগকে। সেই সাথে স্মরণ করছে ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বরের এই দিনে জাতীয় কুলাঙ্গার বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে মহান নেতা এম এন লারমার সাথে শাহদাৎবরণকারী আটজন সহযোদ্ধাসহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে আত্মবলিদানকারী মহান শহীদদের। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে অনেক সংগ্রামী ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন কারাগারে অন্তরীণ হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে পঙ্গুত্ব জীবন বরণ করেছেন, অসংখ্য নারী ও শিশু পাশবিক ও নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের এই অমূল্য ত্যাগ ও অবদান জনসংহতি সমিতি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছে এবং সকল শহীদ, বন্দী, পঙ্গুকর্মী ও ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান সময়েও এম এন লারমার হত্যাকারী সেই বিভেদপন্থী ও বিশ্বাসঘাতকদের অনুসারী ঘৃণ্য দোসর ও বিভৎস প্রেতাত্মারা দেশের শাসকগোষ্ঠী তথা দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে ন্যাক্কারজনক তাঁবেদারী ভূমিকা পালন করে চলেছে। ক্ষমতালোভী ও উচ্চাভিলাষী বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের মতো তাদেরও মূল উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করা, সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তিতে স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে খর্ব করে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করা। তাই আজ গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের সেই প্রেতাত্মা গোষ্ঠী যথাক্রমে সেনা-সমর্থিত সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসী ও মীর জাফররূপী ক্ষমতাসীন জুম্ম দুলাগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী, প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্বের এক অক্ষশক্তি সংঘবদ্ধভাবে অধিকারীকামী জুম্ম জনগণের উপর ফ্যাসীবাদী দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

এমনকি তারই অংশ হিসেবে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কতিপয় স্থানে আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) নামে প্রতিবেশী মিয়ানমারের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি, হুমকি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে শাসকগোষ্ঠী আশ্রয়, প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে চলেছে। সংস্কারপন্থী ও এএলপি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অবাধে একের পর এক হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে গেলেও নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে পক্ষান্তরে এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো কর্তৃক সংঘটিত ঘটনায় মিথ্যাভাবে জড়িত করে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থক এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সোচ্চার ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের, ধরপাকড়, ঘরবাড়ি তল্লাসী, মারপিট ইত্যাদি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনরত জুম্ম ব্যক্তিবর্গ ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে একের পর এক সাজানো মামলা দায়ের, নির্বিচার গ্রেফতার, একটা মামলায় জামিন হলে সাথে সাথে আরেকটি সাজানো মামলায় জেল গেইট থেকে গ্রেফতার বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', 'অস্ত্রধারী' সাজিয়ে অবৈধ গ্রেফতার ও জেলে প্রেরণ, জোরপূর্বক গুম, তথাকথিত 'ক্রসফায়ার'-এর নামে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন, সন্ত্রাসী খোঁজার নামে রাত-বিরাতে ঘরবাড়ি তল্লাসী ইত্যাদি অব্যাহত গতিতে চলছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের জানুয়ারি হতে অক্টোবরের মধ্যে সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক ক্রশফায়ারের নামে ৫ জনকে বিচার-বহির্ভূত হত্যা; ৪ জনকে জোরপূর্বক তুলে নেয়া, যাদের মধ্যে দুইজন এখনো নিখোঁজ; প্রায় শ' খানেক ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গ্রেফতার, যাদের মধ্যে উচ্চ আদালতের জামিনে বের হওয়ার সময় জেল গেইট থেকে অন্য সাজানো মামলায় অন্তত ১০ জনকে পুনঃগ্রেফতার; ১৭টি সাজানো মামলায় ২৭৮ জনকে মিথ্যাভাবে জড়িতকরণ; ২২টি ঘরবাড়ি তল্লাসী ও ৭ জনকে আটক করে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নস্যাৎ করা তথা জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের যে কোন ষড়যন্ত্র এবং জুম্ম জনগণের এই চুক্তি বাস্তবায়নের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের যে কোন চক্রান্ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্ম জনগণের পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তাদের আর পেছনে যাওয়ার কোন পথ নেই। তাই মহান নেতা এম এন লারমার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী তথা জুম্ম জনগণের জাতীয় শোক দিবসে জনসংহতি সমিতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে যে, আসুন, মহান নেতা এম এন লারমার প্রদর্শিত আদর্শ ধারণ করে দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে বিভেদপন্থী ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রেতাত্মা এবং শাসকগোষ্ঠীর দালাল ও তাঁবেদার গোষ্ঠীর বিষদাঁত ভেঙ্গে দিই এবং শাসকগোষ্ঠীর পার্বত্য চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করি। এম এন লারমার রক্ত বৃথা যেতে পারে না। মুক্তিকামী জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই হবে।

প্রবন্ধ

এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

সজীব চাকমা

বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বা এম এন লারমা আজ এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ছিলেন একাধারে জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রগতিশীল আদর্শের ধারকবাহক এবং বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত জুম্মসমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা; অপরদিকে তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদ ও প্রথম জাতীয় সংসদের এক জনদরদী সাংসদ এবং অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশেরও অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা। তরুণ বয়সেই গ্রামে জন্ম নেয়া সহজ-সরল এক শিশু অধিকারবঞ্চিত মানুষের অত্যন্ত প্রিয় এক দূরদর্শী জাতীয় নেতা ও পরাধীন জুম্ম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হন। তাঁর নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহস, সংকল্প ও মানবিকতা কিংবদন্তীতুল্য। তিনি আজ নেই। আজ থেকে সাড়ে তিন দশক আগে অপরিণামদর্শী, ক্ষমতালোভী, উচ্চাভিলাষী, বিশ্বাসঘাতক একদল বিভেদপন্থী চক্রের ষড়যন্ত্রমূলক ও কাপুরুষোচিত এক অতর্কিত সশস্ত্র হামলায় আট সহযোদ্ধাসহ গুলিবিদ্ধ হয়ে নির্মমভাবে নিহত হন তিনি। মৃত্যু হলেও নক্ষত্রসম তাঁর সেই বর্ণাঢ্য বৈপ্লবিক জীবনের আলোর ঝলকানি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মসহ বাংলাদেশের অপরাপর আদিবাসী ও বিশ্বের অধিকারকামী মানুষকে আজও ছুঁয়ে যায়, আজও সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

রাঙামাটি শহরের অনতিদূরে সেই সময়ের এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম মহাপূরমে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতা সেই গ্রামেরই জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্ত কিশোর চাকমা ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, মানবতাবাদী, সমাজসেবী ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার অধিকারী। মাতা সুভাষিণী দেওয়ান ধর্মপ্রাণ ও স্নেহময়ী।

ছেলেবেলা থেকেই এম এন লারমা মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি ১৯৫৮ সালে রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে আই এ পাশ করেন। এরপর একই কলেজে বি এ ক্লাশে ভর্তি হন। তখন অধ্যয়নরত অবস্থায় কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিবিধানের দাবি করার কারণে মিথ্যাভাবে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত করে পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দুই বছর পর শর্ত সাপেক্ষে ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ তিনি কারামুক্ত হন। একই বছর সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীনে তিনি বি এ পাশ করেন। এরপর তিনি ১৯৬৮ সালে বিএড পাশ করেন এবং ১৯৬৯ সালে এল এল বি পাশ করেন।

বস্তুত, এম এন লারমা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হননি। শুধু সনদ বা ডিগ্রী অর্জন নয়, সমাজ ও জাতির প্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় গভীর জ্ঞান অর্জনই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বলাবাহুল্য, পরবর্তীতে সংগ্রামী জীবনের ধাপে ধাপে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভূমিকায় আমরা সেই চৌকস জ্ঞানেরই সাক্ষর পাই। তাঁর এক সহপাঠী ভূপেন্দ্রনাথ চাকমার ভাষায়, '...পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য বই প্রচুর পড়তেন। সেই সময়কার পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাগুলোর নিয়মিত পাঠক ছিলেন তিনি।' তাঁর আরেক সহপাঠী অমিয়াংশু চাকমা বলেন, 'রাঙ্গামাটি সরকারি স্কুলে থাকার সময়ও তিনি খুবই পড়ুয়া ছিলেন। রাত্রে তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে কেবল পড়ার গুনগুন আওয়াজ শোনা যেত।'

এম এন লারমার জন্ম, শিক্ষালাভ এবং আবির্ভাব পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে কোন গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়। কেননা তিনিই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামকে নাড়িয়ে দিতে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ করতে, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে জাগরিত করতে, দেশের ও বিশ্বের দরবারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তুলে ধরতে, সর্বোপরি ভিন্ন ভাষাভাষি পাহাড়ি জনগণকে জুম্ম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। তাঁর শিক্ষা লাভ ছিল অতীতের অন্য সবার চাইতে ব্যতিক্রম, তাঁর কর্মজীবন, জীবন-দর্শন অন্য সবার চাইতে আলাদা। তিনি শিক্ষা লাভ করে কোন চাকরি নিয়ে ব্যক্তি জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেছে নেননি। তিনি শিক্ষকতা করেও সেখানে আবদ্ধ থাকেননি, ওকালতি করেও উকিল হয়ে থাকেননি। কেননা তিনি ভাবতেন আরো অনেক কিছু, তিনি অনুভব করতেন আরো অনেক বিষয়। তিনি জানতেন মানব সভ্যতার অগ্রগতির কথা, তিনি জানতেন বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ ও নিপীড়িত জাতির সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের

কথা। তিনি বুঝতেন আধুনিক সব রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা। তিনি ভাবতেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ ও নিপীড়িত-নির্যাতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের কথা, তাদের জাগরিত করবার ও সংগঠিত করবার কথা, তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের কথা। তিনি তাঁর এই চিন্তাভাবনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরতে এবং প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমও হন।

এম এন লারমা যখন জন্মগ্রহণ করেন তার মাত্র ১৪ দিন আগেই ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে ফ্যাসীবাদী উগ্রজাতীয়তাবাদী হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান কর্তৃক পোল্যান্ডে আক্রমণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মানবজাতির ভয়াবহতম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তখন সভ্য দেশসমূহে চলছে যেন ধ্বংসের হোলিখেলা। আসলে তো স্বার্থ, ব্যবসা, দেশ বা ভূখণ্ড দখল ও কাড়াকাড়ি, আধিপত্য, জাত্যভিমান, শোষণ, সহিংসতা

> এম এন লারমা ছিলেন আধুনিক সভ্যতার অগ্রসর ও আদর্শস্থানীয় মানুষদের একজন।
>
> এত বড় মানুষ, এত মহান নেতা যুগ যুগ ধরে পেছনে পড়ে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং সেখান থেকেই তিনি তাঁর বিকাশ ঘটিয়েছেন—এ যেমনি এক আশ্চর্যজনক, তেমনি শিক্ষণীয় এবং প্রেরণাদায়ক।

ইত্যাদিরই অনিবার্য ফলই হল এই নৃশংস যুদ্ধ। তখনও পৃথিবীর সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বহু জাতি হয় বিদেশি শক্তির দ্বারা পরাধীন বা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে জর্জরিত, নয় তো সামাজিক পশ্চাদপদতায় গতি ও দিশাহীন এক অবস্থায় পতিত। বলাবাহুল্য, এই উপমহাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জনপদ, ভূখণ্ডই তখন বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত ও পদানত। তখন পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্নও কেউ দেখেনি। তবে স্বাধীনতার অধিকারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজ তো আরও পিছিয়ে। সামগ্রিকভাবে জুম্ম সমাজ একদিকে বিদেশি, বিজাতীয় শক্তির আগ্রাসন ও আধিপত্যের শিকার, অপরদিকে আভ্যন্তরীণভাবে সামন্তীয় পুরনো ধ্যান-ধারণা ও ব্যবস্থায় প্রায় অচল, অথর্ব। সমাজে ছিল একদিকে সামন্ত রাজা আর তার দেওয়ান-হেডম্যানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভেদমূলক, দমন-পীড়নমূলক অভিজাততন্ত্র, অপরদিকে ছিল এই অভিজাততন্ত্রের দমন-পীড়ন-বিভেদের শিকার অধিকাংশ জুম্ম কৃষক গরিব প্রজাসাধারণ। সেসময় সামন্তপ্রভুরা সাধারণ জুম্ম জনগণ শিক্ষিত, সচেতন, সংগঠিত, অধিকারকামী, উন্নত হয়ে উঠুক তা কোন সময়েই চাননি, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। এখানে নিজেকে জানা যেমনি এক দুরূহ ব্যাপার, তেমনি দুনিয়াকে জানা যেন অলীক কল্পনা। শিক্ষা, বিজ্ঞান, যুক্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, উন্নয়ন, আধুনিক জীবন, ইত্যাদি যেন অনেকটা আকাশ-কুসুম কল্পনা। অনেকটা এমনই এক সমাজেই শৈশব ও কৈশোরের সময় অতিবাহিত করেন এম এন লারমা।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বৃটিশরা ভারতবাসীর কাছে তাদের শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেয়। সারা উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রে। অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ-মাঝারি বিভিন্ন জাতির জন্মভূমি ও আবাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সংখ্যাগুরু হিন্দু ও মুসলিমরা প্রধান নেতৃত্বে ছিল বলে এই উপমহাদেশের দুটি রাষ্ট্রও ভাগ হয়ে যায় এই দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। দ্বি-জাতির কথা বলা হলেও এই বিভক্তি হয় মূলতঃ এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে, পূর্ব ও পশ্চিম মিলে পাকিস্তান হবে মুসলিমদের রাষ্ট্র আর বৃহত্তর ভূখণ্ড নিয়ে হিন্দুদের সাথে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবে অন্যান্য ক্ষুদ্র-মাঝারি বিভিন্ন জাতি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন না কোনভাবে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন জুম্ম জনগণ এজন্য স্বাভাবিকভাবে এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কিন্তু উগ্র ধর্মান্ধ ও জাত্যাভিমানী পাকিস্তান সরকার জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণের নীতিই গ্রহণ করে।

যদিও ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধানে পাকিস্তান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন ব্যবস্থার মর্যাদা গ্রহণ করে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াশীল ও বিজাতীয় নীতির কারণে ৫০-এর দশকেই রাঙামাটি মহকুমার লংগদু ও নানিয়ারচর, রামগড় মহকুমার তবলছড়ি, বেলছড়ি ও মানিকছড়ি এবং বান্দরবান মহকুমার আলিকদম, লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে বিশেষ শাসনবিধি লংঘন করে বাঙালি মুসলমান অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। এরপর শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের একের পর এক ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ। জনগণের মাঝে প্রকাশ পেতে থাকে তার বিজাতীয় ও বৈষম্যমূলক আচরণ।

১৯৬০ সালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে জুম্ম জনগণের জীবনধারায় সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত হানে কাপ্তাই বাঁধ। যার কারণে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হয় লক্ষাধিক জুম্ম, পানির তলে তলিয়ে যায় এই অঞ্চলের মোট আবাদী জমির ৪০% ভাগ, হাজার হাজার মানুষ স্বদেশ ছেড়ে আশ্রয় নেয় পাশ্ববর্তী দেশে, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক জীবন। এই অঞ্চলের জুম্মদের জন্য এ এক বড় ট্র্যাজেডি। তাই তারা অভিহিত করেন কাপ্তাই বাঁধ মরণ ফাঁদ।

পাকিস্তান সরকারের জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ তরুণ এম এন লারমা একের পর এক প্রত্যক্ষ করেন এবং উপলব্ধি করেন এ সবই জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র, তাদেরকে শাসন-শোষণ ও প্রতারণা করবার পাঁয়তারা। বিশেষ করে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে জুম্ম জনগণের যে নজিরবিহীন দুঃখ-দুর্দশা তা তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তিনি নিজেও এর প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। এত সব ষড়যন্ত্র ও বিপর্যয় সত্ত্বেও তৎকালীন সামন্ত নেতৃত্ব কোন প্রতিবাদ করেনি বা তা মোকাবেলার জন্য কোন পথ দেখাতে পারেনি।

এম এন লারমা তখন বয়সে তরুণ ছাত্র, কিন্তু স্বজাতি ও স্বভূমিপ্রেমে উদ্বেলিত এবং প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় উদ্ভাসিত। ঠিক এই সময়েই আমরা দেখতে পাই এম এন লারমার রাজনৈতিক সৃজনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ, যে সৃজনী শক্তির পরিচয় দেন তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘুণেধরা সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এবং বিজাতীয় পাকিস্তানী ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের শাসক-শোষকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করেন, ঘুমন্ত ও বিলুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে জাগরিত করেন, অধিকার সচেতন করেন, সংগঠিত করেন এবং গণতান্ত্রিক ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কঠিন-কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেন। প্রকৃতপক্ষে এসবকিছুই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে অভূতপূর্ব, বৈপ্লবিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জনসংহতি সমিতিই এই পশ্চাদপদ আদিবাসী জুম্ম জনগণের সর্বজনস্বীকৃত ও সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দল। বলাবাহুল্য, এই জনসংহতি সমিতি সৃষ্টির পথটি মোটেও মসৃণ ছিল না। সে সময়ে শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ ছাত্র-যুব সমাজ 'পাহাড়ি ছাত্র সমিতি', 'ট্রাইবাল পিপলস পার্টি (পিপিপি)', পাহাড়ি যুবক সংঘ, রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি, 'বামায়াতা' ইত্যাদি সংগঠন বা দলে বিভক্ত ছাত্র-যুবকদের সবাইকে এক কাতারে সমবেত করা ছিল যথেষ্ট শ্রমসাধ্য মতাদর্শিক ও সাংগঠনিক এক কাজ। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এম এন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। এর পরপরই এম এন লারমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য ৪ দফা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দাবিনামা তৎকালীন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। সেই দাবিগুলি হল—

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে;

২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির' ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে;

৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে;

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না করা হয়, এরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

কিন্তু পাকিস্তানী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী সেদিন আরেকটা সংখ্যালঘু নিপীড়িত জাতির ন্যায্য অধিকার অনুভব করতে ও মেনে নিতে পারেননি, যার দুঃখজনক ইতিহাস আমরা সবাই জানি। বস্তুতঃ এই ঐতিহাসিক দাবিই সমগ্র আদিবাসী জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার স্ফূরণ ঘটায় এবং তার ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রণনীতি বাতলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে জনসংহতি সমিতি আদিবাসী জুম্ম জাতিসত্তাসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে ত্রাতার ভূমিকাই গ্রহণ করে। তাদেরকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর এবং অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার শক্তি ও অনুপ্রেরণার যোগান দেয়। এম এন লারমার নেতৃত্বে এই সমিতিই যুগ যুগ ধরে সামন্তবাদী ও বিজাতীয় সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী শাসন-শোষণে সম্বিৎহীন ও সম্মোহিত ঘুমন্তপ্রায় নিষ্পেষিত আদিবাসী জুম্ম জনগণের চোখ খুলে দেয়, তাদের সংগঠিত করে, প্রগতির দিকনির্দেশনা দেয়।

বলাবাহুল্য, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠা ও এম এন লারমার নেতৃত্ব জুম্ম জনগণের মধ্যে কেবল জাতীয় রাজনৈতিক জাগরণের স্ফূরণ ঘটায়নি, এটি জুম্মদের সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য, চিত্রকলাসহ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের জগতেও তুমুল ইতিবাচক আলোড়নের সৃষ্টি করে। জুম্মরা যেন নতুন করে জীবনের মানে খুঁজে পায়। জুম্মদের জীবনধারা ফিরে পায় গতি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর অসম বিকাশ, তাঁদের ভাষাগত-সংস্কৃতিগত ভিন্নতা, সামন্তবাদী পশ্চাদপদতা ও বিচ্ছিন্নতা, অশিক্ষা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও, এম এন লারমা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছেন, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন, সংগঠিত করতে পেরেছেন এবং আধুনিক পন্থায় লড়াইয়ে নামাতে পেরেছেন। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তা-আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি যা তিনি পেয়েছেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত জাতি ও শ্রেণির সংগ্রামের উত্তরাধিকার হিসেবে, সেই সব সংগ্রামের ইতিহাসের গভীর অধ্যয়ন ও সারসংকলন থেকে, আর অন্যটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতায় ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ প্রেক্ষাপটে স্বউদ্ভাবিত 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ'। এটা এম এন লারমার সৃজনশীলতার অন্যতম একটি দিক। বলাবাহুল্য, বর্তমান যুগে আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তা-আদর্শ ব্যতিরেকে কোন সংগ্রামকে যেমনি যথাযথভাবে অধ্যয়ন করা যায় না, তেমনি এর বিকাশে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করাও সম্ভব হতে পারে না। অপরদিকে প্রতিকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে একেবারে ভিন্ন ভাষাভাষী, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের অধিকারী আদিবাসী জুম্মদেরকে এক কাতারে, এক ছাদের তলায় সমবেত করাও মোটেই সহজ কাজ ছিল না।

একদিকে ডারউইন-মর্গান-মার্কস-এঙ্গেল্স-আব্রাহাম লিংকন-লেনিন-মাও-হোচিমিন চিন্তা-সমৃদ্ধ দুনিয়ার নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামী দর্শন আর শোষণহীন, বৈষম্যহীন মানবসমাজের অত্যাধুনিক মতবাদ। আর অন্যদিকে চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা-তঞ্চঙ্গ্যা-মুরং-বম-পাংখো-লুসাই-খিয়াং-খুমী ও চাক জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও তাদের বিকাশের রূপরেখা জুম্ম জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ প্রচার করে ক্ষুদ্র-বৃহৎ দুনিয়ার সকল জাতিই মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী, এই জাতীয়তাবাদ উপলব্ধি করে যে, শক্তিশালী বিজাতীয় শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগুলোর ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেই হবে। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক ও ধ্বংসাত্মক ইসলামী সম্প্রসারণবাদ এবং বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর জাত্যভিমানী ও আধিপত্যবাদী ইসলামীকরণ ও দমন-পীড়নের মুখে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর জন্য এম এন লারমার এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ যেন এক মোক্ষম হাতিয়ার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও শাসকগোষ্ঠীর যে নির্মমতা দেখা যায়, তাতে এই জুম্ম জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ না হলে শাসকগোষ্ঠীর 'ভাগ করো, শাসন করো, ধ্বংস করো বা ইসলামীকরণ করো' এই হিংসাত্মক নীতি ও কার্যক্রমের মুখে এই জুম্মরা অনেক আগেই হারিয়ে যেতো।

এই জাতীয়তাবাদ প্রচার করে যতই সংখ্যালঘু হোক যতই পশ্চাদপদ হোক টিকে থাকতে হলে, ন্যায্য অধিকার আদায় করতে হলে তাকে জেগে উঠতেই হবে; আধুনিক চিন্তা-চেতনা ধারণ করতে হবে এবং লড়াই করতে হবে। মূলতঃ জনসংহতি সমিতি গঠনের মধ্য দিয়েই এম এন লারমা এই মতবাদ প্রচার করেন। এর মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ প্রথম ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় জাতিগত-গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা ভেঙে দিয়ে নিজেদেরকে সত্যিকারভাবে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং নিজেদের মধ্যে প্রগতিশীল জাতীয় চেতনার স্ফূরণ ঘটান।

বস্তুত, এম এন লারমা কোন গোষ্ঠীর জন্য কেবল কোন একটা শ্রেণি বা জাতির জন্য চিন্তাভাবনা করেননি, সংগ্রাম করেননি; নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের জন্যই চিন্তা-ভাবনা করেছেন, মানুষের ন্যায্য অধিকারের জন্যই সংগ্রাম করেছেন। যা সত্যিকারের একজন মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য। তিনি বাস্তব কারণে বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদ বিলুপ্তপ্রায় ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিসত্তার অধিকার ও দাবি নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি মূলতঃ বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে নির্যাতিত সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন এক প্রান্তিক মানবগোষ্ঠীর জন্যই কাজ করেছেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা বিশ্বের সকল নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষ ও ধ্বংসোন্মুখ জাতিসমূহের অধিকার আদায়ের পথে এক অমূল্য সম্পদ। মানবসভ্যতার বিকাশে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁর সংগ্রামের ন্যায্যতা, বাস্তবতা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, দূরদর্শিতা, গভীরতা এবং ব্যাপকতা আজকের দিনের আদিবাসী মানুষের যে দুর্দশা, আন্দোলন ও উত্থান তা লক্ষ্য করলেই আমরা অনুভব করতে পারি।

তাঁকে নানাভাবে বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করতে দেখা যায়। বিভিন্ন মতবাদ বা পন্থার সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। তাঁকে জাতীয়তাবাদী বলা যায়, তাঁকে নিঃসন্দেহে বিপ্লবী হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। কেউ কেউ তাঁকে একজন অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল নেতা হিসেবেই তুলে ধরেন। বস্তুত চূড়ান্ত অর্থে বা বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন একাধারে পাহাড়ি আদিবাসী জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিত, পাহাড়ি-বাঙালিসহ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল নিপীড়িত জাতির সহাবস্থান, সমমর্যাদা ও সমঅধিকারে বিশ্বাসী, শ্রেণি-লিঙ্গ-বৈষম্য-জাতি ভেদাভেদহীন সমাজ প্রগতির চিন্তা ও দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত, ত্যাগ-সংযম-সততা-সরলতা-গভীর মানবিক মূল্যবোধ-মানবাধিকারবোধের দ্বারা পরিশীলিত এবং যে কোন কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত, যুক্তি-বিজ্ঞান ও পরিবেশ-প্রতিবেশ চেতনায় সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত নির্ভরযোগ্য এক নেতা, পথপ্রদর্শক ও বন্ধু। এই ধরনের মানুষ বা ব্যক্তিত্ব যে কোন সমাজে, জাতিতে ও যুগে অত্যন্ত বিরল। সেই বিচারে

এম এন লারমা এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান নেতা। যিনি মানবসমাজ ও সভ্যতার বিকাশকে কিছুটা হলেও এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

শুধু তাই নয় মানুষ হিসেবেও তিনি অনন্য চারিত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি চিন্তা করতেন অনেক উঁচুতে, অনেক ব্যাপকতায়, অনেক গভীরে, কিন্তু জীবনযাপন করতেন একেবারে সাদাসিধে। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, অসীম ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী। ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান, অমায়িক, ভদ্র, নম্র, সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মৃদু, গম্ভীর কিন্তু সবসময় যুক্তি সমৃদ্ধ। সাদা প্যান্ট-সার্টই তাঁর অধিকাংশ সময়ের পোশাক। পার্টির সর্বোচ্চ নেতা হয়েও আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনে তিনি নিজের কাপড় নিজেই ধুতেন। নারী সমাজের প্রতি ছিল তাঁর গভীর দরদ। বাংলাদেশের সংসদে ও জুম্ম সমাজে তিনিই প্রথম জোরালো কণ্ঠে নারী সমাজের সমঅধিকার ও সমমর্যাদার কথা উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, নারীকেও সেই অধিকার ভোগ করতে হবে।’ গ্রামের কারো বাড়িতে গেলে বিশেষ করে রাত্রে গেরস্থরা যদি মোরগ-মুরগির মাংস রান্না করার উদ্যোগ নেয় তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তা নিষেধ করেন। বলেন, রাত্রি হলেই মানুষ যেমন ঘরে ফেরে, পশু-পাখিরাও ঘরে ফেরে, গবাদি পশু-পাখিরাও স্ব স্ব আশ্রয়স্থলে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই এই অসময়ে সেখান থেকে তুলে কোন গবাদি পশু-পাখি কাটাও সমীচীন নয়। আর কারো বাড়িতে খাবার খেলেও তিনি খোঁজ নিতেন সবাই খেয়েছে কিনা অথবা তাদের জন্য পর্যাপ্ত রাখা হয়েছে কিনা। তাঁর সঙ্গীদেরও তিনি এ ব্যাপারে সজাগ হওয়ার পরামর্শ দিতেন। পরিবেশের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। প্রকৃতির প্রাচুর্য বনে থেকেও তিনি অহেতুক কোন গাছ কাটতে দিতেন না, লতা-পাতা ছিঁড়তে দিতেন না। দুর্লভ কোন প্রাণী শিকার করতে দিতেন না।

এম এন লারমা ছিলেন নিজের সময়, সমাজ ও দেশ থেকে এগিয়ে থাকা এক কাণ্ডারী। তবে অনেক অনেক এগিয়ে থেকেও তিনি কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে বা পেছনে ছেড়ে যেতে চাননি নিজের সমাজ ও দেশকে। আসলে এম এন লারমা ছিলেন আধুনিক সভ্যতার অগ্রসর ও আদর্শস্থানীয় মানুষদের একজন।

এত বড় মানুষ, এত মহান নেতা যুগ যুগ ধরে পেছনে পড়ে থাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং সেখান থেকেই তিনি তাঁর বিকাশ ঘটিয়েছেন—এ যেমনি এক আশ্চর্যজনক, তেমনি শিক্ষণীয় এবং প্রেরণাদায়ক। যেন সময়ের প্রয়োজনে, যুগের প্রয়োজনে তাঁর এই আবির্ভাব। তিনি এমন এক মানুষ যাকে নিয়ে একজন সাধারণ জুম্মও গর্ব করতে পারেন, তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁকে সম্মান করে নিজে সম্মানিত হতে পারেন। তাই সেই ১৯৮৩ সালে এম এন লারমাকে যারা হত্যা করেছেন তারাই আজ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে এবং চরম ঘৃণার পাত্র। যুগ যুগ ধরে তাদের এই দশাই বহন করতে হবে। আর এম এন লারমা? ভিয়েতনামের এক বিপ্লবী কবি যেমন বলেন, ‘কিছু কিছু মৃত্যু আছে যা পরিণত হয় অবিনশ্বর জীবনে’—তেমনি এম এন লারমার মৃত্যুও পরিণত হয়েছে অবিনশ্বর এক জীবনে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কখনো ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধিতার নামে বা তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ধোঁয়া তুলে, আবার কখনো ‘জেএসএস (এম এন লারমা)’ নাম ভাঙিয়ে সেনা-সমর্থনে ‘সংস্কারপন্থী’ পরিচয়ে বিভেদপন্থীদের নব্য উত্তরসুরীরা ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ ও কায়েমি স্বার্থবাদী দালালগোষ্ঠীর দোসর হয়ে এম এন লারমার গড়া পার্টি ও তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী নেতৃত্বকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। যা শুধু পার্টি ও পার্টি নেতৃত্ব নয়, উপরন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সংগ্রামরত জুম্ম জনগণের ধ্বংসই ডেকে আনতে চায়। কিন্তু এম এন লারমার নীতি-আদর্শে পরিচালিত যে পার্টি ও পার্টি নেতৃত্ব সেই পার্টি অচিরেই তাদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ উৎখাত করবেই। আর যার চিন্তা-আদর্শে অচেতন-ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠেছে, পশ্চাদপদ, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, নিজেকে জানে না যে মানুষ দুনিয়াকে জেনেছে, লাঠি হাতে একজন পুলিশ দেখলে পালিয়ে যাওয়া মানুষ সশস্ত্র লড়াই শিখেছে—সেই এম এন লারমার আদর্শ ও সৃজনশীল শক্তি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পার্টি, পার্টি নেতৃত্ব ও জুম্ম জনগণকে কোন শক্তিই নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না এবং তার ন্যায্য অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। অপরদিকে বাংলাদেশ সরকারকেও যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমস্যা সমাধানের কথা বলে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করেও চুক্তি বাস্তবায়ন না করে যে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে তাদেরকেও এই অনিবার্য বাস্তবতাটি মনে রাখতে হবে। বলাবাহুল্য তাদেরকে এই বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার পরিণতির জন্য একদিন অনুতপ্ত হতে হবে।

এম এন লারমার চিন্তাধারা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা

শেকড় ত্রিপুরা

ভূমিকা:

পার্বত্য চট্টগ্রাম- ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহের চিরায়ত আবাসস্থল। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, লুসাই, পাংখো, চাক, খুমী, খিয়াং জনগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তবে বৃটিশ আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি বসতি শুরু হয়। বৃটিশ আমলে হাল চাষ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অস্থায়ীভাবে বাঙালি বসতি শুরু হলেও পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম বাঙালি বসতিপ্রদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে। উল্লেখ্য যে, বৃটিশ আমলে কিছু সংখ্যক সাঁওতাল, অহমিয়া ও গুর্খা এবং পরবর্তীতে কিছু রাখাইন পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মরাও এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। সাংবিধানিক আইন ও শাসনব্যবস্থার নানা সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে এর সুযোগ গ্রহণ করে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪ লক্ষাধিক মুসলিম বাঙালি পুনর্বাসন করে। সামরিক শাসন জারি হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে সামরিক নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হলেও বাংলাদেশের সরকারসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পাকিস্তানী পলিসি অব্যাহত রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ক্ষেত্রে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর পলিসির মধ্যে কোন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না।

রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত:

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংক্ষেপে এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক শিক্ষার হাতেখড়ি নিজ পরিবার ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে। এম এন লারমার পরিবার ছিল আগাগোরা এক সংগ্রামী পরিবার। পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা, পিতামহ চানমনি চাকমা, দুই জ্যাঠামশাই কৃষ্ণ কিশোর চাকমা ও হরকিশোর চাকমা- এঁরা সবাই সংগ্রামী ছিলেন। তাঁরা সবাই চাকমা সমাজের অভিজাত শ্রেণি কর্তৃক প্রজা সাধারণের ওপর শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চাকমা সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা বিকাশ লাভের পেছনে এই লারমা পরিবারের এক বিশেষ অবদান রয়েছে। এই ধরনের এক ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী পরিবারে এম এন লারমা জন্মগ্রহণ করেন ও রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করেন। সমাজ ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে উপলদ্ধি করার মত এম এন লারমার যখন বয়স হল তখন তিনি দেখতে পেলেন– চাকমা সমাজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। চাকমা সমাজে অভিজাত শ্রেণি কর্তৃক প্রজা শ্রেণি নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তিনি দেখতে পেলেন সমাজে অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অবিচার, অন্যায়সহ নানা শোষণ ও নিষ্পেষণ। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করলেন– পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী, পরবর্তীতে বাঙালি শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

এম এন লারমা যখন হাইস্কুলের ছাত্র তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৫৬ সালের পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলনে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। হাইস্কুল জীবনে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়া এবং তারও আগে ছেলেবেলা থেকেই পারিবারিকভাবে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ে বাস্তব ও তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ সব কিছু মিলে এম এন লারমার রাজনৈতিক চেতনা সূচিত হয়েছিল। সেকারণে তিনি ছোট কাল থেকে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী হয়ে উঠেন। অবশ্য তিনি ছেলেবেলা থেকেই সহজ সরল, বিনয়ী, কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী, পরোপকারী ও শৃঙ্খলা পরায়ণ ছিলেন। রাজনৈতিক চেতনা সূচিত হবার কারণে তিনি ছাত্র জীবন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন। জুম্ম সমাজের অচলায়তন অবস্থার পরিবর্তন ও শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতন থেকে জুম্ম জনগণকে মুক্ত করার

জন্য জুম্ম সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় তিনি ছাত্র জীবন থেকেই উপলব্ধি করা শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, এম এন লারমা চট্টগ্রাম কলেজে পড়াশোনা করার সময় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নামক এক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সাথেও যুক্ত হয়ে পড়েন।

এম এন লারমার গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল চিন্তাধারা পরিগঠনের প্রেক্ষাপট:

চিন্তাধারার দিক থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। এম এন লারমা একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। এধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জুম্ম জনগণের একটি আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন, যে শাসনব্যবস্থা জুম্ম জাতিসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এম এন লারমার এধরনের চিন্তাধারা গঠন ও পরিপুষ্টন লাভের পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে এবং নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এর পেছনে ভূমিকা পালন করেছে।

> “এম এন লারমা মনে করেন, দেশের অর্থনীতি মজবুত এবং জনগণের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে ঘুষ, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করার জন্য সংবিধানে শক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছিলেন– ‘আমাদের দেশে যারা ঘুষখোর, যারা দুর্নীতিপরায়ণ তাদের যদি আমরা উচ্ছেদ করতে না পারি, তাহলে এই সংবিধানের কোন অর্থ হয় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের যে ক'জন চিন্তাশীল ব্যক্তি সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অচলায়তন চাকমা সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন সেই সংগ্রামী মনীষীদের পরিবারে এম এন লারমা জন্মগ্রহণ করেন। এম এন লারমার পিতামহ চানমনি চাকমা একজন শিক্ষানুরাগী ছিলেন। চানমনি চাকমা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর তিন সন্তান কৃষ্ণ কিশোর চাকমা, হরকিশোর চাকমা ও চিত্ত কিশোর চাকমাকে শিক্ষিত করেন। জুম্ম জনগণের প্রিয় নেতা এম এন লারমা চিত্ত কিশোর চাকমার তৃতীয় সন্তান। চিত্ত কিশোর চাকমা পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন। চিত্ত কিশোর চাকমা যে স্কুলে শিক্ষকতা করেন সে স্কুলটি তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। চানমনি চাকমার দ্বিতীয় পুত্র হরকিশোর চাকমাও একজন স্কুল শিক্ষক। চানমনি চাকমার প্রথম সন্তান কৃষ্ণ কিশোর চাকমা একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজে বিশেষত চাকমা সমাজে শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি চাকমা জাতির অচলায়তন সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কৃষ্ণ কিশোর চাকমার অপর দু'জন ভ্রাতাও অচলায়তন চাকমা সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন ও সমাজে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মহান নেতা এম এন লারমার পিতামহ চানমনি চাকমা একজন প্রতিবাদী ও সংগ্রামী মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে সমাজের অভিজাত শ্রেণি কর্তৃক প্রজা শ্রেণির ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। এম এন লারমার পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা অভিজাত শ্রেণি ও শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রজা সাধারণের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে আজীবন যুক্ত ছিলেন। জুম্ম জনগণের প্রিয় নেতা এম এন লারমা এ ধরনের এক সংগ্রামী ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এম এন লারমার রাজনৈতিক শিক্ষা শুরু নিজ পরিবারে ও পারিবারিক পরিবেশেই। তাঁর পিতা, পিতামহ, জ্যাঠামশাই সবাই সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁদের সকলের কাছ থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা পান। পিতামহ চানমনি চাকমা, পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা ও জ্যাঠামশাই কৃষ্ণ কিশোর চাকমার চিন্তাধারা এম এন লারমার চিন্তাধারা পরিগঠন ও পরিপুষ্টন লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি তাদের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপে অনুপ্রাণিতও হন। কর্মজীবনে তিনি পিতা ও জ্যাঠামশাই এর মতো চাকমা তথা জুম্ম জাতিসমূহের মাঝে শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং জুম্ম জনগণের শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

এম এন লারমার ছাত্র জীবনে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়া এবং তাঁর সংগ্রামী চেতনা গড়ে উঠার পেছনে পাকিস্তান আমলে নির্মিত কাপ্তাই বাঁধ এবং এই কাপ্তাই বাঁধের কারণে লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুহারা হবার ঘটনা বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। যে গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই মাওরুম গ্রামও কাপ্তাই বাঁধের পানিতে ডুবে গিয়েছিল। তিনি তখন নিজ গ্রামের এক মুঠো মাটি নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং সেই এক মুঠো মাটি স্মৃতি হিসেবে তিনি সংরক্ষণ করেছিলেন।

তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন চীনের বিপ্লবের খবর পৃথিবীর

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামেও চীনের বিপ্লবের জোয়ার আছড়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চীন রাশিয়ার বিপ্লব সংক্রান্ত পুস্তিকা নিয়মিত আসতে থাকে। লক্ষ্য করা গেছে যে, ভারতবর্ষে নেতাজী সুভাষ বসু, মাস্টার দা সূর্যসেনসহ অনেক নেতার মাঝে চীন, রাশিয়া ও ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারা বেশ প্রভাব ফেলেছিল। তৎকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিত সমাজের কতিপয় মানুষের মাঝেও এসব বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এম এন লারমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ভারতের জনগণের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা এম এন লারমাকে আরো প্রতিবাদী ও সংগ্রামমুখী করে তোলে। তিনি এসব আন্দোলন দ্বারা অধিকতরভাবে অনুপ্রাণিত হন। তিনি ছাত্র জীবনে প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতির মানুষের বাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতাও এম এন লারমার চিন্তাধারা নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে দাবি করা যেতে পারে। তিনি যে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেন পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বাস্তবতাও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণে এম এন লারমাকে জুম্ম জাতীয়তাবাদ এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার আলোকে সংগ্রাম রচনা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলো বলে ধারণা করা যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা, পারিবারিক পরিবেশ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব- এসবের মধ্য দিয়ে এম এন লারমার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে।

এম এন লারমার চিন্তাধারা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা:

মহান নেতা এম এন লারমা একজন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চিন্তাধারা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল হলেও জুম্ম সমাজের চিন্তাধারা সামন্ত চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন। কারণ জুম্ম সমাজ হল একটি ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজ। সে কারণে জুম্ম সমাজের মাঝে আত্মীয়তাবাদ, গোষ্ঠীবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সংগ্রাম বিমুখতা, রক্ষণশীলতা, শ্রম বিমুখতা, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিশোধ পরায়ণতা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। জুম্ম সমাজ যেহেতু একটি ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজ সেহেতু এ সমাজ বুর্জোয়া সমাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার কারণে এ সমাজের চিন্তাধারায় বুর্জোয়া চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং সমাজের মানুষের মাঝে পুঁজিপতি হবার আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থবাদী চিন্তা, মানসিক দোদুল্যমানতা, ভোগবিলাসী মানসিকতা, স্বার্থপরতা, আপোষকামিতা, দালালীপনা মানসিকতা ইত্যাদি অনুপ্রবেশ ঘটছে। এধরনের সমাজে সামন্ত ও পাতি-বুর্জোয়া চিন্তাধারার মিশ্রিত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। সমাজ বিকাশের এ ধারায় জুম্ম সমাজের একটি অংশ শাসকগোষ্ঠীর দালালীপনায় লিপ্ত হচ্ছে এবং তারা শাসকগোষ্ঠীকে খুশী করার নিমিত্তে জুম্ম জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। একটি অংশ শাসকগোষ্ঠীর করুণাপ্রাপ্ত হয়ে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছে পরিণত হবার জন্য অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কেউ কেউ সফল হয়েছেন। তাদের কেউ কেউ ইতোমধ্যে লক্ষপতি কোটিপতি হয়েছেন। কেউ কেউ সরাসরি ক্ষমতায় অবস্থান করে, কেউ বা ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে যারা লক্ষপতি, কোটিপতি হয়েছেন- এসব সুযোগ সুবিধা যে দীর্ঘ আন্দোলন ও চুক্তির ফসল সেসব কথা তারা বেমালুম ভুলে যান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মসনদে বসে বীর বাহাদুর-দীপংকর মহোদয়রা সন্তু লারমাকে গালি দেন, তাঁর চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করেন। তারা বেমালুম ভুলে যান যে, এই মন্ত্রণালয় হলো পার্বত্য চুক্তির ফসল এবং সে চুক্তির জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন সন্তু লারমা এবং এই আন্দোলনে তিনি তাঁর আপন দুই ভাইকে চোখের সামনে হারিয়েছেন। আন্দোলন ও চুক্তির জন্য তিনি সারা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এই মানুষটার জন্য আজ তারা এমপি, মন্ত্রী। আজ তারা শত কোটি টাকার মালিক। প্রয়োজন ছিল- এই মহামানবকে প্রতিদিন প্রণাম করা, যেভাবে ভগবান বুদ্ধকে প্রতিদিন প্রণাম করা হয়ে থাকে। জুম্ম সমাজের আরেকটি অংশ বীর বাহাদুর-দীপংকরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মন্ত্রী, এমপি, পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার হবার জন্যে শাসকগোষ্ঠীর অঙ্গুলি হেলনে জুম্ম জনগণের সংগ্রামী মানুষদের হত্যা করে চলেছে, যেমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছিল। আজ যেমনি বাংলার জনগণ হানাদার বাহিনীর চেলা চামুন্ডাদের ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাচ্ছে, তেমনিভাবে জুম্ম জনগণও একদিন এইসব জাতীয় বেঈমানদের ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলাবে নিঃসন্দেহে।

শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। অনুরূপভাবে জাতীয় বেঈমানদেরও দালালীপনার শেষ নেই। শাসকগোষ্ঠী একটার পর একটা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে লিপ্ত রয়েছে। সর্বশেষ শাসকগোষ্ঠী তার পোষ্য পুত্র দালাল গোষ্ঠীকে দিয়ে সেনা সমর্থিত সংস্কারপন্থী, মগ পার্টি ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র গ্রুপ তৈরি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক কার্যক্রমে সাম্প্রদায়িক বিষপাম্প ছড়াতে চাচ্ছে। এব্যাপারে সকল জুম্ম জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মানুষকে সতর্ক থাকতে

হবে যাতে সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠী ও তাদের পোষ্যপুত্র দালালরা তাদের ষড়যন্ত্র সফল করতে না পারে। অনুপ্রেরণার বিষয় যে, সংগ্রামের শুরু থেকে জুম্ম জনগণ এবং শিক্ষিত সমাজের বৃহৎ অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিল, আছে এবং আগামীতেও তারা থাকবেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজ যেমনি সামন্তীয় চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন, তেমনিভাবে শাসকগোষ্ঠীর চিন্তাধারাও গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল নয়। শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ ও নিষ্পেষণের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজ বিকশিত হতে পারছে না। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী বিধায় তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতিসমূহের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে সেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আধিপত্য ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অথচ বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল (সরকারি ভাষায় উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল) হিসেবে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছিল। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল তা বাস্তবায়ন না করে চুক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে পরিপূর্ণরূপে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার কার্যক্রম জোর কদমে চালিয়ে নিচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর এই পলিসি ও পরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্থানীয় প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম বসতিস্থাপন অব্যাহতভাবে চলছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৭৮ সাল থেকে মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদেরও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপন চলছে। বর্তমান সময়ে এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার করা হচ্ছে। বর্তমানে হাজার হাজার রোহিঙ্গা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকে পড়ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহকে নিশ্চিহ্নকরণ এবং এই অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা, মামলা, ধরপাকড়, হত্যা, ধর্ষণ, ভূমি বেদখল ও নিপীড়ন-নির্যাতন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের দুরাবস্থার জন্য বাউন্ডারী কমিশনও (ভারত-পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত বাউন্ডারী কমিশন) দায় এড়াতে পারে না। দেশ বিভাগের নীতি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যদি ভারতে অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে জুম্ম জনগণের ভূমি ও শিক্ষার অধিকারসহ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত হতো। উল্লেখ্য যে, দেশ বিভাগ নীতি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবার কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত যেহেতু একটি গণতান্ত্রিক দেশ সেহেতু ভারতের গণতান্ত্রিক পরিবেশে জুম্ম জাতিসমূহের আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হতো। বাস্তবেও আমরা দেখি যে, ভারতের গারো, খাসি, মিজো, মণিপুরী, সাঁওতাল, ত্রিপুরা ও বোড়ো ইত্যাদি আদিবাসী জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও ভূমির অধিকার ভোগ করছে। ভারতের মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, অরুনাচল ইত্যাদি রাজ্যসমূহ আদিবাসীরাই শাসনব্যবস্থাসহ সে অঞ্চলের অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এসব আদিবাসী অঞ্চলে বাইরের লোকের জায়গা ক্রয় বা স্থায়ীভাবে বসবাসের কোন সুযোগ নেই। সেসব বিধিনিষেধ আইন দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি এবং বাইরের বাসিন্দা কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ক্রয় বা মালিকানা লাভের যে বিধিনিষেধ ছিল সেটিও সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। অথচ এসব বৃটিশ আমলে প্রণীত ১৯০০ সালের শাসন বিধিতে স্বীকৃত ছিল। পাকিস্তান সরকার একটি ইসলামী সরকার হলেও ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রথাগত ভূমির অধিকার এবং বাইরের বাসিন্দা কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ক্রয় ও স্থায়ীভাবে বসবাসের বাধানিষেধকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল (তবে পাকিস্তান সরকার পরবর্তীতে জুম্ম জনগণের এই অধিকার বাতিল করে দেয়)। পার্বত্য চট্টগ্রাম যে একটি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল তা পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল। বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের এই ভূমির মালিকানা ও স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার বিধিনিষেধের বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম যে একটি জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল সংবিধানে তার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। অতীব আশ্চর্যজনক হলেও এটি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ও বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের প্রধান বাধা হল- সামন্তীয় মানসিকতা ও পাতি-বুর্জোয়া চিন্তাধারা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য প্রয়োজন- গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির মানুষের বাস। এসব জাতি ও সংস্কৃতির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামে যুক্ত করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক

ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নেই। তাই এম এন লারমা গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল চিন্তাধারার আলোকে জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সকল জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে যুক্ত করার প্রয়াস পান।

দেশ, দেশের মানুষ ও সংবিধান নিয়ে এম এন লারমার ভাবনা:

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এই নতুন দেশের সংবিধান, শাসনব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনীতি কিরূপ হওয়া দরকার তা নিয়ে এম এন লারমার এক বিশেষ ভাবনা ছিল। তিনি একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধশালী দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি এই নবীন দেশে একটি বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত সমাজের কথা ভেবেছিলেন। তাই তিনি ১৯৭২ সালে যখন দেশের সংবিধান রচনা করা হচ্ছিল তখন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত সেসব নিয়ে তিনি গণপরিষদে কথা বলেছিলেন। তিনি সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত সংবিধানের ভুল ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাসমূহ গণপরিষদে তুলে ধরেছিলেন।

সংবিধানে আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের স্বীকৃতি এবং জনগণের অন্যান্য প্রসঙ্গ:

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত সংবিধানে জাতিসত্তা বিষয়ে প্রস্তাব করা হল- 'বাংলাদেশের জনগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবে'। তখন এম এন লারমা এর প্রতিবাদ করলেন। তখন তিনি বলেছিলেন– 'আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ- কেউ বলে নাই আমি বাঙালি। ....আমি জানি না আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালি বলে পরিচিত করতে চায়'। তিনি 'বাঙালি' শব্দের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' শব্দ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে, ১৯৭২ সালে গণপরিষদ জাতিসত্তা স্বীকৃতির প্রশ্নে 'বাঙালি' শব্দ রেখে সংবিধান পাশ করে নেয়। সুতরাং ১৯৭২ সালের সংবিধান দেশের অন্যান্য জাতিকে অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র বাঙালি জাতিকে স্বীকৃতি প্রদান করলো।

বাহাত্তরের সংবিধানে জাতিসত্তা স্বীকৃতির প্রশ্নে শুধুমাত্র বাঙালি জাতিকে স্বীকৃতি প্রদান করায় বাংলাদেশের এই নূতন সংবিধান একটি সাম্প্রদায়িক সংবিধানরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। কারণ বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি জাতি (বাঙালি জাতি) বাস করে না। বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতির দেশ। এদেশে বাঙালি জাতি ছাড়াও চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরী ইত্যাদি জাতি বাস করে। মূলত আওয়ামী লীগ দলটি 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিলেও চিন্তার দিক থেকে আওয়ামী লীগ নেতারা সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। সে কারণে ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের মানুষকে একটি অসাম্প্রদায়িক ও বহু-জাতি বান্ধব সংবিধান উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ বাংলার মানুষ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সে রাষ্ট্রে একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবন দিয়েছিল, রক্ত দিয়েছিল। তবে এটি ছিল বাংলার আপামর জনগণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বাঙালি পুঁজিপতিদের আকাঙ্ক্ষা ছিল ভিন্ন। তাদের লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালি পুঁজিপতিদের শাসন কায়েম করা, যাতে তারা বাধা-বিপত্তিহীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। বাংলার পুঁজিপতিরা, পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিনিধি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা প্রতিনিয়ত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছিল। এই বাঙালি পুঁজিপতিদের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলার পুঁজিপতিদের পুঁজি বিকাশের জন্য নিজেদের একটি রাষ্ট্রের, যেখানে তারা বাধা-বিপত্তিহীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধ হলেও স্বাধীনতার পর যে সরকার গঠিত হয় এবং যে সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে সে সরকার ও সরকারের গণপরিষদের সদস্যরা ছিলেন বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধি। এই শ্রেণি একদিকে পুঁজিপতি অপরদিকে সাম্প্রদায়িক ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী। যার কারণে সংবিধানের মূল ভিত্তি হিসেবে– গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বলা হলেও দেশের সংবিধানে কৃষক শ্রমিক তাঁতি জেলে ও স্বল্প আয়ের মানুষের স্বার্থ ও অধিকারের কথা সংবিধানে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা হয়নি। স্বাধীন দেশের পুঁজিপতিদের পুঁজি কিভাবে বাধাহীনভাবে বিকাশ ঘটানো যায় নূতন সংবিধানে সে দিকটিই অধিক পরিমাণে গুরুত্ব পেয়েছিল। সেই একই কারণে দেশের আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নারীদের অধিকারের বিষয়টি সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়নি। শাসকগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা সাম্প্রদায়িক ছিল বলে শাসকগোষ্ঠীর মানুষেরা বাঙালি জাতি ব্যতীত অপরাপর জাতিকে সংবিধানে স্বীকৃতি দিতে পারেনি এবং ভূমির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদানে আন্তরিক হতে পারেনি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি অন্ধকার দিক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এটি দেশে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সরকার গঠন ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধা হিসেবে কাজ করবে।

একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনার আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে সামনে রেখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও শ্রেণির মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এম এন লারমা প্রস্তাবিত সংবিধানের ওপর আলোকপাত করার সময় দেশের আদিবাসীসহ কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে ও নারী এবং দেশের সকল শ্রেণির মানুষের অধিকার সংবিধানে যথাযথরূপে সন্নিবেশ করার দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'এই সংবিধানে মানুষের মনের কথা লেখা হয়নি। কৃষক, শ্রমিক, মেথর, কামার, কুমার মাঝি মাল্লার জন্য কোন অধিকার রাখা হয়নি।'

এম এন লারমা ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর তারিখে সংবিধান বিলের উপর আলোচনা করতে যেয়ে আরো বলেছিলেন- 'রোদ বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এই সংবিধানে নেই'। তিনি আরো বলেছিলেন- সংবিধানে "একদিকে হিংসাদ্বেষ বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে"।

এম এন লারমা সেদিন বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা গণপরিষদে তুলে ধরেছিলেন। সংবিধান যদি যথাযথরূপে রচিত না হয়, বিশেষত বাহাত্তরের সংবিধান যদি ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে বিশ্বাঘাতকতা করে, সে বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন– 'মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে যে পবিত্র দলিল আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি, সেটা যেন ১৯৫৬ সালের এবং ১৯৬২ সালের দলিলের মত না হয় এবং সেদিনের মত করুণ অবস্থা যেন আমাদেরকে আমাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে না হয়।' তিনি আরো বলেছিলেন– 'এই সংবিধানে মানুষের অধিকার যদি খর্ব হয়ে থাকে, তাহলে আজকে ৩০ লক্ষ শহীদের কথা স্মরণ করে, অতীতের ইতিহাস স্মরণ করে বলব যে, ইতিহাস কাউকে কোনদিন ক্ষমা করেনি, করবেও না। ....ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর'।

এম এন লারমার এসব কথা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনা করা হলো। এর তিন বছর যেতে না যেতে ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হলেন। মাত্র ৩ বছরের মাথায় সামরিক শাসন জারি করা হল। ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্রের কবর দেয়া হল এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করা হল। আমরা জানি, ১৯৭২ সালের সংবিধানে আদিবাসী, নারী, কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, কামার, কুমার, মাঝি মাল্লার অধিকার যথাযথভাবে সন্নিবেশ করা হয়নি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য যারা রক্ত দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী, কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে ছিলেন। আদিবাসীরাও এই যুদ্ধে রক্ত দিয়েছিলেন, জীবন দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে নারী, কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি জেলেসহ সাধারণ মানুষের অধিকার যথাযথভাবে সন্নিবেশ না করার কারণে বাহাত্তরের সংবিধান ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য- গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাথে। দেশের আদিবাসী জাতিসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান না করে, উপরন্তু বাংলাদেশের অবাঙালি জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে তৎকালীন সরকার কর্তৃক গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। যার কারণে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর পরিণতিও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অনুরূপ হয়েছিল। এম এন লারমা জীবিত অবস্থায় তিনি এসব দেখে গেছেন। একজন রাজনীতিক হিসেবে, বিশেষত আইন প্রণেতা হিসেবে এম এন লারমার রাজনৈতিক জীবন সার্থক। সেদিন তিনি গণপরিষদে যেসব বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন সেসব আজ বাস্তবে ফলছে। কথায় বলে– 'কাঙালের কথা বাসী হলে ফলে'। সেদিন এম এন লারমার কথায় কেউ কান দেননি; বরং সেদিন গণপরিষদের সরকারি দলীয় সদস্যরা এম এন লারমার বক্তব্যকে ঘিরে হাসাহাসি করেছিলেন।

এম এন লারমা গণপরিষদে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বিষয়েও আলোচনা করেছিলেন– যা বর্তমান সময়ে মহীরুহ রূপ ধারণ করেছে। দেশে যাতে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বৃদ্ধি পেতে না পারে সে ব্যাপারে যথাযথরূপে আইনী ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব তিনি করেছিলেন। এম এন লারমা মনে করেন, দেশের অর্থনীতি মজবুত এবং জনগণের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে ঘুষ, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করার জন্য সংবিধানে শক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছিলেন– 'আমাদের দেশে যারা ঘুষখোর, যারা দুর্নীতিপরায়ণ তাদের যদি আমরা উচ্ছেদ করতে না পারি, তাহলে এই সংবিধানের কোন অর্থ হয় না। ....ভবিষ্যতের নাগরিক, যারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর তারা বলবে যে, যারা এই সংবিধান রচনা করে গেছেন তারা ক্ষমতায়

মদমত্ত হয়ে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন’। এম এন লারমার এসব বক্তব্যের বিষয়ে গণপরিষদের অন্যান্য সদস্যরা তখন কোন গুরুত্ব প্রদান করেননি।

এম এন লারমা নারী অধিকারের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজকে অধিকার বিষয়ে সচেতন ও সংগঠিত করার জন্য তিনি ১৯৭৫ সালে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি’ গঠন করেন। নারী অধিকার বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য হল– ‘সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে (সংবিধানে) নেই। নারীর যে অধিকার তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে’। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরও আমাদের দেশে নারী পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নানাভাবে নিগৃহীত ও নির্যাতিত। নারীরা এখনো অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার। তারা সামাজিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ স্বাধীন বাংলাদেশে দেশের নারীরা এখনো ধর্ষণসহ নানা ধরনের শ্লীলতাহানি ও মানবাধিকার লংঘনের শিকার হচ্ছে। সংবিধানে নারী অধিকারের বিষয় সুদৃঢ়ভাবে সন্নিবেশিত না হওয়ার কারণে নারীদের সামগ্রিক অবস্থা আজও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত।

একদিকে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী বাতিল, অপরদিকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোটের দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকারের সংবিধান সংশোধনের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। বরং তিনি স্বৈরাচারী এরশাদের ‘রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ সংবিধানে অটুট রেখে পবিত্র সংবিধানকে কলুষিত করলেন। শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক সংবিধানে ‘রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ যুক্তকরণ জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তাধারা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। কারণ শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেকারণে তিনি সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যখন সম্পাদিত হয় তখন জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনা সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। সেকারণে তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির আলোকে প্রণীত আইনসমূহকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি তখন অঙ্গীকার করেছিলেন- ভবিষ্যতে যদি তাঁর দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে সরকার গঠন করতে পারে তখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির আলোকে প্রণীত সকল আইনকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করবেন। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে শেখ সরকারের মহাজোট দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য পেয়েছিলেন। বর্তমানেও শেখ হাসিনা সরকারের জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তো বটেই, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তথাপি শেখ হাসিনা তার অঙ্গীকার রক্ষা করে সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির আলোকে প্রণীত আইনসমূহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করেননি। আমাদের মনে রাখা দরকার- বিশ্বাসঘাতকতা ভাল নয় এবং তার ফলও সুখকর নয়।

এম এন লারমার জন্ম, জীবন সংগ্রাম ও মৃত্যু:

মানুষ হিসেবে জন্মলাভ ও জীবন লাভের সার্থকতা হল, জীবন দানের মধ্য দিয়ে। সেদিক থেকে এম এন লারমার জন্ম, মৃত্যু ও জীবন সম্পূর্ণরূপে সার্থক। তিনি জুম্ম জনগণের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তিনি জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন- আজীবন সংগ্রামে যুক্ত থেকে এবং জীবন দানের মধ্য দিয়ে সংগ্রামী জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হয়। ১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বর্তমান রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলার মাওরুম গ্রামে ধর্মপ্রাণা, সমাজহিতৈষিণী ও রত্নগর্ভা শুভাষিণী দেওয়ান-এর গর্ভে এম এন লারমা জন্মলাভ করেন। স্নেহময়ী শুভাষিণী দেওয়ানের গর্ভে জুম্ম সমাজের চার রত্ন জন্মলাভ করেন। প্রথমজন হলেন– একমাত্র কন্যা জ্যোতিপ্রভা লারমা (মিনু)। তিনি আজীবন পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছেন। দ্বিতীয়জন হলেন– শুভেন্দু প্রবাস লারমা (বুলু), তৃতীয়জন হলেন– এম এন লারমা এবং চতুর্থজন হলেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। জুম্ম জনগণের প্রিয় নেতা এম এন লারমা ও তাঁর বড় বুলু লারমা বিভেদপন্থী ক্ষমতালোভী চার কুচক্রীর ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর নির্মমভাবে নিহত হন। সবার ছোট সন্তু লারমা বর্তমানে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সন্তু লারমা ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি ও জুম্ম জনগণের আন্দোলনের সাথে যুক্ত। বড় ভাই এম এন লারমা নিহত হলে তিনি সংগঠন ও আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান।

পিতার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরম স্কুলে এম এন লারমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শুরু। এই স্কুলে তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ

বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং একই স্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে মেট্রিক পাশ করেন। তিনি ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন এবং ১৯৬৮ সালে বিএ ও বিএবিএড পাশ করেন। এম এন লারমা ১৯৬৯ সালে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনে একজন আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক কারণে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ মুক্তি পান। তিনি ১৯৬৬ সালে দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনী হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি শিক্ষক হিসেবেও বেশ সুনাম অর্জন করেন। মহান নেতা এম এন লারমা ও তাঁর ছোট ভাই সন্তু লারমা পিতা চিত্ত কিশোর ও জ্যাঠামশাই কৃষ্ণ কিশোর চাকমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সে লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে এক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এই রাজনৈতিক সংগঠনের প্রথম কমিটিতে তিনি সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং সভাপতি পদে নির্বাচিত হন বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা (বি কে রোয়াজা)। বি কে রোয়াজা একজন উচ্চশিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খাগড়াছড়ি জেলার ঠাকুরছড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন। খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরছড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও খাগড়াছড়ি কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তিনি বহুবিধ ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কারণে তিনি পাকিস্তান আমলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

উল্লেখ্য যে, এম এন লারমা হলেন প্রথম সংগঠক যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতির অংশগ্রহণ ও সমর্থন নিয়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সফল হলেন। এর আগে বহু রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যক্তিত্ব সামাজিক বা রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেউ সফল হতে পারেননি। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। এই নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল থেকে এম এন লারমা এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে চাথোয়াই রোয়াজা জনসংহতি সমিতির সমর্থন নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে এম এন লারমা আত্মগোপনে গিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তবে তিনি দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দলের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা ক্ষমতালোভী বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর নৃশংসভাবে নিহত হন। এম এন লারমা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। তিনি সংগ্রামের মাঠেই প্রাণত্যাগ করেন। ক্ষমতালোভী বিভেদপন্থী গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করে এম এন লারমাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারাকে হত্যা করতে পারেনি। জুম্ম জনগণের লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্তমানে তাঁর চিন্তাধারাকে বুকে ধারণ করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার:

জুম্ম সমাজের সামাজিক বাস্তবতার কারণে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে হিংসা, রেষারেষি, প্রতিশোধ পরায়ণতা, ভোগ বিলাসী মানসিকতা, স্বার্থপরতা এবং অর্থ ও ক্ষমতার লোভ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র সংঘাত, অপহরণ, গুম, হত্যা, হামলা, মামলা ইত্যাদি চলছে। এসবের পেছনে জুম্ম সমাজের সামাজিক বাস্তবতা যেমনি কাজ করছে, তেমনি কাজ করছে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ও উস্কানী। শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জুম্ম সমাজের স্বার্থপর ও অর্থলোভী-ক্ষমতালোভী অংশকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানপূর্বক দেশপ্রেমিক সংগ্রামী নেতৃত্ব ও জনতার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। এসব ক্ষমতালোভী জাতীয় বেঈমানরা আজ স্রেফ ব্যক্তিস্বার্থের কারণে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মধ্য দিয়ে জুম্ম জাতিসমূহের অস্তিত্বকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমূহকে নির্মূলীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুম্ম সমাজের মধ্যে 'ভাগ করা, শাসন করা ও ধ্বংস করা' এই নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে। অপরদিকে একই কর্মসূচির অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসন– সকল ক্ষেত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুম্ম জনগণের ভূমি জবরদখল করে চিরায়ত ভূমি থেকে জুম্মদের

উচ্ছেদপূর্বক তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক হামলা, ধর্ষণ, হয়রানি, হামলা, মামলা, নানা কায়দায় নিপীড়ন-নির্যাতন, জুম্ম গ্রাম জ্বালাও-পোড়াও ও সম্পদ লুণ্ঠন, বহিরাগত সেটেলার ও রোহিঙ্গা পুনর্বাসন ইত্যাদি কার্যক্রম পুরোদমে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

'অপারেশন উত্তরণ' নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ধরনের সামরিক শাসন ও সামরিক কর্তৃত্ব কার্যকর করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অথর্ব ও অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহকে বাস্তবায়ন না করে শাসকগোষ্ঠী ও তার সামরিক-বেসামরিক আমলা বাহিনী পার্বত্য চুক্তি ও চুক্তির আলোকে প্রণীত আইনসমূহকে লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের এক কঠিন ও জটিল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এহেন জটিল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ একমাত্র এম এন লারমার প্রদর্শিত পথেই সম্ভব। প্রয়াত নেতা এম এন লারমা জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন- কেবলমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করা সম্ভব এবং কেবলমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যুগে যুগে ছাত্র ও যুবসমাজ জাতির ক্রান্তিলগ্নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র ও যুবসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যেতে পারে এবং বরাবরের মত জুম্ম জনগণ এই আন্দোলনে থাকবে। তাই শুরু হোক এম এন লারমার প্রদর্শিত পথে ও আদর্শে নূতনরূপে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমরা জয়যুক্ত হবোই। সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক।

বাঁ থেকে শুভেন্দু প্রভাস লারমা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (১৯৫৩)

বৃহৎ বাঁধের বিরুদ্ধে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রশ্নটা কী?

পাভেল পার্থ

তেহরী বাঁধ ভারতের সর্বোচ্চ বাঁধ। উত্তরাখন্ড রাজ্যের তেহরির কাছে ভাগীরথী নদীর উপর এই বাঁধ তৈরি হয়েছে। প্রথম থেকেই এই বাঁধের বিরুদ্ধে গণরোষ উসকে ওঠায় নানাসময়ে বাঁধের কাজ বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে ২০০৬ সনে কাজ শুরু হয়ে ২০১২ সনে কোটেশ্বর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে এর কাজ শেষ হয়। মার্কিন মুলুকের গ্র্যান্ড কুলির পর ভারতের নর্মদা নদীর ওপর নির্মিত সর্দার সরোবর হচ্ছে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাঁধ। ১৯৮৫ সন থেকেই সর্দার সরোবর বাঁধের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু হয়, মেধা পাটেকরদের মাধ্যমে যা 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' হিসেবে পরিচিতি পায়। দীর্ঘসময় পাড়ি দিয়ে ২০১৭ সনে এই বাঁধের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নিয়ে এই চলতি আলাপখানি কেন তেহরী বা নর্মদা বাঁধ নিয়ে শুরু হলো? কারণ আছে। তেহরী বাঁধের প্রাথমিক সমীক্ষা হয়েছিল ১৯৬১ সনে। এমনকি সর্দার সরোবর বাঁধেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৬১ সনে। ভারত যখন তেহরী ও নর্মদা বাঁধ তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন বাংলাদেশে (তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান) কাপ্তাই বাঁধের (কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প!) নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। এই বাঁধের কারণে তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমারা উদ্বাস্তু। বাঁধের জলের তলায় চোখের সামনে নিখোঁজ হয়ে যায় জন্মগ্রাম মাওরুম। তেহরী বা নর্মদা বাঁধ বিরোধী আন্দোলন বিশ্বপরিচিতি পেলেও 'কাপ্তাই বাঁধ বিরোধী সংগ্রামের' কোনো হদিশই নেই আজ কোথাও! অধিপতি ইতিহাসে এই নিদারুণ দ্রোহী আখ্যান একেবারেই গায়েব। যে লাখো পাহাড়ি আদিবাসী জীবনের দামে আমরা বিদ্যুতের রোশনাই পেলাম, অকৃতজ্ঞের মতো বেমালুম সেই রক্ত-আহাজারি আমরা প্রতিদিন বিস্মৃত হয়েছি।

> “মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই দুনিয়ায় প্রথম বৃহৎ বাঁধের বিরুদ্ধে এমন গভীর বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন, 'বাঁধ মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়'। কেবলমাত্র প্রাণ-প্রকৃতি আর যাপিতজীবনের বৈচিত্র্য দিয়ে এই 'মেরুদণ্ড' রূপকল্পকে কী আন্দাজ করা সম্ভব?

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নাম উচ্চারণ হলে কত কিছু যে উঁকি দেয়, কত বাহাস, কত দর্শন, কত মুখরতা। আজ পরিবেশ ডিসকোর্সে বৃহৎ বাঁধ ও অবকাঠামো উন্নয়নের কত বিরূপ প্রভাব নিয়ে তর্ক হচ্ছে, বৃহৎ বাঁধ বিরোধী জনআন্দোলনগুলো আজ দুনিয়া জুড়ে দানা বেঁধেছে। বৃহৎ বাঁধ বিরোধিতা আজ এক প্রধান বৈশ্বিক পরিবেশপ্রশ্ন। কিন্তু সেই কবে ষাটের দশকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই বৃহৎ বাঁধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। বৃহৎ বাঁধের উন্নয়ন প্রকল্পকে প্রশ্ন করেছিলেন। রাষ্ট্র কী করপোরেট এজেন্সি বা অধিপতি উন্নয়ন বাহাদুরি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। বরং জোর জবরদস্তি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ বিরোধী আদিবাসী গণরোষই পরবর্তীতে নানামুখী সংগ্রামে রূপ নেয়। পরবর্তীতে পদ্মার উজানে গঙ্গা নদীতে যখন ভারত ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ করে তার বিরুদ্ধে বাঙালি-আদিবাসীদের সম্মিলিত দ্রোহ দেখা যায়। বিশেষত ১৯৭৬ সনে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা লংমার্চে বাঙালিদের সাথে আদিবাসী জনগণেরও এক জোরালো অংশগ্রহণ ছিল। বৃহৎ বাঁধ বিরোধী পাবলিক লড়াইগুলো বৈশ্বিক পরিবেশচিন্তা তৈরি করলেও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর নেতৃত্বে কাপ্তাই বাঁধ বিরোধী প্রশ্নটি অনেকখানি ভিন্নতা নিয়ে হাজির। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই বাঁধ নামক উন্নয়ন-জুলুমের ফলে নিজে উদ্বাস্তু হয়েছেন এবং এই লড়াইয়ে মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরাই সামিল হয়েছিলেন। রাষ্ট্রের সংবেদনশীল মুক্তবুদ্ধির বাঙালিরাও অংশ নেননি। হয়তো বাঁধ-বিরোধী যন্ত্রণা আদিবাসী জীবনের নিত্যসময়ের পরিবেশ-প্রশ্নকেই রাষ্ট্রের সামনে হাজির করেছিল। নদীময় বাংলাদেশ নানাভাবে বাঁধের উন্নয়ন যন্ত্রণায় কাহিল ও মুমূর্ষু। চলতি আলাপে আমরা খুব সংক্ষেপে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কিত বৃহৎ বাঁধ গুলোর কিছু প্রসঙ্গ টানবো।

কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প ও লাখো নিখোঁজ জীবন

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি পাহাড়ি এলাকার আদিবাসী জনগণের জীবন মরণের স্মৃতি বিজড়িত নদীটির নাম কর্ণফুলী বা হর্ণফুলি গাঙ। সরকার এই নদীকে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেশ কিছু জরীপের পর ১৯৫২ সালে বাঁধের জন্য কাপ্তাই এলাকাকে নির্বাচন করে। বাঙালিরা তখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে জান দিচ্ছে। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার

আমেরিকার কাছে অর্থ সহযোগিতার প্রস্তাব রাখে। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি বাঁধ তৈরির জন্য নিয়োগ পায়। ১৯৫৭ সালে ইউতাহ্ ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেট বাঁধ নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৬১ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ১৯৬২ সালে নির্গমন দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। আর সাথে সাথে হর্ণফুলি গাঙের নিপীড়িত বিক্ষুব্ধ পানিতে তলিয়ে যায় বসত জমিন জুম জংগল জীবন জনপদ, রাঙ্গামাটি শহর আর চাকমা রাজবাড়ি। মাটি ভরাট করে তৈরি করা ৬৭০.৬ মিটার দীর্ঘ এই সর্বনাশা বাঁধের ফলে ২৫০ বর্গমাইল এলাকা তলিয়ে যায়। এর ভেতর পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রায় ৫৪ হাজার একর কৃষি জমি ছিল যা পার্বত্য এলাকার কৃষি জমির ৪০ ভাগ। কর্তৃপক্ষ ৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বললেও কেউ নগদ ক্ষতিপূরণ পাননি। জুম-কৃষি-জংগল-প্রাণবৈচিত্র্য নিশ্চিহ্ন হওয়া ছাড়াও এ লাখেরও বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হন আপন বসতভিটা ও জন্মমাটি থেকে। বাঁধের অবকাঠামো উন্নয়ন, ৩নং অংশের স্থাপনার জন্য মার্কিন সাহায্য সংস্থা ইউএসএইড অর্থ সহযোগিতা করে। ১৯৬২ সালে ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন দিয়ে যাত্রা শুরু করে ১৯৮৮ সালে কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ২৩০ মেগাওয়াট। কাপ্তাই বাঁধের ফলে উদ্বাস্তু হয় এক লাখ পাহাড়ি আদিবাসী জনগণ। উচ্ছেদের আহাজারি বুকে ধারণ করে আত্মপরিচয় আর রাষ্ট্রের সেনাজুলুমের বিরুদ্ধে এ নিয়ে পরবর্তীতে পাহাড়ে শুরু হয় এক দীর্ঘ গণসংগ্রাম। অসংখ্য গণহত্যা আর প্রাণহানির ভেতর দিয়ে ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর সরকার পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বন্যা'নিয়ন্ত্রণ' ও গণপ্রতিরোধ

ক্রুগ মিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'পূর্ব পাকিস্তান পানি ও শক্তি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (East Pakistan Water and Power Development Authority) গঠন করা হয়।[১] ১৯৬৪ সালে প্রথম জাতীয় পর্যায়ে পানি পরিকল্পনা শুরু হয় যখন ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভলপমেন্ট অথরিটি (ওয়াপদা) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পানি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে।[২] কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনাতেই দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশ অঞ্চল ও নদীসমূহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্থানীয় জনগণের নদী-অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তাই দেখা যায় সরকার যতগুলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম হাতে নেয় তার প্রতিটিই ভেস্তে যায় এবং স্থানীয় জনগণের ভোগান্তি আরো বেড়ে যায়। সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত ঘেঁষে কুশিয়ারা নদীতে তৈরি করা হয়েছিল সরকারি প্রকল্পের বাঁধ। এর ফলে জকিগঞ্জ থানার বিরশ্রী ইউনিয়নের কিছু কৃষকেরা সেচের জন্য পানি পেলেও বরহল ইউনিয়নের মানুষের জমি প্রতিবছর বন্যায় তলিয়ে যেত। বরাক নদী থেকে নেমে আসা বালি ও পলিতে কৃষি জমিগুলো ভরে যেত। বাধ্য হয়ে বরহল ইউনিয়নের নারী পুরুষ সর্বনাশা এই বাঁধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন। ২৬ জুলাই ১৯৯৩ সালে বরহল ইউনিয়নের হাজার হাজার নারী পুরুষ প্রতিবাদ সমাবেশ করেন সীমান্তবর্তী বাঁধ এলাকায়, গ্রামের ২০০০ নারী পুরুষ বাঁধ কেটে দেয়ার প্রস্তুতি নিলে কোনো ধরনের জানান না দিয়ে সতর্ক করে না দিয়ে সীমান্তরক্ষী বাংলাদেশ রাইফেলসের বন্দুক গর্জে উঠে মানুষের জমায়েতে। কৃষি জমি বসত ভিটা সর্বনাশা বাঁধের কবল থেকে বাঁচাতে শহীদ হন চারজন গ্রামবাসী, আহত হন প্রায় ৫০-এরও বেশি মানুষ।[৩]

জলের টুঁটি টিপে ধরা টিপাইমুখ

ভারতের বিদ্যুৎ আইনের ২৯ ধারা বলে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০৩ সালের ১৮ জানুয়ারি উত্তর-পূর্ব বিদ্যুৎ কর্পোরেশন লিমিটেডের 'টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পটি' অনুমোদন দেয় ভারত সরকার । স্থানীয় জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতের উত্তর-পূর্ব বিদ্যুৎ কর্পোরেশন (এনইইপিসিও) মণিপুর রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বরাক নদীর উজানে চুরাচাঁদপুর জেলার বরাক ও তুইভাই নদীর মিলনস্থলের টিপাইমুখ এলাকায় প্রকল্পের কাজ শুরু করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০ মিটার উঁচু এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৬,৩৫১ কোটি রুপি। মাত্র ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বানানোর জন্য চিরস্থায়ী জলাবদ্ধ বা মরুকরণ শুরু হতে পারে বরাক নদীর ভাটি অঞ্চলে মানে বাংলাদেশের হাওর এলাকায়। বলা হচ্ছে টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের ২০,৭৯৭ হেক্টর প্রাকৃতিক বনভূমি, ১১৯৫ হেক্টর গ্রাম, ৬১৬০ হেক্টর কৃষিবাগান, ২,৫২৫ হেক্টর কৃষিজমি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের ৮টি গ্রাম, ১৪৬১

১ Existing embankments, Monowar Hossain, p53-76, in :*Rivers of life : Bangladeshi journalists take a critical look at the flood action plan*, Editor-Kelly Haggart, BCAS/PANOS, Dhaka, 1994

২ *বাংলাদেশ : গঙ্গা হুমকীর মুখোমুখি*, *মোস্তফা কামাল মজুমদার*, পৃ. ২৯-৬১। এটি নেয়া হয়েছে, গঙ্গার পানি নিয়ে সংঘাত : দক্ষিণ এশিয়ার পানি বিষয়ক সম্ভাব্য বিরোধের পর্যালোচনানামক বই থেকে। (মূল গ্রন্থ : Disputes over the Ganga, Edited by Vim Subba & Kishor Prodhan, PANOS, Nepal), অনুবাদ : মোস্তফা কামাল মজুমদার, প্যানোস, নেপাল,২০০৪

৩ Existing embankments, Monowar Hossain, p53-76, in : Rivers of life : Bangladeshi journalists take a critical look at the flood action plan, Editor-Kelly Haggart, BCAS/PANOS, Dhaka, 1994

টি আদিবাসী পরিবার, ৬০ কি.মি. দীর্ঘ ৫৩ নম্বর মহাসড়ক এবং প্রায় ৬৭টি গ্রামের মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়বে।

মাওফু বাঁধ ও ধলা নদীর ন্যায়বিচার

প্রতিবেশী ভাটির বাংলাদেশের কোনো বিবেচনা কি অনুমতি ছাড়াই, ভারত উজানে তৈরি করে যাচ্ছে একটার পর একটা বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প। ফারাক্কা বাঁধের ক্ষত নিয়ে টিকে থাকা মুমূর্ষু বাংলাদেশ যখন টিপাইমুখ বাঁধসহ ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের জন্যও শংকিত ও ক্ষুব্ধ; তখনি বাংলাদেশের উজানে উত্তর-পূর্ব ভারতে গড়ে তোলা হচ্ছে প্রশ্নহীন সব উন্নয়ন বাঁধ। 'মন্‌তডু-লেসকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প' উদ্বোধন হতে না হতেই গত ১৯/৯/২০১২ তারিখে ভারতের বিদ্যুৎমন্ত্রী ড. এম ভিরাপ্পা মইলী মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড়ের উমইয়্যু নদীতে নির্মিতব্য 'মাওফু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প' উদ্বোধন করেন *(সূত্র: মেঘালয় টাইমস ১৭/৯/২০১২)*। উমইয়্যু নদীতে বাঁধ দিয়ে উক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সিলেটের ধলা নদীর প্রতিবেশীয় বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণত বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

মন্‌তডু-লেসকা বাঁধ ও শংকিত সিলেট

মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ি জেলা জৈন্তিয়ার জোয়াই শহর থেকে ৪০ কি.মি. দূরে লেসকার ১০০ মিটার ভাটিতে মন্‌তডু, লামু ও উমসরিয়াং নদীর ত্রিমুখী সঙ্গমে পেডেকাংসাপ গ্রামের কাছে 'মন্‌তডু-লেসকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পর' কাজ করছে 'মেঘালয় এনার্জী কর্পোরেশন লিমিটেড'। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রথম ইউনিটের বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেঘালয় রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী ড. মুকুল সাংমা *(সূত্র: শিলং টাইমস-০১/৩/১২; টেলিগ্রাফ (উত্তর-পূর্ব)-০১/৩/১২; হিল পোস্ট-২৯/২/১২)*। জৈন্তিয়ার আমলারেম ব্লকের পাহাড়ি নদী মন্‌তডুর খরস্রোতকে আটকে ৬৩ মিটার উঁচু এ বাঁধ চালু হলে পুরো অঞ্চলটিই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠবে। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মন্‌তডু-লেসকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে এবং দুনিয়ার এক ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল ডাউকিচ্যুতির কাছাকাছি এবং সর্বাধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চল চেরাপুঞ্জির দক্ষিণঢালে অবস্থিত।

বৃহৎ বাঁধ ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিবেশ-প্রশ্ন

বৃহৎ বাঁধের বিরুদ্ধে প্রাণ, প্রকৃতি, বৈচিত্র্য ও জীবনজীবিকার ন্যায্যতাকেই পরিবেশ ডিসকোর্সে প্রধান করে দেখা হয়। কিন্তু ১৯৬১ সনে দুনিয়া যখন এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চুপ তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মূলত বৃহৎ বাঁধের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কাছে কী প্রশ্ন তুলেছিলেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার একটা নিম্নোক্ত সংসদীয় বক্তৃতাকে স্মরণ করতে হবে।

> **শ্রী লারমা :** যে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নতি সাধিত হচ্ছে সেই কাপ্তাই বাঁধ এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখনো শেষ হয়নি। কাপ্তাই বাঁধ ঐ এলাকার মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে দিয়েছে। কাপ্তাই বাঁধ আমাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এ বাঁধের এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থাই সরকার করেনি। একবার হয়তো তাদের কিছু পুনর্বাসন করা হয়, আবার সরকারের নির্দেশে তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। এটা একটা মহা সমস্যা। এটা একটা জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের উপর চেপে আছে। পাকিস্তান সরকার এই সমস্যার সৃষ্টি করে দিয়েছে। এবং সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার কোন বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকার এটা দূর করে দিয়ে কাপ্তাই-এ হাজার হাজার মানুষকে বাংলাদেশে সার্বিক উন্নতির সঙ্গে জড়িত করেননি–– এই আমার আবেদন। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিও দৃষ্টি দিন। সেখানে রাস্তাঘাট বলতে তেমন কিছু নেই।[৪]

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই দুনিয়ায় প্রথম বৃহৎ বাঁধের বিরুদ্ধে এমন গভীর বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন, 'বাঁধ মানুষের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়'। কেবলমাত্র প্রাণ-প্রকৃতি আর যাপিতজীবনের বৈচিত্র্য দিয়ে এই 'মেরুদণ্ড' রূপকল্পকে কী আন্দাজ করা সম্ভব? কতখানি জমি ডুবেছে, কত মানুষ গৃহহীন হলো আর কত প্রাণবৈচিত্র্য বিনষ্ট হলো? বৃহৎ বাঁধ কারিগর অধিপতি রাষ্ট্র কী আজো মানবেন্দ্রর এই রূপকল্পকে বোঝার চেষ্টা করেছে? যদি সরাসরি প্রশ্ন করা হয় রাষ্ট্র কী বাঁধ বিরোধী? বাংলাদেশ বা ভারত? বৃহৎ বাঁধের ফলে মানুষসহ চারধারের প্রাণসত্তার সম্পর্কের জটিল মেরুদণ্ড যে বারবার চুরমার হয়ে যায় আমাদের বাঁধমনস্কতা কী তা টের পায়? এ তো কেবলমাত্র কোনো পরিবেশপ্রশ্ন নয়, এ তো একটা ভূগোলের বিকাশ ও পরিণতির মৌলিক দর্শন ও রাজনীতি। আজ বৈশ্বিক বৃহৎ বাঁধ বিরোধী পরিবেশ আন্দোলনের বৃহৎ ময়দানে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে খুব বেশি জীবন্ত আর দগদগে মনে হয়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সামগ্রিক পরিবেশ দর্শনকে আমাদের গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও পাঠ করা জরুরি। আজ পরিবেশ ও জলবায়ুগতভাবে মুমূর্ষু দুনিয়ার এক ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিবেশ দর্শন ও সংগ্রামী বীক্ষা আমাদের আরো বেশি টিকে থাকবার সঞ্জিবনী জোগাতে পারে।

....

লেখক ও গবেষক। প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
ই-মেইল: *animistbangla@gmail.com*

৪ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয় : বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা।। খণ্ড ২ সংখ্যা ১৭। শনিবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৩ ইং

১০ই নভেম্বরঃ এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা

বাচ্চু চাকমা

১০ই নভেম্বর জুম্ম জাতির শোকের দিন, বেদনার দিন ও মনের মধ্যে যন্ত্রণাময় পীড়া অনুভবের একটি দিন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতির অশ্রুসিক্ত হওয়ার একটি দিনও বটে। কেননা ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর একাকার হয়েছিল মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর আটজন সহযোদ্ধাদের রক্ত ও আকাশের অশ্রুর প্লাবনে। ১০ নভেম্বর ঝিরিঝিরি বৃষ্টিস্নাত রাতে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে যখন বুলেটের আঘাতে ঘাতকরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, তখনও আকাশ হতে বৃষ্টি ঝরছিল, তা যেন ছিল প্রকৃতিরই অশ্রুপাত। ভেজা আকাশ-বাতাস কেঁদেছে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম বইয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘাতকদের উদ্যত অস্ত্রের সামনে লীডার বলেছিলেন, "কি, তোমাদের ক্ষমা করে আমরা অন্যায় করেছি? আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে? যাক, তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করো না কেন জাতির দুর্দশাকে তোমরা কখনও ভুলে যেও না আর জাতির এ আন্দোলনকে কখনো বানচাল হতে দিও না"। লীডারের এ কথা শুনে উপস্থিত দুইজন বিভেদপন্থী নীরবে চলে যায়। এরপর মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে কে একজন এসে লীডারের গায়ের উপর উঠে কোন কথা না বলে ব্রাশ ফায়ার করে দ্রুত পালিয়ে যায়। নেমে আসলো জুম্ম জাতির শোকের ছায়া। যুগ যুগান্তরে জ্বলবে এই শোকের আগুন। ১০ নভেম্বর জুম্ম জাতির শোকের বাণী পাঠ করার দিন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৬তম মৃত্যু দিবস। সেই ১০ নভেম্বর কালো রাতে শহীদ হয়েছিলেন প্রয়াতনেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ আট জন সহযোদ্ধা, এ যাবৎ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন এবং পঙ্গুত্ববরণ করেছেন তাদের সকলকে আজ গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। মহাননেতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দুনিয়ার শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জুম্ম জনগণের মুক্তি। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিনব গেরিলা যুদ্ধের পথ অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন সুদীর্ঘ পদযাত্রা, তাঁর লক্ষ্যবস্তুতে এগিয়ে যাওয়ার পথে কন্টক হয়ে দাঁড়িয়েছিল জুম্ম জাতির বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক ও বিভেদপন্থী চক্র।

> মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কেবল একজন ব্যক্তি নন, এক মহান আদর্শের নামও। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা জুম্ম জাতি তথা জাতির বীর সেনানীরা।

এটাও সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণ-তরুণীরা আজও হাঁটছে মহান নেতা এম এন লারমার দেখানো পথ ধরে। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি জুম পাহাড়ে শত শত বিপ্লবী তরুণেরা পার্বত্যাঞ্চলের গভীর অরণ্যে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছিল এখনও কাটাচ্ছে মহান নেতার নির্দেশে। রাতে-বেরাতে গভীর জঙ্গলে হেঁটে চলেছে মাইলের পর মাইল, এ পাহাড় হতে ঐ পাহাড়ে, রোদ-ঝড় গোটা প্রকৃতির অশুদ্ধ আর বিশুদ্ধ বায়ুতে ভেজা শরীর নিয়ে নির্ঘুম রাত কাটানোর পর ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মন কখনো ভেঙে পড়েনি, বৃষ্টিতে ভেজা পোশাক অন্তরের/মনের উত্তাপে সেই ভেজা পোশাকগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। এই নিষ্ঠুর বিপ্লবী যুদ্ধের ময়দানে জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের বীর সেনানীরা এগিয়ে চলেছিল, এখনও সেভাবেই চলছে। বিপ্লবীদের জীবন মানে অভ্যস্ত মানুষগুলোকে একটি প্রতিকূল অঞ্চলে দিনের পর দিন কাটাতে হয়, নড়াচড়া করা সহজ সাধ্য নয়, তারপরও বিপদ সঙ্কুল বৈরী অঞ্চলেই আমাদের বীর সেনানীরা পা দিয়েছিল। এটাই বাস্তব সত্য ঘটনা! যে জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, আছে কেবল স্বাধিকার-অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার আকুতি, আছে কেবল নবজীবনের মুক্তি। সেজন্য তারা মৃত্যুকে জয় করেছিল, সেই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন আজও ডাকছে বিপ্লবী জুম্ম তরুণদের। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদর্শের যে মৃত্যু নেই, সেটা বাস্তবে প্রমাণ করার জন্য ১০ নভেম্বর আমাদের স্মরণ করে দিয়ে যায় বার বার। এবারও ১০ নভেম্বর ২০১৯ জুম্ম জাতির সামনে এসে হাজির হয়েছে। তাই তো স্লোগানের সুরে-সুর মিলিয়ে বলি, ভুলি নাই, ভুলবো না– ১০ নভেম্বর এর ঘটনা!

জাতীয় কুলাঙ্গার, ক্ষমতালোভী, বেঈমান, বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে দৈহিকভাবে হত্যা করলেও তাঁর প্রদর্শিত নীতি ও আদর্শকে কখনো হত্যা করতে পারেননি। কারণ আদর্শের কোন মৃত্যু নেই। সেকারণে তিনি জুম্ম জাতির কাছে যুগ হতে যুগান্তরে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে থাকবেন। কেননা তিনি জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, জুম্ম জাতির মহান স্থপতিও। যতদিন জুম্ম জাতি পৃথিবীর মানচিত্রে বেঁচে থাকবে ততদিন তিনি অমর

হয়ে রইবেন। সমগ্র জুম্ম জাতিকে তিনি জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় প্রস্তুত করেছিলেন। উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও উগ্র মুসলিম ধর্মান্ধ ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। মহান নেতার প্রদর্শিত চিন্তাধারা জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামের জন্য প্রকাশ্যভাবে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করা, যে সংগঠনের থাকবে দলমত নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব। তাই মানবতাবাদী চিন্তাধারা জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে তার ভূমিকা পালন করবে। তিনি জুম্মজাতির চেতনা ও হাজারো নিপীড়িত মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কেবল একজন ব্যক্তি নন, এক মহান আদর্শের নামও। যে আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিল গোটা জুম্ম জাতি তথা জাতির বীর সেনানীরা। মানবতার আদর্শে এবং জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সম-অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন জুম্ম জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। শোষক আর শোষিতে বিভক্ত ৭০ দশকের বাস্তবতায় মহান নেতা ছিলেন শোষিতের পক্ষে। তাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ৭২ এর সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কে শোষিতের পক্ষে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেন। সংবিধানে সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমমর্যাদা রক্ষার জন্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাদেশের আইন প্রণেতাদের কাছে অনেক অখণ্ডনীয় বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। নারীদের সমানাধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংবিধান প্রণেতাদের দৃষ্টি আর্কষণ করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে সংবিধান প্রণয়নের সময় শ্রমিক, কৃষক, খেটে-খাওয়া মেহনতি জনতা, চির অবহেলিত নারী সমাজ ও নিপীড়িত জাতিসমূহের অধিকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করে লিফলেট প্রচার করেছিলেন। তাঁর পরিণামে ভোগ করেছিলেন গ্রেফতার এবং দীর্ঘ দুই বছরের অধিক কারাগারে অন্তরীণ জীবন। ১৯৬৩ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি নিবর্তনমূলক আইনে তিনি আটক হয়েছিলেন (চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ পাহাড়ি ছাত্রাবাস হতে) এবং ১৯৬৫ সালে ৮ মার্চ চট্টগ্রাম কারাগার থেকে শর্ত-সাপেক্ষে মুক্তি লাভ করেন। এভাবে দুই বছরের অধিক তাকে বন্দী থাকতে হয় পাকিস্তানের কারাগারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র আন্দোলনের অগ্রভাগে নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা, ৭২-এর সংবিধানে জুম্মদের বাঙালি বানানোর তীব্র প্রতিবাদ তথা সংসদ হতে ওয়ার্কআউট করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা, এরপর দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র আন্দোলন সংগ্রামের কারিগর তারই ধারাবাহিকতায় বিভেদপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদের "ক্ষমা করা, ভুলে যাওয়ার" নীতির ভিত্তিতে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি মজবুত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। তাঁর প্রদর্শিত আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ৭০ দশকের অসংখ্য ছাত্র-যুব, টগবগে তরুণ-তরুণী সশস্ত্র সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। তাঁর সেই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল লড়াকু জুম্ম জাতির বীর সেনানীরা।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে অধিকার আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসলে ১৯৭৩ সালে ৭ জানুয়ারি গড়ে তুলেছিলেন জুম্ম জনগণের প্রাণের সংগঠন জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করার পর পরই দেশের সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়। অগণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা পালাবদল হওয়ার পর মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আত্মগোপনে চলে গেলেন। তারপর এম এন লারমার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে গ্রাম পঞ্চায়েত, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি ও মিলিশিয়া বাহিনী। শুরু করেছিলেন সরকারের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম। তাঁর নেতৃত্বে পুরো জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে এবং সামরিক বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ মহান নেতার শক্ত পরিচালনায় ও শিক্ষায় শান্তিবাহিনীকে ক্রমান্বয়ে এক শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল মুক্তিবাহিনী হিসেবে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জনসংহতি সমিতির এই নেতৃত্ব ও সামরিক দক্ষতা সরকারের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। দেশে-বিদেশে জুম্ম জাতির সংগ্রামের কথা, শান্তিবাহিনীর বীরত্বের কথা প্রচার হয়েছিল। জুম্ম জনগণের অন্তরে জনসংহতি সমিতি এভাবে জায়গা করে নিয়েছিল। তাই ১০ নভেম্বর এদিনে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীকে স্মরণ করে দিয়ে যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি চুক্তির মধ্য দিয়ে অস্ত্র জমা দিয়েছিল ঠিক, কিন্তু মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সামরিক বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ শক্ত পরিচালনার শিক্ষা-দীক্ষা এবং শক্তিশালী সুশৃঙ্খল শান্তিবাহিনীর অভিজ্ঞতা ও আদর্শকে কখনো জমা দেয়নি।

প্রিয় নেতা জুম্ম জাতিকে বিজাতীয় শাসন শোষণ হতে মুক্ত করার জন্য সর্বদাই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। জাতির এই মুক্তি সংগ্রামে চলার পথে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো জুম্ম জনগণের নিকট। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ কখনো তাঁর ত্যাগ ও অবদানকে ভুলে থাকতে পারে না। মহান নেতার এই অবদানকে অস্বীকার করলে আমরা জুম্ম জাতি হয়ে যাবো অকৃতজ্ঞ। আমরা মনে করি অন্যায়ের অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। এখনও তা নেই! ন্যায়ের পক্ষে মানবেন্দ্র নারায়ণ

লারমার আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে তারা একের পর এক চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছে। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর বিপথগামী, উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী, বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রই জুম্ম জাতির প্রাণ পুরুষ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১০ নভেম্বর ভোর রাতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলার খেদারাছড়ার থুমে স্থায়ী ব্যারাকে মানব সভ্যতা তথা জুম্ম জাতির ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম এই হত্যাকান্ডের মাধ্যমে সেদিন তারা কেবল মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করা নয়, গোটা জুম্ম জাতির আন্দোলনকে বানচাল করতে চেয়েছিল। মুছে দিতে চেয়েছিল জুম্ম জাতির পোড়খাওয়া এক একটি লৌহমানবের বীরত্বগাথার ইতিহাসকেও। মহান নেতার নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড জুম্ম জাতির জন্য করুণ বিয়োগগাথা হলেও এই হত্যাকাণ্ডের এখনও জুম্ম জাতি বিচার করতে পারেনি। পারেনি আজো সেই বিভেদপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষমতালোভী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের উত্তরসুরীদের কর্তৃক পাহাড়ে তাদের অপশক্তি প্রয়োগ করার ষড়যন্ত্রকে বানচাল করতে।

সেই গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের উত্তরসুরীরা গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের আবহাওয়াকে আজ বিষময় করে তুলেছে। কিন্তু গুলির আঘাতে আহত কর্পোরেল সৌমিত্র ও কর্পোরেল বকুল বাঁচার জন্য আর্তচিৎকার ও কান্নার আহাজারি জুম্ম জাতি কান পেতে শুনেছিল। লীডারকে হারিয়ে হয়তো বা সেদিন সকল সহযোদ্ধা বন্ধুরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, তারপরও জাগতিক নিয়মানুসারে সবাইকে মেনে নিতে হয়েছিল। যে মানুষটি উগ্র ধর্মান্ধ স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন, সেই মহান নেতাকে হারিয়ে জাতির নিঃসন্দেহে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হয়েছিল। আজো বলতে ইচ্ছা করে, হে মহান দেশপ্রেমিক প্রকৃতির সন্তান! শত-হাজারো প্রলোভন তোমাকে মোহিত করতে পারেনি; একটা আগ্রাসী শাসকগোষ্ঠীর যাবতীয় হুমকি-ধামকি তোমাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। প্রশ্ন জাগে কী ছিলো তোমার মধ্যে? জানি বিশ্বের অজেয় শক্তি প্রগতিশীল আদর্শের দ্বারা তোমার যাবতীয় হৃদয় মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। সেই শক্তির দ্বারা তুমি গোটা জুম্ম জাতিকে জাগ্রত করেছিলে মুক্তির আন্দোলনে সামিল হতে। সত্যিই তুমি জুম্ম জাতির মহান নেতা, জুম্ম জাতীয় জাগরণের মহান অগ্রদূত, শিক্ষক হিসেবে প্রকৃত মানুষ গড়ার সুযোগ্য কারিগর, আইনজীবী হিসেবেও একজন ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করা শুধুমাত্র সফল নয়, সার্থক আইনজীবী, পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে একজন ন্যায়ের পক্ষে লড়াকু সফল পার্লামেন্টারিয়ান এবং সফল ও সার্থক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

যারা প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে খুবই কাছ থেকে দেখেছেন; তাদের ভাষ্য মতে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করতে পারতেন। রাজনৈতিকগতভাবে সুদক্ষ নেতা বলতে যাকে বুঝায়, তাঁর কথার মধ্যেই তা ফুটে উঠতো। তাঁর দুর্দান্ত সাহসী কর্মকাণ্ডের কথা নিশ্চয়ই আমাদের অজানা নয়। একটা সভ্যতাকে, একটা সংস্কৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে তিনি যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন সেজন্য জুম্ম জাতি আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। অতীতের যেমনি মৃত্যু নেই, তেমনি ১০ নভেম্বর প্রয়াত নেতার মৃত্যু দিবসেরও কোনদিন মৃত্যু হবে না। জুম্ম জাতির কালো অধ্যায়, বেদনার ও যন্ত্রণার হলেও এদিনটি জুম্ম জাতির কাছে বার বার ফিরে আসে। প্রয়াত নেতার শহীদ বেদী ফুল দিয়ে সাজানো হয় এবং ফুলের মালায় লেখা হয় "১০ই নভেম্বর অমর হোক"। তিনি জুম্ম জাতির মাঝে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

বিংশ শতাব্দীতে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে যারা দেশবরেণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাদের মধ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাও অন্যতম। জুম্ম জাতিকে জুম্ম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে যখন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে শক্তিশালী রূপে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন, ঠিক তখনই কায়েমী স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং এই ষড়যন্ত্রেরই অংশ হিসেবে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করেছিল। মহৎ ও সাধারণের মাঝেই অসাধারণ মানুষটিকে যারা হত্যা করতে পারে, তারা মানুষরূপী দানব ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

নেতা হলেন তিনিই যিনি অন্যের বেদনার ভার নিজ কাঁধে বহন করেন; মুক্তির পিচ্ছিল পথের পথপ্রদর্শক হন; প্রজ্ঞা, সাহস, সততা ও দক্ষতার আলো ছড়িয়ে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বাস্তব স্বপ্ন দেখাতে পারেন। তিনি ভাবেন শত শত বছরের আগামীর কথা, সেই অনুযায়ী তিনি সম্মুখে চলার পথের মানচিত্র নির্মাণ করেন। জনকল্যাণ ভিত্তিক সমাজ রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন দেখেন গণমানুষকে সাথে নিয়েই। ঠিক তেমনি একজন জুম্ম জাতির মহান নেতা ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। মহামনীষীরা বলেন, "ইতিহাসের কোন ফাঁক রাখতে নেই। ফাঁক থাকলেই তাতে ঢুকে পড়ে জঞ্জাল। যার যেখানে স্থান নেই, সে সেখানে তখন স্থান দখল করে বসে। প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, বিভেদপন্থী ও সুযোগসন্ধানীরা তখন ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়"। ঠিক সেভাবে ১০ নভেম্বর এদিনে বিভেদপন্থী চক্ররা জুম্ম জাতির ইতিহাসে অন্ধকারতম অধ্যায় জন্ম দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা এত সহজ নয়, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রদর্শিত আদর্শকে বুকে নিয়ে শত শত জুম্ম জনগণ সেই ইতিহাস বিকৃতকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

জুম্ম জাতীয় চেতনার প্রতীক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা। সেই প্রেরণাকে প্রবাহিত করেছিলেন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন এক আপোষহীন জাতির মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, পার্টিতে সৃষ্টিশীল, দক্ষ ও যোগ্য কর্মী তৈরি করে জুম্ম জনগণের নিকট একমাত্র কাণ্ডারী সংগঠন হিসেবে পরিচয় করে দিতে সক্ষম হন। সেজন্য জুম্ম জাতির ইতিহাসে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অবদান অদ্বিতীয় এবং অবিস্মরণীয়। মহান নেতার প্রদর্শিত আদর্শই বলে দেয়, এটা আমাদের সংগ্রাম। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। পরনির্ভরশীল মানসিকতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছিলেন। আত্মনির্ভরশীল নীতির ভিত্তিতে তিনি সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন। যার ফলে পরনির্ভরশীল মানসিকতা-সম্পন্ন সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদের শিকার হন, নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কথা ও তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে আমরা দেখি জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সজাগ, দূরদর্শী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ এক আত্মপ্রচারবিমুখ ত্যাগী নেতাকে। আমি মনে করি তরুণ প্রজন্ম তাঁকে ও তাঁর মতো ইতিহাস নির্মাণকারীদের যতই চিনবে ততই উজ্জ্বল হবে ইতিহাসের ভবিষ্যতের গতিপথ।

একদিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দালন আর অন্যদিকে সশস্ত্র আন্দোলন উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বে ছিলেন মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র আন্দোলনের পথ খোলা রেখেছিলেন তিনি। কেননা ইতিহাসের আলোকে আমরা যেটা দেখতে পাই, প্রতিটি বিপ্লবে বিপ্লবী লড়াইয়ের জন্য বিপ্লবী জনতাকে সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত করবার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। গোপন এবং অবৈধ পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছিল, বৈধ-অবৈধ, গোপন-প্রকাশ্য সংগঠন এবং আন্দোলনের সবরকম সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল। যেখানেই জনতা সেখানেই পার্টির কর্মীদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। গোপন পার্টির পরিচালনায় ও নেতৃত্বে বৈধ-অবৈধ সংগঠন এবং আন্দোলনের সমন্বয় ঘটাতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল অনুযায়ী মহাননেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের লড়াইয়ের কৌশল সঠিক ছিল বলে আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

১৯৭৫ সালের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর্যায়ে সম্পৃক্ত ছিলেন, এক পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠীর শোষণ শাসনের রূপ পরিবর্তিত হওয়ার পর পরই অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র লড়াই সংগ্রাম বা অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আবার শাসকগোষ্ঠীর সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং শুরু হয় চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। আজ বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, দীর্ঘ ২২ বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের আন্দোলনের পরেও শাসকগোষ্ঠীর চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের সদিচ্ছা নেই এবং শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবারও ৭০-৮০ দশকের ন্যায় স্বৈরাচারী সামরিক শাসক জিয়া ও এরশাদ সরকারের মতো করে সামরিক শাসনকে জিইয়ে রেখে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অচল করে রেখে দিয়েছে। সেই সাথে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি বিরোধী ও জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে; চলছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সাধারণ জুম্ম জনগণকে হুমকি-ধামকি, পাইকারী হারে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, গ্রেফতার, জেল-জুলুম, অত্যাচার-অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়ন, শোষণের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম ও সাধারণ জুম্ম জনগণকে ক্রশফায়ার এর মাধ্যমে গুলি করে হত্যা করার ফলে আজ আবারও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির নতুন মোড় নিচ্ছে। আবারও ৭০-৮০ দশকের ন্যায় পরিস্থিতি শুরু করতে চলেছে বলে আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পরিচালনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে যখনই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, সেই মুহূর্তে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর জুম্ম জাতীয় প্রবক্তা, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মারা গেলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুতে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে শোকের কালোছায়া নেমে এল। প্রগতিশীল চিন্তাধারার যা কিছু সত্যিকারের মহৎ ও বীরত্ব প্রকাশ করে এমন গুণ, যেমন– নির্ভীক মন, লৌহদৃঢ় সংকল্প, সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রমে সক্ষম, দাসত্ব ও নির্যাতনের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা, জনগণের সৃজনীশক্তিতে অপরিসীম আস্থা, বিশাল সাংগঠনিক প্রতিভা- মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মধ্যে এসব অপূর্ব মূর্তভাবে প্রকাশ ঘটেছিল। প্রিয়নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন সারা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের তথা শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে জ্বলন্ত প্রতীক।

১০ নভেম্বর দিবসে পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তিকামী জনতার ঢল নামে, তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে, শোক র‍্যালির মধ্যে দিয়ে, র‍্যালিতে সকলেই খালি পায়ে হেঁটে, তারপর কয়েক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। মহান নেতার নানা লেখা ও তাঁর বাণীর স্মৃতিচারণ করা হবে, তাঁর জীবন ও সংগ্রাম পাঠ করা হবে, প্রিয় নেতার সাথে

আটজন সহযোদ্ধাসহ এযাবত জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন ও পঙ্গুত্ববরণ করেছেন তাদের অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আমরা জানি, প্রিয় নেতার মৃত্যু জুম্ম জনগণের এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জন্য এক বিরাট ক্ষতি। কিন্তু যেকোন রকম ক্ষতি বা আঘাত আসুক না কেন জুম্ম জনগণ ও জনসংহতি সমিতির সদস্যরা কখনো হতাশ হয় না, বরং প্রিয় নেতার প্রদর্শিত আদর্শের পথে চলার জন্য অসংখ্য জুম্ম নর-নারী তাঁর গড়ে তোলা পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার দৃঢ় শপথ নিয়ে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এখনও পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রিয় নেতার প্রদর্শিত পথ হতে এক পাও পিছপা হয়নি। তাই তো মুক্তিকামী জুম্ম জনতার কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আজও একটা বিরাট ভরসার জায়গা। পার্বত্য চট্টগ্রামের দিক হতে দিগন্তে প্রিয় নেতার সূর্যদীপ্ত রক্তের তরঙ্গ ভেসে ভেসে চলে। যেখানে জুম্ম জাতির মুক্তির সংগ্রাম সেখানেই প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ১০ নভেম্বর এই দিন থেকে শিক্ষা নিয়ে জুম্ম জাতির মুক্তিকামী জনতা প্রিয় নেতার প্রদর্শিত আদর্শের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করতে এগিয়ে আসুক।

১০ নভেম্বর এদিনে জুম্ম জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় ও উদ্যোগী হওয়ার মানসিকতা সকল কর্মী বন্ধুদের গড়ে তুলতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে হোক অথবা সংগ্রামে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে হোক আমি যাবো না, অন্যেরা যাবে– এই মানসিকতা পরিহার করতে না পারলে সংগ্রাম কখনো এগিয়ে যেতে পারে না। এই মানসিকতাই হচ্ছে পরনির্ভরশীলতার চূড়ান্ত রূপ। এই মানসিকতা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ফলে এই মানসিকতা নিজের গণ্ডী পেরিয়ে বাইরের গন্ডীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। যা আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই পরনির্ভরশীলতাই বলে যে, "আমরা যাবো না, বাইরের শক্তি না হলে আন্দোলন সার্থক করা যাবে না"। এটাও প্রমাণ মিলেছে যে, স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করে দেশের ও জাতির মধ্যে বিরাজমান বাস্তব অবস্থা বিচার না করে অধৈর্যতার দরুন দ্রুত নিস্পত্তির চিন্তাধারা প্রতিফলিত হতে জাতীয় বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। একদিকে সেই প্রতিক্রিয়াশীল, সংগ্রাম বিমুখ, পরনির্ভরশীল, অপরদিকে দ্রুত নিস্পত্তির মানসিকতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে সংগ্রামের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না।

অথচ আজ সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে হলে আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। যে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, যে পথ কন্টকাকীর্ণ, আঁকা-বাঁকা ও পিচ্ছিল। সেই প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং বাস্তবমুখী বাস্তবতার সাথে আত্মমুখী প্রস্তুতির সমন্বয় সাধন করতে হয় সেটাও কোনদিনই স্বীকার করেনি। তাদের অস্বীকৃতির দরুনই উদ্ভব হয়েছিল পরনির্ভরশীলতা এবং দ্রুত নিস্পত্তির মতো অসহিষ্ণু চিন্তাধারা; যা মহান নেতার প্রদর্শিত আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তো জীবন দিতে হয়েছিল জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের মহান অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। জন্ম হয়েছিল জুম্ম জাতীয় শোক দিবস ১০ নভেম্বর। বিভেদপন্থী, ক্ষমতালোভীরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। যা এখনও চলমান রয়েছে। তাই সংগ্রামের অগ্রগতির পথে যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে সেজন্য নিজেকে সব সময় সচেতন রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও বিভেদপন্থীদের পরনির্ভরশীলতা ও দ্রুত নিস্পত্তি চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রেম মানেই ভালবাসা, প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কাছে কিসের প্রেম ছিল? সত্যিকার দেশপ্রেম, জাতপ্রেম ছিল বলেই জাতির মধ্যে বেদনা আর যন্ত্রণা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। একজন মানুষের মধ্যে প্রেম থাকলে বেদনা থাকবেই এবং বেদনা থেকেই জন্ম নেয় খাঁটি নেতৃত্ব। কারণ কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে এক লক্ষের অধিক জুম্ম জনগণ উচ্ছেদ হবে, সর্বস্ব হারা হবে পাহাড়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ, একটা সভ্যতাকে চিরতরে ধ্বংস করার চক্রান্ত করেছিল পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী, এই লক্ষ লক্ষ ঘরহারা, সহায়-সম্পত্তি হারা জুম্ম জনগণের বেদনা ও যন্ত্রণাকে তিনি নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বিধায় তিনি শুধুমাত্র গোটা জুম্ম জাতির নেতা নয়, দুনিয়ার সকল মেহনতি মানুষেরই নেতা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি জুম্মদের সেই বেদনাকে আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর বেদনার্ত মনই তাঁকে সত্যিকার প্রগতিশীল বিপ্লবী নেতা হিসেবে তৈরি করেছিলেন। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের জয় হোক, ১০ নভেম্বর অমর হোক। মহান নেতার রক্ত কখনো বৃথা যেতে দিবো না, ১০ই নভেম্বরের এই দিনে এটাই হোক আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

> "পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*"

শহীদ অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত)

সত্যবীর দেওয়ান

দক্ষিণ এশিয়ায় তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণের স্বরাজ আন্দোলন তুঙ্গে। নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। ১৯৩৭ সাল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসন্নপ্রায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের এক অখ্যাত গ্রাম কমতলী। তৎকালীন চাকমা সার্কেলের আওতাধীন রাঙামাটির সদর থানার অন্তর্গত ৭২নং বুড়িঘাট মৌজার ঐ গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবার নারায়ণ চাকমা ও ছড়ভাস পুদি চাকমার ঘরে জন্ম নিয়েছেন অপর্ণা চরণ চাকমা। তাঁর ডাকনাম 'অবতার'। যতদূর জানা যায় ঐ গ্রামে প্রায় ৭০টি চাকমা পরিবারের বসবাস ছিল। চেঙ্গী নদীর পাড় ঘেষা এই গ্রামটি ছিল অতীব কর্মচঞ্চল। চারদিকে সবুজের সমারোহ নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যে ভরা প্রাকৃতিক পরিবেশ। জুমচাষের পাশাপাশি সমতল ভূমির ধানচাষ, আম-কাঠালের বাগানে ভরা, বিভিন্ন মৌসুম অনুযায়ী মিশ্র ফলজ বাগান। তাই গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রায় গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু। নিকটবর্তী পাহাড়ি ছড়া-ছড়িতে ইছা মাছ, কাকড়ার কোন কমতি ছিলনা। প্রতিবছর বিজু উৎসবে কতই না আনন্দে কাটতো হারানো দিনগুলো, ঘরে ঘরে পাজন সহ রকমারি খাদ্য সামগ্রী। শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এঘর থেকে ওঘর, এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে ঘুরে বেড়ানো, সহজ সরল আদিবাসীদের ঐতিহ্যমণ্ডিত আতিথেয়তায় কোনও কমতি ছিল না। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে ছিল অনগ্রসর। তৎসময়ে নান্যাচর এলাকায় একটি মাত্র পুলিশ ফাঁড়ী (বা বিট) ও ২টি ছিল এম.ই স্কুল। একটি ছোট মহাপুরুম এম.ই স্কুল, অপরটি হলো নান্যাচর এম.ই স্কুল।

অবশেষে ১৯৪৭ সালে পাকভারত স্বাধীনতা লাভ করলো। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা হবে পাকিস্তান আর অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হবে ভারত। কিন্তু বিধি বাম, যুগ যুগ ধরে পাহাড়ি আদিবাসী অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্যায় এবং বিধি-বহির্ভুতভাবে মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। তৎসময়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ করলেও সে প্রতিবাদ বাউন্ডারি কমিশনের কর্ণগোচর আর হয়নি। ফলে যা হবার তাই হলো, স্বাধীন পাকিস্তানের শুরু থেকেই অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত করার তৎপরতা আরম্ভ হলো। ১৯৪৮ সালে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন ১৮৮১-এর পার্বত্য পুলিশ বাহিনী বাতিল করা হয়। আর ১৯৪৯ সালে বিহার ও আসাম হতে আগত মুসলমান বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পুনর্বাসন করা হয় বিধি-বহির্ভুতভাবে। তাদের হাট বাজারগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা প্রদান করা হয়। তাই সকল হাট-বাজার বাঙালি ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে নান্যাচর এলাকায় মাত্র দুইটি এম.ই স্কুল হওয়ায় বালক অপর্ণা চরণকে প্রায় দুই ঘন্টা পথ হেঁটে সেই কমতলী হতে ছোট মহাপুরুম এম.ই. স্কুলে যেতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরবর্তীতে ছোট মহাপুরুম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন অপর্ণা চরণ। অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ও মেধাবী হওয়ার কারণে পর পর দুই বার ডবল প্রমোশনে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা তার সহপাঠিদের কাছ থেকে জানা যায়। ছোট মহাপুরুম জুনিয়র স্কুল থেকে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলে রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান হতে ১৯৬১ সালে মেট্রিক পাশ করেন। তারপর চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়ার স্যার আশুতোষ ডিগ্রি কলেজ থেকে ১৯৬৩ সালে আইএসসি এবং ১৯৬৫ সালে বিএসসি পাশ করেন। অপর্ণা চাকমার শিক্ষাজীবন ছিল অত্যন্ত সংগ্রাম মুখর। বিশেষ করে কাপ্তাই বাঁধের কারণে তাদের সেই কর্মচঞ্চল কমতলী গ্রাম সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়। তার পিতামাতাসহ সকল গ্রামবাসী ও সমগ্র পার্বত্য জনপদের ১৮,০০০ পরিবারের লক্ষাধিক জুম্ম উদ্বাস্তুর সাথে তার পরিবারও উদ্বাস্তুতে পরিণত হলো। তৎকালীন মং সার্কেল তথা রামগড় মহকুমা আওতাধীন (বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত) কমলছড়ির পাইলটপাড়া গ্রামের তারই পিতামহের নামীয় জায়গায় বসতি স্থাপন করেন। যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ পেয়ে কিছু জায়গা জমি নিয়ে তার পিতামাতা বর্গাচাষ করে অত্যন্ত কঠিন জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। যে কারণে অপর্ণা চরণের শিক্ষা জীবনে কয়েকবার বিরতি ঘটে। অদম্য শিক্ষানুরাগী অপর্ণা চরণ, পিতার আর্থিক দুরাবস্থার কারণে প্রথমে মাটিরাঙ্গা ফেনী নদীর পার্শ্বে একটি স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। পরে বিএসসি পাসের পর ১৯৬৫ সালে রাঙামাটি শাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশেষ করে অংকের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। অপর্ণা চরণ চাকমারা দুই ভাই এক বোন। তার ছোট ভাই সজ্জিত চাকমা এমএ পাশের পর রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে পৃথক জীবন যাপন করছেন। বর্তমানে অবসর জীবনে রয়েছেন। একমাত্র বোন শ্রীমতি নিধুংবালা চাকমাও তার স্বামী সংসার নিয়ে পৃথক জীবন যাপন করছেন।

অপর্ণা চরণ চাকমা যখন শাহ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, তখনই শিক্ষক হিসেবে তার সাথে আমার পরিচয় ঘটে। আমার

সমসাময়িক শাহ হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ করে অংকের শিক্ষক হিসেবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি যা জানেন তা সম্পূর্ণ উজার করে ছাত্র-ছাত্রীদের বোধগম্য ভাষায় শিখাতেন। বীজ গণিতের অংকের নিয়মে তার শেখানো পদ্ধতি নিয়ে এক সময় আমি আমার প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই। অবশ্য তৎসময়ে তিনি শাহ হাই স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে চলে যান। এদিকে আমার এসএসসি পরীক্ষা বেশি দেরি নেই। সঙ্গীসাথীরা ভালো রেজাল্ট করার জন্য তৎকালীন খ্যাতনামা প্রাইভেট শিক্ষক বিমলেশ্বর দেওয়ান (পণ্ডিত স্যার নামে খ্যাত) এর কাছে প্রাইভেট পড়তে যান। আমার ছাত্র জীবনে কখনও প্রাইভেট পড়ার সুযোগ হয়নি, বিশেষত বাবার আর্থিক দুরাবস্থার কারণে।

“পারিবারিক জীবনে অপর্ণা চরণ ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে ও সহজ সরল এবং অমায়িক। তার শিক্ষক জীবনেও তেমনি একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে দেখেছি। খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কালে শুনেছি অনেক ছাত্র-ছাত্রী তার কাছে প্রাইভেট পড়তে আসতো। গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি ফ্রি পড়াতেন।

অনেক প্রচেষ্টার পরে, এসএসসি পরীক্ষার ৪ মাস পূর্বে দুইমাসের প্রাইভেট খরচ বাবা হতে অনুমোদন পাওয়ার পর ঐ পণ্ডিত স্যারের কাছে দুই মাসের প্রাইভেট পড়ার সুযোগ পেয়ে যায়। তাঁর কাছ থেকে উচ্চতর গণিত ও ইংরেজি এই বিষয় দুটি প্রাইভেট পড়তে গিয়ে উচ্চতর গণিতের একটি নিয়মের অংক কষতে (পরীক্ষামূলক) দিয়ে থাকেন। আমি সেই নিয়মের সব অংকগুলো করে খাতাটি তাঁকে দেখানোর পর তিনি সরাসরি মন্তব্য করলেন, এটা অপর্ণাবাবুর শেখানো নিয়ম। এছাড়া আরও বললেন, এই নিয়মের সব অংক কষতে পারবে তো? ঠিক আছে বলে– একটি বই তার নিজ থেকে বের করে দিয়ে বলেন, এই অংকগুলি করতে পারো কিনা দেখো। তা অনেকটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বলে, আমার মনে হল এবং মন্তব্য করে বলেন, একই নিয়মের সব অংক যদি করা না যায়, সেটা নিয়মই হতে পারে না। তাই তার প্রদত্ত অংকগুলো পর পর সম্পন্ন করে তার দিকে আমার খাতা উচিয়ে দিলাম। তিনি খাতাটা দেখার পর কোন মন্তব্য না করে বলেন, এবার আমার প্রদত্ত নিয়মটা দেখো। তারপর তিনি একই প্রকারের কয়েকটি অংক কষে দেখালেন। দেখলাম তার প্রদত্ত নিয়মটা আরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত। এভাবে আমি তার কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে একই প্রকারের অংক যে বেশ দুই ভিন্ন নিয়মে করা যায় তাও আমার শেখা হলো। আর অপর্ণা স্যারের শিখানো নিয়মটাও যে একটা নিয়ম তা আমি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। তাই আমার প্রিয় শিক্ষক হিসাবে অপর্ণা চরণ চাকমার কথা স্মরণ হলেই আমার এই চ্যালেঞ্জের কথাটা মনের মধ্যে ভেসে উঠে।

১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অপর্ণা চরণ চাকমাকে গোলাবাড়ির নিজ বাসা থেকে শান্তিবাহিনী কালেক্টর আখ্যা দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ এনে সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে দেড়মাস হাজতবাসের পর অক্টোবর মাসের মধ্য ভাগে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। এহেন অবস্থায় অপর্ণা বাবু ১৯৭৯ সালে খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেইসময়কার আন্দোলনের বাস্তবতাকে উপলদ্ধি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলনে যোগদান করেন।

অবশ্য তিনি পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করেন অনেক আগে, বলতে গেলে স্কুল জীবনের শেষভাগে ১৯৬০ সালে ২৩ বছর বয়সে অপর্ণা চরণ চাকমা তৎকালীন ৬০নং কাঠালতলী মৌজার হেডম্যান সত্যপাক্ষ খীসা ও শৈবলীনী খীসার কন্যা সান্তনা খীসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের দীর্ঘ পারিবারিক জীবনে দুই ছেলে এক মেয়ে।

পারিবারিক জীবনে অপর্ণা চরণ ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে ও সহজ সরল এবং অমায়িক। তার শিক্ষক জীবনেও তেমনি একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে দেখেছি। খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কালে শুনেছি অনেক ছাত্র-ছাত্রী তার কাছে প্রাইভেট পড়তে আসতো। গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি ফ্রি পড়াতেন। তার পারিবারিক জীবনে তিনি চাকরি করলেও যা বেতন তুলতেন তা স্ত্রীর হাতে দেন। স্ত্রীই যাবতীয় ঘর সংসারের খরচ সামলাতেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ক্ষেত্রেও স্ত্রী সান্তনা খীসার ভূমিকাই হচ্ছে প্রধান। জুম্ম জনগণের জাতীয়

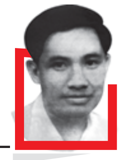

আন্দোলনে যোগদান করার পরও ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ক্ষেত্রে স্ত্রীকেই সবকিছুর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। বর্তমানে সান্তনা খীসা তার ছেলেদের সাথেই নাতি-নাতনীদের নিয়ে থাকেন।

রাজনৈতিক জীবনে অপর্ণা চরণ চাকমা গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তার সাথে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয় রাজনৈতিক জীবনে। তখন আমি নান্যাচর ও বন্দুকভাঙ্গা অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সম্পাদক এর পাশাপাশি তৎকালীন বিএন এরিয়ার রাজনৈতিক সচিব হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলাম। ঐ সময়ে তিনি কেন্দ্রীয় উচ্চ পর্যায়ের একটি পরিদর্শক দলের সদস্য হিসেবে আমাদের বিএন এরিয়া ও অঞ্চলের পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শক দলের প্রধান ছিলেন তৎকালীন গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের পরিচালক রঞ্জন বিকাশ চাকমা (উত্তরণ) ও সহকারী হিসেবে অপর্ণা চরণ চাকমা। তারা গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক অফিসসমূহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে সমগ্র বিএন এরিয়ার যাবতীয় গ্রাপ আঞ্চলিক পরিচালক ও সহকারি পরিচালকসহ এরিয়ার ইউনিট পরিচালকদের নিয়ে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আমাকে পৌরহিত্য করতে হয়। উক্ত কর্মী সভায় প্রত্যেক সদস্যগণ যার যার বক্তব্য ও মতামত পেশ করার পর অবশেষে পরিদর্শক দলের সদস্যবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। তাতে স্বল্প সময়ের বিপ্লবী জীবনে অংশগ্রহণকারী হলেও অপর্ণা স্যারের বক্তব্য শুনে আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করে। তার হৃদয়গ্রাহী সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বক্তব্য প্রদানের মধ্যেই আমার অনুমিত হয়েছে যে, পরবর্তীতে তিনি আরও উচ্চতর গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালনে ভূমিকা রাখতে পারতেন। কিন্তু তা আর হয়নি। ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ এই চার কুচক্রীর বুলেটের আঘাতে প্রয়াত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাথে একই কালো রাতে অপর্ণা চরণ চাকমাও অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে শহীদ হন। ঘাতক কুলাঙ্গাররা তার স্বল্প সময়ের বিপ্লবী জীবনকে আর বিকশিত হতে দিলো না। তিনি যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জুম্ম জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, সে আশা আজও আমরা পূরণ করতে পারিনি। যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে যারা আজ অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে, তাদের রক্তের বিনিময়ে যে জাতীয় নেতৃত্ব আজ গড়ে উঠেছে, সেই নেতৃত্ব অবশ্যই একদিন লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে এবং অধিকার আদায় করে ছাড়বে।

আমরা ছোটকাল থেকেই শুনে এসেছি শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষকরা জাতির বিবেক। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আর শিক্ষকরা পারেন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে এবং জাগাতে পারেন জাতীয় বিবেককে। আর মানুষের প্রকৃত গুণাবলী বিকাশের পথে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। সেই গুণাবলীর বিকাশ ঘটলেই মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধের চেতনার উৎপত্তি ঘটে, তাই পরিণত করে জাতীয় চেতনায়, আর জাতীয় চেতনাই জাতীয় জাগরণের উন্মেষ ঘটায়। তাই আজ শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। আর সেই প্রতিরোধের সংগ্রাম সকল নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জুম্ম জাতীয় বিবেককে আজ জাগ্রত করেছে এবং অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ বর্তমান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী জুম্ম জনগণের সংগঠনকে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করে বিভক্ত করার অপকৌশল অবলম্বন করছে, তা জুম্ম জনতা আজ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। তাই "ভাগ করা আর শাসন করার" নীতিকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। আজ ১০ই নভেম্বর ২০১৯ মহামতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ অন্যান্যদের সাথে শহীদ অপর্ণা চরণ চাকমারও ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী সমগ্র জুম্ম জাতি পালন করছে।

জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে আত্মবলিদানকারী মহান শহীদদের অমূল্য অবদান ও ত্যাগকে জুম্ম জনগণ কখনোই ভুলতে পারে না। শহীদ অপর্ণা চরণ চাকমার আত্মবলিদান ও সকল শহীদদের মত জুম্ম জাতীয় জীবনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহান শহীদদের অমূল্য আত্মবলিদানের প্রদর্শিত পথেই জুম্ম জনগণ তাদের আগামী দিনের উচ্চতর আন্দোলন-সংগ্রামকে এগিয়ে নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

> "কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি... নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি, আজকে যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। *–মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*"

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনউচ্ছেদ: কাপ্তাই বাঁধের সমকালীন এক অজানা গবেষণা

প্রধীর তালুকদার (রেগা)

প্রাক্কথন:

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপ্টমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) এক সমীক্ষায় বলছে, কেবল ২০১৫ সালে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ (প্রায় আড়াই কোটি) মানুষ সারা বিশ্বে উদ্বাস্তু এবং দেশান্তরের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ৬৫ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছে দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ও নানা ধরনের সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে। ২০০৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সাড়ে বাইশ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে। তবে রাস্তা, ঘাট, খনি, বাঁধ ইত্যাদি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলেও যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুভিটা ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে দেশান্তরিত পর্যন্ত হচ্ছে তার হিসাব কে রাখে?

আজ এমন একটি রিপোর্ট নিয়ে এই লেখা যা করা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ শেষ হওয়ার ঠিক বছর খানেক আগে। ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন-এর অর্থানুকুল্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয় ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬১ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রামে মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা নিয়ে। কর্ণফুলী নদীতে কাপ্তাই বাঁধ হয়ে যাওয়ার পর বিশেষত চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকজন যে বিপর্যয়ের মুখোমুখী হবে, তাদের প্রতিক্রিয়া এবং তাদের বিকল্প চিন্তা কী হবে? তারা বাঁধ পরবর্তী উদ্বাস্তু হয়ে কোথায় নতুন বসতি গড়ে তুলবে, জীবন জীবিকার সিদ্ধান্তই বা কিভাবে নেবে, তার কারণ ইত্যাদিই ছিল সেই গবেষণার প্রতিপাদ্য। গবেষণাটি জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউতে প্রকাশ হয়েছে ১৯৬৩ সালে। ক্যালিফোর্নিয়ার সাক্রামেন্ট স্টেট কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর ড. ডেভিড ই সফার হলেন এ গবেষণার কর্ণধার।

অতীতের খণ্ডচিত্র:

পার্বত্য চট্টগ্রামে এক প্রকার দ্বৈত শাসনের পদ্ধতি রয়েছে। জেলা শাসিত হয় ডেপুটি কমিশনারের দ্বারা আর সমগ্র জেলা তিনটি আঞ্চলিক সার্কেলে বিভক্ত যার রয়েছে তিনজন সার্কেল চীফ (রাজা)। তারা যে যার প্রথাগত শাসনের দ্বারা অধীনস্ত সার্কেলে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। চীফরা প্রথাগত সামাজিক বিচার ব্যবস্থার জন্য এবং জুমের উপর অধিকারের সাপেক্ষে প্রতিটি জুমিয়া পরিবার থেকে বাৎসরিক খাজনা গ্রহণ করে। চাকমাদের জনবসতির আনুপাতিক তুলনায় চাকমা সার্কেল সবচেয়ে বড়। তবে বোমাং ও মং সার্কেলের তুলনায় এর জনবৈচিত্র্যও কম। চাকমারা আবার চাকমা সার্কেলের বাইরেও চেঙ্গী নদীর উজানে গিয়ে মং সার্কেল এমন কি ত্রিপুরা রাজ্য পর্যন্ত বসতি গড়েছে।

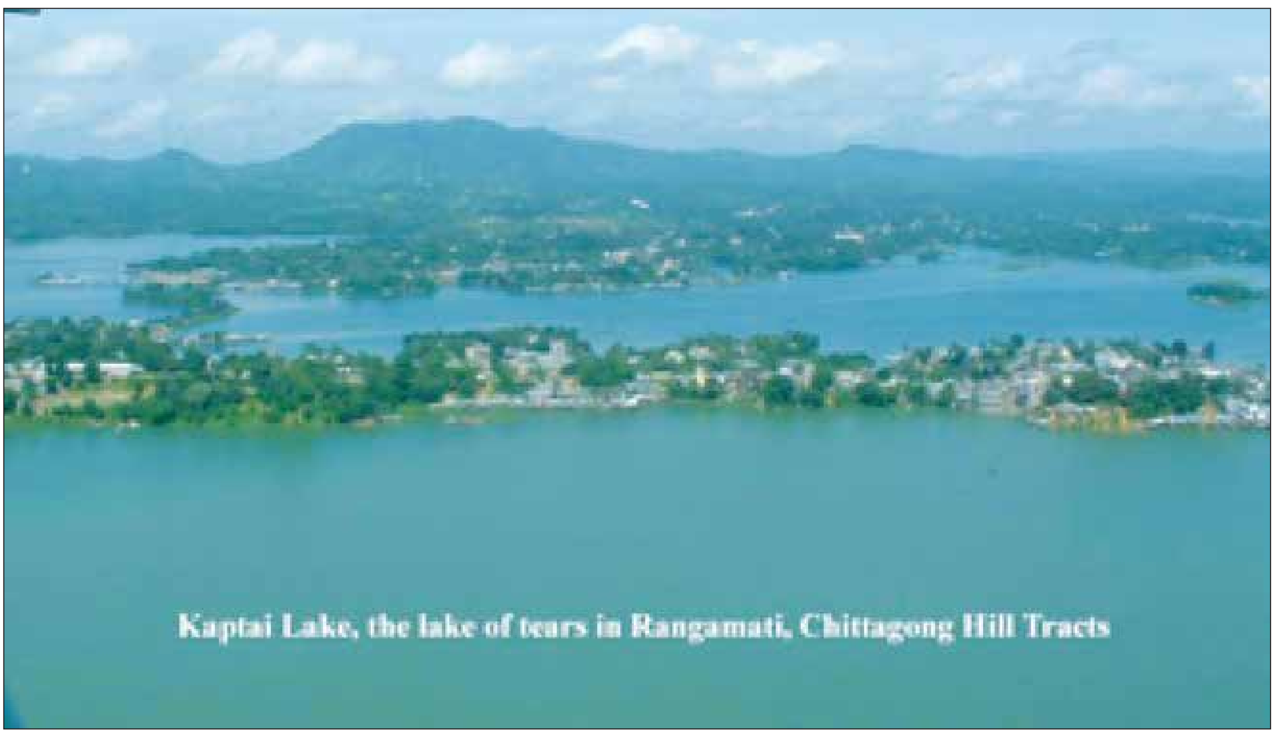

Kaptai Lake, the lake of tears in Rangamati, Chittagong Hill Tracts

চাকমাদের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষরাই সমতলের বাঙালিদের নিয়ে আসে চাষাবাদের শ্রমিক হিসেবে। পাহাড়িদের সমতলে চাষাবাদ পদ্ধতির বৃদ্ধির সাথে সাথে সমতল এলাকা থেকে বাঙালিদের আগমনও বেড়ে যায়। প্রথমে তারা শ্রমিক হিসেবে আসলেও কালক্রমে ভাগচাষী বা বর্গাচাষী থেকে ক্রমে ক্রমে জেলা প্রশাসন তাদের জমিও দখলে নিতে অনুমতি দেয়া শুরু করে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার সময় পর্যন্ত এই ছিল ক্রমবর্ধমান সাধারণ চিত্র। সমতলের বাঙালিরাই পাহাড়ে সমগ্র জেলার নদীপথের বাজারগুলি পরিচালন শুরু করে। নদী উপত্যকার লাঙলচাষী পাহাড়িরা কেবল চাল ডালের উপরই নয়, কাপড়, থালা বাসন থেকে শুরু করে দা, ছুড়ি ইত্যাদি প্রধান নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের জন্য সার্বিকভাবে বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সমতলের বাঙালিরাই যানবাহন পরিচালনা করে এবং অপেশাদার শ্রমিক হিসেবেও পাহাড়িদের সংখ্যালঘু করে তোলে। প্রশাসনের প্রায় সব কর্মকর্তারা আর চাকরিজীবীই বাঙালি সমতলবাসী। তারাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং শিক্ষাদানও বাংলা ভাষায় হয়। তবে লক্ষ্যণীয় যে, সচরাচর গ্রামাঞ্চলের প্রাইমারি স্কুলগুলির শিক্ষকরা মুসলিম নয়। হয়তো বা বাঙালি হিন্দু।

The two peoples- Muslim Bengalis and non-Muslim hill men- have simply not been able to live comfortably together, because of mutual dislike and fear. The absence of Muslim converts among the hill people shows that a barrier to sympathetic communication exists between them. For most Bengalis, the district is still an alien land, where their stay is only temporary. Officials, policemen, boatmen, traders and coolies may spend much of the year in the Hill Tracts, but their families live in the plains. This intensifies the feeling, common among the hill men, that outsiders are exploiting them. এই ছিল তখনকার সময়ে একজন ইউরোপিয়ান গবেষকের দৃষ্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক জনজীবনের এক ঝলক।

আনুমানিক তথ্যাবলী:

১৯৬১ সালে পার্বত্য জেলায় জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৪৭,০০০ জন। ১৯৫০ দশকে কাপ্তাই বাঁধে সম্ভাব্য জলমগ্ন হওয়ার জায়গাগুলিতে (রিজার্ভোয়ার এরিয়া) ১,১৫,০০০ জনসংখ্যা বসবাস করে যা গোটা জেলার প্রায় অর্ধেক বলা যায়। লাঙল চাষাবাদের সাথে জীবিকা নির্বাহ করে প্রায় ৮০,০০০ জনসংখ্যা (৫৫%)। তবে এদের মধ্যে ৫০,০০০ জনসংখ্যাকে প্রধানত সমতলের চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের মানুষ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। বাকিরা পাহাড়ে জুম চাষী। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১১৮ ফুট উচ্চতায় কাপ্তাই বাঁধ দিলে ২২৫ বর্গমাইল এলাকা তলিয়ে যাবে বলে হিসেব ধরা হয়। এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কমপক্ষে ৮০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।

বাঁধের কারণে জলমগ্ন হলে ৮০ হাজার জনসংখ্যা উদ্বাস্তু হয়ে যাবে ধরা হলেও ১৯৬০ সালের শেষের দিকে রেজিস্টার অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা নথিবদ্ধ করা হয়েছে ৮৫,৩০০ জন। তার মধ্যে কেবল চাষোপযোগী ভূমির উপর নির্ভরশীল ৪৫,৫০০ জনসংখ্যাকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ধরা হয়েছে যাদের ৯০% পাহাড়ি মানুষ আর বাকি ১০% বাঙালি। পাহাড়িদের মধ্যে ৯০% চাকমা আর বাকি হলো তঞ্চঙ্গ্যা ও মারমা জাতির লোক যারা চেঙ্গী ও কর্ণফুলী উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে কিংবা বিলাইছড়ির নিকটে রেইঙখ্যং এলাকায় বসবাস করে।

১৯৫৯ সালের রাজস্ব বিভাগের এক সরকারি নথি অনুসারে ৫৪,০০০ একর চাষযোগ্য জমি ডুবে যাবে। এর মধ্যে ৫,০০০ একর সাময়িক সময়ে চাষাবাদযোগ্য জমি। সম্ভাব্য হ্রদ এলাকার এক জরিপে দেখানো হচ্ছে ৩৯,৪০০ চাষীর ৩২,০০০ একর উর্বর চাষযোগ্য সমতল জমি তলিয়ে যাবে যা কিনা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ৮৭%। ১৯৬০ সালে ফেব্রুয়ারির এক সমীক্ষায় দেখানো হচ্ছে কেবল ২১,০০০ একরের জমিতে চাষাবাদে নির্ভরশীল ৩৮,০০০ জনসংখ্যা জেলার মধ্যেই উদ্বাস্তু হয়ে কোথাও না কোথাও ভবিষ্যত জীবন ধারণে তাদের ঠাঁই খুঁজে নেবে। বাকি ৫২,০০০ জনসংখ্যার উদ্বাস্তু জানে না তারা কোথায় বসতি গড়বে। কাজেই তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারি প্রতিশ্রুতি ছিল সবাইকেই যথাযথ ভূমি দিয়ে পুনর্বাসনের। কিন্তু সততার সাথে সেই লক্ষ্য পূরণে পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তাছাড়া উদ্বাস্তু হয়ে পড়ার পর কী হবে তা নিয়েও পাহাড়ি চাকমাদের সচেতনতার ঘাটতি ছিলই। সরকারের যেমন সমূহ সমস্যার বিষয়ে উদাসীনতা ছিল তেমনি প্রশাসনের কর্তাদেরও ভ্রান্ত ধারণা ছিল যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত পশ্চাদপদ জুমিয়া চাকমাদের প্রকৃতি ও জুমের উপর নির্ভর করে সহজে বেঁচে থাকার ব্যাপারটি নিয়ে। তবে ১৯৫৬-৫৭ সালে কাচালং ও ঠেগা নদী উপত্যকার রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় বসতি দেয়ার সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জেলা বন প্রশাসন তীব্র আপত্তি তোলে। তাদের আপত্তিতে কাচালং নদী উপত্যকার কেবল ২৩,০০০ একর রিজার্ভ এলাকা খুলে দেয়া হয়। এটি ছিল অতি নগণ্য পুনর্বাসন এলাকা, কিন্তু কর্তৃপক্ষের

কেউ স্বীকার করবে না। কাজেই পাহাড়িরা কোথায় যাবে সে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন।

কাচালং পুনর্বাসন এলাকার কথা ধরা যাক। এখানে প্রথমে ধরা হয়েছিল ১৩,০০০ একর জায়গা পাওয়া যাবে। পরে তা কমিয়ে ১০,০০০ একরে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ১৯৬০ সালে কাগজে-পত্রে দেয়া হয় ৮,৭০০ একর অথচ বেশির ভাগ উদ্বাস্তু মানুষ এদিকে চলে যায়। অনেক উদ্বাস্তু একেবারেই গহীন অরণ্য কেটে যে যার সুবিধামত করে কোন রকমে অস্থায়ী বসতি গড়ে নেয়। কারণ সতর্ক করা হয়েছিল যে, হয়তো বা এ জায়গাও ছাড়তে হবে যদি পানির স্তর এরও বেশি উঠে যায়। উড়ো খবর রটে যায় যে, বাঁধের উচ্চতা বাড়িয়ে পরে পানির স্তর বৃদ্ধি করে হ্রদের এলাকা পর্যায়ক্রমে বাড়ান হবে। সুতরাং একটা অনিশ্চয়তা প্রথম সেটেলমেন্টের বেলায় পাহাড়ি মানুষদের নীরবে মেনে নিতে হয়েছে। সরকারিভাবে পুনর্বাসন কার্যক্রমকে খুব বেশি আমলে নেয়া হয়নি। পুনর্বাসন এলাকায় বাস্তবে দেখা গেছে এমন অনেক জমিতে বন্দোবস্তি দেয়া হয়েছে যা বর্ষা মৌসুমে হ্রদের পানিতে তলিয়ে যায়।

প্রাথমিক পছন্দ ও সিদ্ধান্ত:

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ পাহাড়িদের কথা বাদ, হেডম্যান কার্বারী বা স্থানীয় মুরুব্বী শ্রেণির মানুষরা ছিলেন কাপ্তাই বাঁধের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অন্ধকারে। কাজেই উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়ার পর তাদের ভবিষ্যত নিয়েও পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ছিল দুর্বলতা। ১৯৬০ সালের শুরুতে পাহাড়িদের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে কয়টি পছন্দের (চয়েস) মুখোমুখী হতে হয়েছে তা হলো:

ক) নিজের মৌজার মধ্যেই অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া;
খ) হ্রদের সম্ভাব্য এলাকারও বহু দূরে চলে যাওয়া;
গ) কাচালং পুনর্বাসনের এলাকায় চলে যাওয়া;
ঘ) জেলার অন্যত্র বা চেঙ্গী ও মাইনী উপত্যকার দাবিদার নেই এমন জায়গায় বসতি গড়া।

আমেরিকার অর্থ সাহায্যে তৈরি কাপ্তাই বাঁধ বিশাল প্রকল্পটি পুরোটাই রেভেনিউ বিভাগের তদারকিতে চলে। বাঁধ তৈরির পরবর্তী ফলাফল বা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা মোকাবেলার চাইতে প্রকল্প বাস্তবায়নই হয়ে যায় মুখ্য। কর্ণফুলী ও কাচালঙের মধ্যাঞ্চলের নীচু জমিগুলি ১৯৬০ সালের বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই জলমগ্ন হয়ে যাবে বলা হয়। আবার নতুন জায়গায় বসতি গড়তে হলে প্রাথমিক কৃষিকাজের বন্দোবস্ত আগেভাগেই করে রাখতে হবে। আর সরকারি বাঙালি কর্মকর্তাদের বারংবার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার তাগিদ পাহাড়ি মানুষরা এক প্রকার চাপ হিসেবেই ধরে নিয়েছিল।

সুতরাং তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগ মুহূর্ত। নতুন জায়গায় আগে থেকে গিয়ে তত্ত্ব তালাস নিয়ে পরিকল্পিত বসতি গড়ার সময় কৈ। কাজেই সংখ্যা গরিষ্ঠ উদ্বাস্তু মানুষ যেদিকে চলে যাচ্ছে সেদিকেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সরে যেতে। ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার বেশির ভাগ চাকমাই অশিক্ষিত। জনস্থানান্তরের বিষয়ে চাকমাদের নিয়ে মনোযোগ থাকলেও তঞ্চঙ্গ্যা ও মারমাদের বেলায় উদাসীনতা দেখা গেছে। তাদের আলাদা দল ভেবে গুরুত্ব কম ছিল। কাচালং ভ্যালীতে তাদের পুনর্বাসন বা বসতি দেয়ার সুযোগ দেয়াই হয়নি।

ফলে তারা বোমাঙ সার্কেলের উত্তরাংশের দিকে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায়। যে মুসলিম বাঙালিরা উদ্বাস্তু হয়েছিল তাদেরও আলাদা দল হিসেব করে জেলা প্রশাসন অপেক্ষাকৃত বেশি মনোযোগ দিয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের চট্টগ্রামের কাছে কাউখালীর শিয়ালবুক্যে ও লামার ফাস্যাখালী এলাকায় বসতি গড়ার পরামর্শও দেয়া হয়। আবার সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় প্রায় ৫৭০ পরিবার সমতলের অধিবাসীকে কাচালঙের দিকে মারিশ্যা বাজার এলাকায় পুনর্বাসন দেয়া হয় এবং এরা ২,০০০ একরের সব চাইতে ভালো জমিগুলিতে বসতি গড়ে নেয়।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

কাপ্তাই বাঁধের শিকার চাকমারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেনই বা নিয়েছে সে বিষয়ে জেলা অফিসের ফাইলে সুস্পষ্টভাবে কিছুই লেখা নেই। সরকারিভাবে দায়ভার ভিত্তিক কোন পরিকল্পনা বা পরামর্শ কিংবা ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তরিত হওয়ার উপায় গ্রহণে সহযোগিতা, তদারকি-তত্ত্বাবধানের কোন কথাই নেই। অসংগঠিতভাবে যে যেভাবে পারে যেদিকে পারে স্থানান্তরিত হওয়ার (মাইগ্রেট) হিড়িকের মধ্যে কর্তৃপক্ষের দায়হীনতা চরমভাবে লক্ষণীয়। চাকমাদের বেলায় আলাদাভাবে (কাটাগোরাইজড) ফাইলগুলির নথিপত্রও অসম্পূর্ণ। বাঙালি উদ্বাস্তু যারা কাচালঙে স্থানান্তরিত হবে তাদের তথ্যগুলি এক প্রকার গুছানো পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাকমাদের বিকল্প উপায় গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত যে চারটি বিষয়ে লেখা আছে তা নিম্নরূপ:

১) হ্রদ অঞ্চলের কাছাকাছি বসতি গড়বে ৫২%;
২) কাচালঙ এলাকায় স্থানান্তরিত হবে ২৯%;
৩) চেঙ্গী-মাইনী স্থানান্তরিত হবে ১৪%;
৪) জেলার মধ্যেই অন্যত্র বসতি গড়বে ৫%।

তবে কাচালঙের নিম্নাঞ্চল মাইনী মুখ থেকে কর্ণফুলী উপত্যকা হয়ে রাঙ্গামাটি অবধি ৬টি মৌজার উদ্বাস্তু সংখ্যা ৪৩%। সমগ্র

৩৭টি মৌজার ৮,২৭০ পরিবার পাহাড়ি উদ্বাস্তুর মধ্যে ১৯৭৫ পরিবার সমতলভূমির চাষী। অপরদিকে চেঙ্গী উপত্যকার মৌজাগুলির ক্ষেত্রে যেমন বাকছড়ি মৌজার ৮২ শতাংশ সমতলভূমির চাষী হওয়া সত্ত্বেও কেবল ৩৮ শতাংশ চাকমা স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ পরিসংখ্যান থেকে ধরে নেয়া যায় চেঙ্গীভ্যালী কাচালঙ ভ্যালীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত উঁচু। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তারাও এই অঞ্চলের চাকমা উদ্বাস্তুদের অবস্থা বুঝে সেভাবে সরে যাওয়ার উৎসাহ দেয়। এ থেকে বোঝা যায় সরকারি কর্মকর্তারাও প্রকৃতপক্ষে বাঁধের জলস্তর কতদূর উঠবে সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না। কারণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্যের উপরও কাপ্তাই হ্রদের জলস্তরকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টা ছিল সকলের কাছেই অজানা। অজানা ছিল খরা মৌসুম আর বর্ষা মৌসুমের জলস্তরের উঠানামার পার্থক্য। অনেকের ধারণা যা ছিল তার থেকেও বেশি খারাপ পরিস্থিতি যে হতে পারে। আবার অনেকে বিশ্বাসই করেনি যে জলস্তর ততদূর উপরে চলে যেতে পারে। কিছু কিছু উদ্বাস্তু একই জায়গার ৪০ কি ৫০ ফুট উঁচুতে গিয়ে নতুন ঘরবাড়ি করে নতুন বসতির কথা ঠিক করেছে।

সুভলঙের ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় । সুভলঙ মুখ থেকে কয়েক মাইলের উজানের মানুষরা চিন্তাই করেনি তাদের উদ্বাস্তু হতে হবে। সমতলের চাষীদের সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ার কারণে রয়ে সয়ে যতদূর কাছাকাছি থাকা যায় তাই ছিল তাদের চিন্তা চেতনা। আর নিতান্তই যদি সরে যেতেই হয় তবে কাছাকাছির পাহাড়ে জুমচাষ করে জীবন ধারণ করা যাবে। আবার কাট্টলী মৌজায় কেবল ২৯% সমতল চাষী হলেও ৩৮০ পরিবারের সবাই উদ্বাস্তু হয়ে অন্যত্র চলে যায়। রেইঙখ্যঙ ও মধ্য চেঙ্গী উপত্যকার চাকমা, মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের বেলায় স্থানান্তরের ধরন ভিন্ন দেখা যায়। রেইঙখ্যঙের তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কর্ণফুলীর পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে সরে যাওয়ার ঝোঁক লক্ষ্যণীয়। দক্ষিণের ম্রো, খ্যাঙ বসতির দিকে চাকমাদের স্থানান্তরের ঝোঁক কম থাকার কারণ হলো এদিকের অঞ্চলটি তাদের কাছে অপরিচিত। মধ্য চেঙ্গীর দুই মৌজার মারমাদের মং সার্কেলের মারমা (মগ) বসতির দিকে যাওয়ার ঝোঁক। অবশ্য উদ্বাস্তুদের স্থানান্তরের ব্যাপারটা নির্ভর করছিল বিকল্প জমির প্রাপ্যতার উপর। এই দুই মৌজার উদ্বাস্তুদের হারানো জমির পরিমাণ ২১,০০০ একর। তবে সরকারের প্রত্যাশিত হিসেব অনুযায়ী অনেক কম। প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারের সর্বোচ্চ হারানো ভূমির পরিমাণ ১০ একর সরকারিভাবে হিসেব করার কারণে এ তারতম্য হয়ে যায়। কিন্তু ২১,০০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ করতে বিকল্প জমি পাওয়া গেছে মাত্র ১৫,৭০০ একর। নীচের তথ্যচিত্র থেকে এ বিষয়ে কিছু অনুধাবনযোগ্য।

দায়হীন কর্তৃপক্ষ ও নেতৃত্ব সংকট:

জেলার উত্তরাংশ ভারতের সীমান্তের দিকে বসতি গড়ার বিষয়টি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেহেতু পাকিস্তান ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে সাম্প্রতিক কয়েক দফা যুদ্ধ ঘটে গেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সীমানার কাছাকাছি ঠেগা ভ্যালীর দিকে বসতি গড়তেও চাকমাদের অনিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়। চেঙ্গী ভ্যালীতে যে চাকমা উদ্বাস্তুরা বসতির জন্য মনস্থির করেছে তাদেরও সেই মনোভাব দেখা যায়। তবে উত্তরের এই অংশে ত্রিপুরা জুমিয়ারা আগে থেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চেঙ্গী উপত্যকার সর্ব উত্তরে ব্যবসা কেন্দ্র লোগাঙ বাজারও মাত্র দু দশক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এ সমস্ত অঞ্চলে জুম এবং সমতল চাষাবাদ দুই পদ্ধতি চাকমা উদ্বাস্তুদের বসতির জন্য উপযুক্ত। সমুদ্র সমতল থেকে ২০০ ফুট উচ্চতায় পানছড়ি বাজার এলাকায়ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে চাকমা বসতি থাকায় কাপ্তাই

A comparison of areas of cultivable land offered and those chosen by displaced hillmen is provided in Table I. Most of the 560 families moving

TABLE I

RELOCATION AREA	LAND OFFERED		HOUSEHOLDS[a] MOVING TO AREA	
	Acres	% of total	Number	% of total
Kasalong	10,000	40.4	2,870	58.1
Chengri Valley	3,903	15.7	1,405	28.4
Myani Valley	1,287	5.2	99	2.0
Feni Valley and Ramgarh	3,057	12.3	—	—
Circum-Rangunia	747	3.0	200	4.1
Karnafuli-Sangu interfluve	374	1.5	183	3.7
Sangu and Matamuhari Valleys	5,433	21.9	181	3.7
TOTAL	24,801	100.0	4,938	100.0

[a]Exclusive of known plainsman households.

বাঁধের উদ্বাস্তু চাকমাদের সরে যাওয়ার আগ্রহ রয়েছে। চেঙ্গী উপত্যকায় উদ্বাস্তু চাকমাদের মধ্যে অর্ধেক চেঙ্গীর নিম্নাঞ্চল থেকে আর বাকি অর্ধেক চেঙ্গী মুখেরও নিচে কর্ণফুলী উপত্যকার মানুষ। কাজেই ১,৩৫১ উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য ১,৫৯৪ একর জমি পানছড়ি ও লোগাঙ অঞ্চলে সেটেলমেন্ট করার জন্য যুক্তিযুক্ত। এর মধ্যেও ২,৩০৯ একর মালিকানা হীন জমি খুঁজে পাওয়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের এই ভ্যালীতে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সহজতর মনে হলেও কেবল ৫৪ পরিবারকে উৎসাহী তালিকায় নথিভুক্ত করা গেছে। চাকমা উদ্বাস্তুদের মুখে তার ব্যাখ্যা ছিল এরকম– "পাকিস্তানী পুলিশের নানা ধরনের অত্যাচার। তদুপরি সীমান্ত এলাকায় চোরাকারবারী, সীমান্ত রক্ষীদের প্রতিনিয়ত চাঁদাবাজি, পাহাড়ি নারীদের প্রতি হয়রানি এবং সম্ভাব্য ভারত পাকিস্তানের বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির খবর তাদের নিরুৎসাহিত করেছে।"

সরকারিভাবে কাচালঙ উপত্যকার পুনর্বাসন অঞ্চল নিয়ে সর্বাধিক মনোযোগ দেয়া হয়। ব্লক ভিত্তিক হিসেব করে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত মৌজার উদ্বাস্তুদের একেকটি ব্লকে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা নেয়ার কথা ভাবা হয়। জমির বদলে জমি দেয়া এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতি পরিবারের ১০ একর জমির হিসেবও মাথায় রাখা হয়। পাহাড়িদের থেকেই ব্লক লিডারও নিয়োগ দেয়া হয়। তবে যারা এতদিন নদী উপত্যকার সমতলের খোলা জমিতে বসবাস করে আসছিল তাদের জন্য কাচালঙ রিজার্ভ অঞ্চল একেবারেই উপযুক্ত হওয়ার নয়। রাঙ্গামাটি থেকে মারিশ্যা পায়ে হেঁটে ৩ দিনের পথ। আর ছোট নৌকায় গেলে আরো বেশি সময় লাগে। মারিশ্যা বাজারের মতো জঙ্গল পরিস্কার করে বাজার পর্যন্ত গড়ে তোলা হয়। তবে বাজার এলাকায় পাহাড়িদের চাইতে বাঙালিদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে বলে মনে হয় যেহেতু জঙ্গল কেটে পাহাড়িদের বসতিস্থাপন বাঙালিদের তুলনায় সহজতর হবে বলে ধারণা করা হয়।

কাচালঙ পুনর্বাসন এলাকাও বর্ষা মৌসুমে যখন হ্রদের জলস্তর সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে থাকে তখন তাও ডুবে যেতে পারে বলেও আশংকা হচ্ছিল বার বার। অন্যদিকে যারা পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল পরিষ্কার করে জুম চাষের আয়োজন করছিল তাদেরও বন বিভাগের কর্তারা হুশিয়ার করে দিয়েছে যে সেই জমিও তাদের মালিকানায় দেয়া হবে না। এই উঁচু ভূমি সরকারিভাবে ফল বাগানের জন্য বরাদ্দ করা আছে। সরকারিভাবে এই ভূমি কিভাবে ব্যবহার হবে তারও ব্যাখ্যা ছিল না। ইত্যাদি অনিশ্চয়তা সাধারণ অশিক্ষিত পাহাড়ি মানুষদের মনে চরমভাবে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। বিরাট সংখ্যক অযোগ্য সরকারি কর্মচারীর এত বিশাল পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সিরিয়াস না হওয়ার ফলে এবং অনেক বাঙালি কৃষক আগ্রাসী উপস্থিতির কারণেও চাকমাদের মনে চরম সংশয় ও অসহায়ত্ব কাজ করছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে চাকমাদের বাঙালিদের কর্তৃত্বের মধ্যে ভবিষ্যত গড়ে তুলতে হবে এমন দুর্ভাবনার আশঙ্কা বিরাজ করছিল এবং আংশিকভাবে তাদের এমন পরিস্থিতির দিকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছিল বলা যায়। কাচালঙের পুনর্বাসন কাজে উদ্বাস্তুদের যখন নৌকায় স্থানান্তরিত করার কাজ চলছিল তখন অভিযোগ উঠেছে অনেক চাকমার গৃহপালিত শূকর নৌকায় তুলতে বাঁধা দিচ্ছিল বাঙালি মাঝিরা। কাজেই এসকল অসহিষ্ণু পরিস্থিতিতে বহু চাকমা কাচালঙে পুনর্বাসিত হওয়া থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। অপরদিকে ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই পুনর্বাসিত হওয়ার যার যার বিকল্প পছন্দ (অপশন) চূড়ান্ত করতে চাপ দেয়া হচ্ছিল। এমন এক অস্থিরতার পরিবেশে কাপ্তাই বাঁধের শিকার হাজার হাজার পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের সঠিকভাবে পরিচালনা ও পরামর্শদানের অভাব তাদের চরম সংকটে ফেলে দিয়েছিল।

> আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত দাবি। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

অস্তিত্ব বিধ্বংসী উন্নয়নের চেয়ে উন্নয়নহীন অস্তিত্ব অনেক ভালো

লেলুং খুমী

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু আদিবাসীদের সমসাময়িক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে কেমন যেন মনে হয় তারা পরিকল্পিত-অপরিকল্পিত দৃশ্যমান অবকাঠামোগত উন্নয়নের জোয়ারে এবং সম্প্রীতির মায়া চাঁদরে মোড়ানো এক কন্টকাকীর্ণ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আজ সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগণের জীবন-জগৎ যেন এক অদৃশ্য শক্তির বলয়ে বেষ্ঠিত এবং দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন দিনের পর দিন চুরমার হয়ে যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন তাদের জন্য আর কোন নতুন সূর্য উঠবে না পূর্ব দিগন্তে। বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্ব সংকট যেন দিনের পর দিন সেই পশ্চিমা আকাশে হেলে পড়া সূর্যাস্তের মত। এক কদম সামনে এগুলে দুই কদম যেন পিছুতে বাধ্য হচ্ছে। এ যেন শাসকগোষ্ঠী আদিবাসীদের সাথে একপ্রকার কানামাছি খেলা খেলছে যে "দিনের আলোয় গাছের শিকড়ে লোক দেখানোর জন্য পানি দিচ্ছে আর রাতের অন্ধকারে রীতিমত শিকড়গুলো কেটে দেওয়া হচ্ছে"। আদিবাসীদের অস্তিত্বকে যেন কৃত্রিম উপায়ে পদ্ধতিগতভাবে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় বিদ্যমান আইন কার্যকর না করে বা প্রয়োজনীয় কার্যকরী আইনী পদক্ষেপ না নিয়ে এভাবে চলতে থাকলে আগামী ৪০-৫০ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্ব ভয়াবহ হুমকির মধ্যে পড়বে– এটা অপ্রিয় সত্য এবং অনুমেয়।

এ যেন শাসকগোষ্ঠী আদিবাসীদের সাথে একপ্রকার কানামাছি খেলা খেলছে যে "দিনের আলোয় গাছের শিকড়ে লোক দেখানোর জন্য পানি দিচ্ছে আর রাতের অন্ধকারে রীতিমত শিকড়গুলো কেটে দেওয়া হচ্ছে"। আদিবাসীদের অস্তিত্বকে যেন কৃত্রিম উপায়ে পদ্ধতিগতভাবে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার সংখ্যালঘু আদিবাসীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে আগ্রহের কমতি নেই। কিন্তু তাদের কাঙ্ক্ষিত জাতিসত্তার আত্ম-পরিচয়, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার দিতে এবং মানবাধিকার রক্ষায় নির্মমভাবে অনিচ্ছুক বললেও ভুল হবে না। আদিবাসী সংশ্লিষ্ট যত প্রকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনকানুন (যেসব আইনে বা সনদে সরকার অনুস্বাক্ষর করেছে) রয়েছে– সেগুলোর অধিকাংশই মানা হচ্ছে না বা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আংশিক মানা হলেও যাদের উপর বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় তারাও যেন অদ্ভুদ এক অদৃশ্য শক্তির জালে আটকে গেছে। আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে যদি ১৯৯৭ সালের তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার অর্থাৎ বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যকার সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তিকে বিশ্লেষণ করি, তবে চুক্তির মূলধারাসমূহ তথা যে ধারাগুলো বাস্তবায়ন করা হলে আদিবাসী জুম্ম জনগণ বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতে পারবে, সেসব ধারাগুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। যে চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জনগণ স্বপ্ন দেখেছিল যে দীর্ঘ বৎসরের রাজনৈতিক সংকট সমাধান হবে। এবং সকল জাতিগোষ্ঠী উন্নয়নের অংশীদার হয়ে আত্ম-মর্যাদার সাথে তারা নিজেদের ভাগ্য বিনির্মাণের সুযোগ পাবে। তারা বিশ্বাস করেছিল যে, আর কখনো তাদের ভূমি বেদখল হবে না, উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ হবে না কিংবা আতংকে দিন কাটাতে হবে না, সাম্প্রদায়িক হামলা বা মিথ্যা মামলার শিকার হতে হবে না, বিচারহীনতার সংস্কৃতির সম্মুখীন হতে হবে না, ভ্রাতৃত্ব সংঘাত থাকবে না, খুন-গুম বন্ধ হবে, দিনে-রাত্রে মা-বোনরা নিরাপদে থাকবে বা নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তথা ক্ষমতার কাঠামোয় সকল জাতিসত্তার কম-বেশি প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি, সংখ্যালঘু আদিবাসীরা আশা করেছিল, এ দেশের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র তথা শাসকগোষ্ঠী তাদের দায়িত্বশীল এবং নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে সকলের মানবাধিকার রক্ষা নিশ্চিত করবে।

কিন্তু বাস্তবতা অনেক ভিন্ন! আদিবাসী মা-বোনদের এখনো অনিরাপত্তায় দিনাতিপাত করতে হচ্ছে এবং তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ হচ্ছে না। পার্বত্য চুক্তির ২২ বৎসর পরও চুক্তির মূলধারাসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। বরং নতুন নতুন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ যেন নির্দিষ্ট রোগ চিহ্নিত হওয়ার পরও সঠিক ঔষুধ ব্যবহার করছে না বা করতে দেওয়া হচ্ছে না। পার্বত্য চুক্তির আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যথা ভূমি ব্যবস্থাপনা,

আইন-শৃঙ্খলা, পর্যটন, পুলিশ, বন ও পরিবেশ ইত্যাদি জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর না করে বহুমুখী উন্নয়নের নামে তথা পর্যটন শিল্প উন্নয়ন বা রাবার বাগান সৃজনের নামে শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জুম্ম জনগণের প্রথাগতভাবে ভোগ দখলীয় ও রেকর্ডীয় হাজার হাজার একর ভূমি বেদখল করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সংরক্ষিত বন অবাধে ধ্বংস করা হচ্ছে, এবং ঝিরি-ঝরনা থেকে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন করার কারণে অনেক আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ আতংকে জীবনযাপন করছে। পরিবেশ ধ্বংসের কারণে জীব-বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হচ্ছে। আদিবাসীদের জীবিকার ক্ষেত্রগুলো তথা বেঁচে থাকার অবলম্বনগুলো সংরক্ষিত না হলে বিশ্বের বুকে বহু-জাতি রাষ্ট্রের বৈচিত্র্যতার পরিচয়ে আমরা যে অহংকার করে আসছি সেই সুযোগ আর পাবো না অদূর ভবিষ্যতে। এটা যেমনি রাষ্ট্রের জন্য সুখকর নয়, ঠিক তেমনি গণতন্ত্র বিকাশের জন্যও মঙ্গল বয়ে আনবে না।

আদিবাসীদের নিয়ে শাসকগোষ্ঠীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা জরুরী। ধর্ম, বর্ণ, জাতি কিংবা ভাষা-সংস্কৃতির উর্ধ্বে উঠে মানবতার দৃষ্টিতে এ দেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরকে সাংবিধানিক আত্ম-পরিচয় স্বীকৃতি দিয়ে আত্ম-মর্যাদার সাথে স্বকীয় সংস্কৃতি-মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচার অধিকার দিতে হবে। সকল সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী সমতার ভিত্তিতে নয়, বরং ন্যায্যতার ভিত্তিতে যাতে উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বাংলাদেশের বহু-জাতি রাষ্ট্রের বৈচিত্র্যতা রক্ষার্থেই হোক কিংবা হোক সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার কোন বিকল্প নাই।

আদিবাসী জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে এমন কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত নয় যার প্রভাব তাদের স্বকীয় জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি এবং আচার-বিশ্বাসে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আদিবাসীরা এমন উন্নয়ন চায় না যে উন্নয়নে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভূগবে, উচ্ছেদ আতংকে থাকতে হবে, সুন্দর এবং স্থায়িত্বশীল পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখতে পারবে না। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন হোক সুবিধা বঞ্চিত এবং অবহেলিতদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে। আদিবাসীদের নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করা, বাস্তবায়ন করা ও মূল্যায়ণ করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আদিবাসীরা সবাই উন্নয়নের পক্ষে। তবে উন্নয়ন হোক সংখ্যালঘু আদিবাসীদের অস্তিত্ব বান্ধব এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ বান্ধব। আদিবাসীদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রণয়ন, গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। অস্তিত্ব বিধ্বংসী উন্নয়নের চেয়ে উন্নয়নহীন অস্তিত্ব অনেক ভালো, কারণ তাতে সভ্যতা বির্বতন হয়ে বিকশিত না হলেও, অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে না।

> আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ–কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

পার্বত্য সীমান্তে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা: মিথ ও বাস্তবতা

ধীমান ওয়াংঝা

আদিবাসী বিরোধী একশ্রেণির নব্য বাঙালি গবেষক এখন বেশ তৎপর। তবে আদিবাসীদের পক্ষেও অনেকেই আছেন। এই বিরোধীদের কেউ কেউ পাহাড়ে সেটেলার বাঙালির রাজনৈতিক অভিবাসনের সমর্থনে যুক্তি দাঁড় করাতে বেশ সিদ্ধহস্ত। যেমন তাঁরা বলেন, ভূ-রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্পর্শকাতর অঞ্চল। ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেখানে বিশ্বস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালির সংখ্যাধিক্য বহাল রাখা প্রয়োজন। তার মানে, কথায় প্রভূত পাহাড়ি-প্রীতি শ্রুতিগোচর হলেও বাস্তবে এসব মানুষ নিখুঁতভাবে পাহাড়ি বিদ্বেষী। এই শ্রেণির বাঙালিরা সেখানকার আদি অধিবাসী পাহাড়িদেরকে বিশ্বাস করেন না। কারণ পাহাড়িরা জাতিতে অ-বাঙালি এবং আদিবাসী। তাঁদের ধারণা, ভিন্ন জাতির এই মানুষেরা দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি বড়োসড়ো হুমকি! এহেন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে পাহাড়ির প্রতি এসব বাঙালি গবেষকদের নির্মম জাতিবিদ্বেষ ছাড়া আর কী বলা যায়? অবশ্য এমন সমালোচনার উত্তরে গবেষকেরা আবার কখনো ভিন্ন কথাও বলেন। সেটি হলো, একসময় পাহাড়ে নাকি অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজের জন্য শ্রমিক পাওয়া যেতো না। তাই কামলা হিসেবে বাঙালি সেটেলারদেরকে সেখানে অভিবাসিত করতে হয়েছিলো। কারণ রাস্তাঘাট, বিল্ডিং ইত্যাদি নির্মাণের জন্য পাহাড়ি শ্রমিক তখন সহজলভ্য ছিলো না। শান্তিবাহিনীর তরফ থেকে এ বিষয়ে পাহাড়ি জনতার ওপর

> ❝ পাহাড়ে টনটনে সার্বভৌমত্বপন্থীদের চলমান যেসব কর্মকাণ্ড, তার মূল চালিকাশক্তি আসলে তাঁদের নিজেদের অন্তরে লালিত প্রবল আদিবাসী-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, প্রকৃতি-বিদ্বেষ, বৈচিত্র্য- বিদ্বেষ, ভিন্নধর্ম ও ভিন্নসংস্কৃতি-বিদ্বেষ, প্রকৃতিলগ্ন আদি জনতার সরল জৌলুষ ও রাজকীয় জীবনের প্রতি বিদ্বেষ প্রভৃতি।

নাকি অলিখিত বিধিনিষেধ জারি ছিলো। অর্থাৎ শান্তিবাহিনীর নির্দেশ ছিলো, সরকার তথা সেনাবাহিনীর কাজে কোনো সহযোগিতা দেওয়া যাবে না। তা-ই যদি হয় তাহলে প্রশ্ন হলো, কথিত বাঙালি শ্রমিকেরা কাজ শেষে সমতলে নিজেদের ডেরায় ফিরে না গিয়ে পাহাড়ে রয়ে গেলো কোন দুঃখে? শান্তিবাহিনী কি তাঁদেরকে জামাই আদরে বরণ করে নিয়ে পাহাড়ে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলো?

উপরোক্ত সব যুক্তি একজন কাঠমোল্লা বা নিছক খেটে খাওয়া মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ মোহনীয় ও যথার্থ বিবেচিত হতে পারে। মুনাফালোভী, নির্দয় আদম ব্যবসায়ী কিংবা চতুর কোনো নিরাপত্তাবিদের দৃষ্টিকোণ থেকেও তাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতিভুক্ত হওয়ার কারণে কেন নিজ দেশের জুম্ম নাগরিকগণকে অবিশ্বাস করা হবে? আর বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের এই যুগে কেনইবা দেশের এক দশমাংশ অঞ্চলের অকর্ষিত, সবুজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে হবে? দেশের ও পৃথিবীর স্বার্থে বন, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, জাতিবৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ ও বিকশিত করা প্রয়োজন। সভ্য জগতে এটাই এখন প্রচলিত রীতি। আধুনিক জ্ঞানজগৎ, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের জোরালো দাবিও তা-ই। কিন্তু সভ্যতার সেই পথে না হেঁটে রাষ্ট্র কেনো আমাদের এতো সুন্দর সবুজ জুমপাহাড়ে কৃত্রিম (অ-প্রাকৃতিক) ইট-পাথর-সিমেন্ট-সুরকির গতানুগতিক উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিতে চাইছে? এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর কথিত একদেশদর্শী গবেষক ও নিরাপত্তাবিদদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

বোঝা যায়, সামরিক জীবনে তাঁরা অস্ত্রবাজিতে এবং বর্তমানে গলাবাজিতে বেশ দক্ষ। কিন্তু প্রকৃতি-পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য-জাতিবৈচিত্র্য-সৌন্দর্য-শান্তি- সংহতির সুসমন্বিত বহুমাত্রিক বিকাশ ও সংরক্ষণ হাল আমলের সর্বাধুনিক ও সভ্য রাষ্ট্রনীতি। সম্প্রতি ভারত সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন– "আমাদের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সৌহার্দ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। যুগ যুগ ধরে বহুত্ববাদ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার শক্তি। এর মাধ্যমে আমরা ধর্ম, জাতি ও ভাষাগতভাবে দক্ষিণ এশিয়ার বৈচিত্র্যের উদযাপন করতে পারি। এটি হচ্ছে মৌলিক বিষয় *(সূত্র: প্রথম আলো, ৫ অক্টোবর ২০১৯)*।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশের জাতিবৈচিত্র্যকেই স্বীকার করে নিলেন। কারণ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের কোনো রাষ্ট্র

নয়। অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত উপরোক্ত পদ্ধতিতে কার্যকরভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি নিয়ে কথিত নিরাপত্তাবিদদের পড়াশুনো, ঔৎসুক্য ও জ্ঞানগম্যি নস্যি বলেই প্রতীয়মান হয়।

আসল সত্য হলো, সীমান্ত অঞ্চলে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা একটি অজুহাত মাত্র। কারণ ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রত্যক্ষ কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতি সেখানে নেই। যা আছে সেটি কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা। সিভিল প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী নিয়মিত বাহিনীই এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট। তাই পার্বত্য চুক্তিতে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়) ও সাধারণ প্রশাসনকে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন করার বিধান রাখা হয়েছে। এখন সেই বিধান কার্যকর না করে তার বদলে সাধারণ জনগণের প্রদত্ত ট্যাক্সের হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে লক্ষ লক্ষ সেনাসদস্য পাহাড়ে নিয়োজিত রাখার বিলাসিতা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? আর অন্য কোন দেশের সাথে যুদ্ধে জড়ানোর মতো কঠিন বাস্তবতাও তো সেখানে নেই। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, পাহাড়ে টনটনে সার্বভৌমত্বপন্থীদের চলমান যেসব কর্মকাণ্ড, তার মূল চালিকাশক্তি আসলে তাঁদের নিজেদের অন্তরে লালিত প্রবল আদিবাসী-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, প্রকৃতি-বিদ্বেষ, বৈচিত্র্য-বিদ্বেষ, ভিন্নধর্ম ও ভিন্নসংস্কৃতি-বিদ্বেষ, প্রকৃতিলগ্ন আদি জনতার সরল জৌলুষ ও রাজকীয় জীবনের প্রতি বিদ্বেষ প্রভৃতি। এর পাশাপাশি আমাদের পার্বত্য অঞ্চলকে গেরিলা যুদ্ধসহ একটি বিশ্বমানের বিশেষায়িত সামরিক প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসেবে বহাল রাখার তাগিদ তো আছেই। বলাবাহুল্য, জাতি-বিদ্বেষের পূর্বোক্ত বিশেষ ও সংকীর্ণ রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি সেই পাকিস্তান আমলে শুরু হলেও বাংলাদেশ পর্বে এসে পার্বত্য পাহাড়ে এর ব্যাপ্তি ও গুপ্তাঘাত পূর্বেকার নৃশংসতার সকল সীমা লঙ্ঘন করেছে। বর্তমানে আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহের প্রায় ছিন্নমূল বিপন্ন জীবন, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় নিয়মিত ও অস্বস্তিকর গোয়েন্দা নজরদারি এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে বন্দুকযুদ্ধের নামে সম্ভাবনাময় পাহাড়ি তরুণদেরকে 'ক্রশফায়ারে' হত্যা, বিনাবিচারে আটক-নির্যাতন-গুম-নিষ্পেষণ এর প্রমাণ। পার্বত্য অঞ্চলের একদা ঘন-অরণ্যবেষ্টিত এবং বর্তমানে শ্রীহীন ন্যাড়া পাহাড়গুলোও যেন সে সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

অন্যদিকে পাহাড়ি/আদিবাসী বিদ্বেষী সার্বভৌমত্বপন্থীদের লেখায়, দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কর্মকাণ্ডে সর্বদা প্রতিফলিত হচ্ছে ভারত ও মিয়ানমার-বিদ্বেষ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বিদ্বেষসহ ঐ অঞ্চলে ইসলামী ভাবধারা ও সংস্কৃতি বিকাশের মরিয়া আকাঙ্ক্ষাও। কিছুদিন আগে খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারাতে বিশাল এক বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দেওয়া, বাঘাইছড়ির শিজক দোরে বৌদ্ধ মন্দিরের জায়গায় সেনাক্যাম্প স্থাপন, পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে পবিত্র বৌদ্ধ/হিন্দু মন্দিরে জুতা পায়ে প্রবেশ করে সেনাদের যথেচ্ছ তল্লাশি, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হেনস্থা এবং দেবী দুর্গার মূর্তি, বুদ্ধের মূর্তি ও মন্দির নির্মাণে বাধা প্রদানের ঘটনাগুলোকে আমরা এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। এছাড়া উপরোক্ত আদিবাসী প্রান্তিকায়ন ও নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশের কিছু কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী কর্তৃক পাহাড়ের ভৌত-অভৌত সকল সম্পদ ভোগদখলের দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও প্রতিযোগিতা তো আছেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সর্বত্র মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসা নির্মাণ, ঘন অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়ে ইসলামী জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, উন্নয়নের নামে প্রকৃতিবৈরী রাবার চাষসহ নামে-বেনামে অস্থানীয়দের নিকট হাজার হাজার একর পাহাড় ভূমি ইজারা প্রদান, আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে লঙ্ঘন করে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণার নামে ভূমি অধিগ্রহণ এবং লুম্পেন পুঁজিনির্ভর পর্যটন শিল্পের প্রসার তার প্রমাণ। এই সকল বিষয় দেশের আদিবাসীবৈরী ওপেন-সিক্রেট পলিসিভুক্ত অপ্রিয় সত্য। তাই কথিত গবেষকদের কূটনীতি-ঋদ্ধ লেখনির মারপ্যাঁচে এসব আদিবাসী-হন্তারক গোপন এজেন্ডা ও বিষয় অপ্রকাশিতই থেকে যায়। তার বদলে তাঁরা সামনে নিয়ে আসেন সীমান্তের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা বিষয়ক জুজুর ভয়যুক্ত সব কল্পকাহিনী, যা ইতোপূর্বেও কিছুটা উল্লেখিত হয়েছে।

এভাবে চলতে থাকলে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের উপর চলমান রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন-বৈষম্য-বঞ্চনার অগ্রন্থিত কষ্ট-কাহিনীগুলো দেশের সাধারণ জনগণ কখনোই সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে পারবেন না। একটি সীমান্ত-জনপদের স্থানীয় জনগণকে বঞ্চিত-পীড়িত, বৈরী-বহিষ্থ, সন্দেহ-সংশয়দীর্ণ এবং রাষ্ট্রের সংবিধান-বহির্ভূত রেখে কিভাবে সেদেশের কথিত সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সুসংহত রাখা যাবে বা রাখা যায়, তার কোনো খোলাসা আলোচনা তাঁরা করবেন না। কারণ সেটি করতে গেলে এই তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা যে স্বদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার হরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য তাঁরা যুক্তি দিতে পারেন যে, সারা দেশের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গি আস্তানাগুলোতেও নিরাপত্তা বাহিনীর হামলা চালানোর খবর মাঝে মাঝে দেশের পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এর মাধ্যমে আপনি যে বিশেষ রাষ্ট্রীয় পলিসির আওতায় পাহাড়ে সৃষ্ট আদিবাসী গ্রুপগুলোর সাথে এই ধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গিদের অস্তিত্বকে গুলিয়ে দিচ্ছেন, তা কিন্তু বলবেন না। আর এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মাঝে মাঝে

বোধবুদ্ধিহীন কিছু আদিবাসী তরুণকে এনকাউন্টারে হত্যার পর আপনি দেশের বিশেষ কিছু প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তাঁদেরকে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দেশদ্রোহী ইত্যাদি পরিচয়ে চিহ্নিত করে যে সদর্প প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন, সে ব্যাপারে দেশ-বিদেশের সচেতন মহলও কিন্তু যথেষ্ট ওয়াকেবহাল। বিভিন্ন সময়ে এবং ইস্যুতে তাঁদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে, আলোচনায় সেটি প্রতীয়মান হয়।

> আসলে বর্তমানে বলবৎ আদিবাসী বিরোধী রাষ্ট্রীয় বিশেষ নীতির পরিবর্তন না ঘটলে পাহাড়ের কথিত এসব সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং রহস্যঘেরা ধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গি আস্তানাগুলোর তৎপরতা প্রশমিত হবে বলে মনে হয় না। আর রাষ্ট্রীয় কথিত বিশেষ নীতির পরিবর্তন ঘটলে মাত্র দুই/তিন মাসের মধ্যে পাহাড়ের তথাকথিত সকল সশস্ত্র ও জঙ্গি আস্তানা গুঁড়িয়ে দিয়ে এবং পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী আদিবাসীদের বিশেষ জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে পার্বত্য জনপদে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করি।

অন্যদিকে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক আদিবাসীদের উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা, আদিবাসী নারী-শিশুদের উপর তাদের পরিচালিত যৌন সহিংসতা-ধর্ষণ-নিপীড়ন, জুম্মদের ধর্মীয় উপাসনালয়, বুদ্ধমূর্তি, দেবী দূর্গামূর্তি ভাঙচুর প্রভৃতি নৃশংস ঘটনাগুলো আবার কীভাবে যেন দেশের মূলধারার সব মিডিয়া থেকে ব্ল্যাকআউট হয়ে যায়! সুতরাং আদিবাসীদের কল্যাণ বিষয়ে আপনাদের কথিত শুভবোধ ও মায়াকান্নার বয়ানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। আসলে বর্তমানে বলবৎ আদিবাসী বিরোধী রাষ্ট্রীয় বিশেষ নীতির পরিবর্তন না ঘটলে পাহাড়ের কথিত এসব সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং রহস্যঘেরা ধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গি আস্তানাগুলোর তৎপরতা প্রশমিত হবে বলে মনে হয় না। আর রাষ্ট্রীয় কথিত বিশেষ নীতির পরিবর্তন ঘটলে মাত্র দুই/তিন মাসের মধ্যে পাহাড়ের তথাকথিত সকল সশস্ত্র ও জঙ্গি আস্তানা গুঁড়িয়ে দিয়ে এবং পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী আদিবাসীদের বিশেষ জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে পার্বত্য জনপদে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করি। আমাদের সরকার ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর সে সামর্থ যে রয়েছে, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ব্রিটিশদের ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সময় একান্ত সহযোগী ভারত ও প্রতিবেশি মিয়ানমার পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো অংশের উপর নিজেদের মালিকানা প্রবলভাবে দাবি করেনি। অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রথিতযশা আমলা ও লেখক শ্রী অন্নদাশংকর রায় বলেছিলেন, ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশকে মানবিকতার খাতিরে সামরিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সহায়তা দিয়ে এমনি এমনি বদনাম কুড়িয়েছে। সেই সময় বরং আরাকানের রোহিঙ্গারা নিজেদের আবাসিত অঞ্চলকে পাকিস্তানভুক্ত করার জোর দাবি তুলেছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রয়াত নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, বল্লবভাই প্যাটেল প্রমুখেরা দেশ বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতভুক্তির পক্ষে মিনমিনে কণ্ঠে কিছু যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন মাত্র। আর সে কাজটিও তাঁরা করেছিলেন মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই যুগের ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের স্বনামধন্য জুম্ম নেতা শ্রী স্নেহ কুমার চাকমার ঐকান্তিক পীড়াপীড়ি ও চাপের কারণে। তখনও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়নি। তাই তার পক্ষে কিংবা তথাকার বাঙালিদের পক্ষে সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতভুক্তির বিরোধিতা করার বিষয়টিও ছিলো অবান্তর।

ইংরেজদের ভারত বিভক্তির ঠিক চব্বিশ বছর পরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই সময় পাকিস্তানের কাছ থেকে এবং ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা ও সম্মতিক্রমে নবীন বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পেয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারত ও পাকিস্তান পার্বত্য চট্টগ্রামকে যথাক্রমে 'শাসন বহির্ভূত অঞ্চল' এবং 'বিশেষভাবে শাসিত অঞ্চলের' মর্যাদা দিলেও বাংলাদেশ তার শাসনামলে পাহাড়ি এই অঞ্চলটির সেই বিশেষ মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখেনি। স্বাধীন বাংলাদেশের বাঙালিদের সাথে পার্বত্য আদিবাসীদের প্রত্যক্ষ ও মনোজাগতিক দ্বন্দ্বের সেই শুরু, যা আজও অব্যাহত আছে। এমনকি ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগাম চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকলেও এবং পার্বত্য সমস্যার একটা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সেই চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের সুযোগ কখনও গ্রহণ করেনি। বর্তমানে পাহাড়ে বিরাজমান যে সার্বত্রিক অশান্তি, তার অধিকাংশই আসলে এই বহুল আকাঙ্ক্ষিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ারই ফলশ্রুতি।

এটা চিরকালীন সত্য যে, ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা কোনো বিশেষ অঞ্চলে গোলমাল বাঁধিয়ে রাখলে তার সুযোগ শুধু প্রতিবেশীরা কেন, পৃথিবীর ভিন্ন গোলার্ধের দূর-দূরান্তের অন্যরাও যে নেয়, তার প্রমাণ তো আমাদের হাতের কাছেই

রয়েছে। বর্তমান সময়ের যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান, সিরিয়া, পাকিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, লেবানন, ইয়েমেন এবং আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বপন্থীরা যেহেতু জাতিকে জুজুর ভয় দেখিয়ে সর্বদা জুবুথুবু রাখতে চান, তার প্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন নিশ্চয়ই রাখা যায়। কারণ রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে শুধু জুজুর ভয়ে সন্ত্রস্ত, দুঃশ্চিন্তা-ভারাক্রান্ত থাকলে তো আমাদের চলবে না। সেই ভয়, দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়গুলো সত্যিই কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা, তা জানার এবং জেনে ভীতিমুক্ত হওয়ার অধিকারও নিশ্চয় আমাদের রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, সেসব অপ্রিয় ও আপেক্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের কথিত সার্বভৌমত্বপন্থীরা সঠিকভাবে আলোচনা করেন না। তাঁরা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত জুজুর ভয়ই কেবল দেখিয়ে যাচ্ছেন এবং এর অন্তরালে নিজেদের পাহাড়ি/আদিবাসী প্রান্তিকীকরণের যে গোপন এজেন্ডা, তা হাসিল করে চলেছেন।

বর্তমানে দেশের যে রাজনীতি এবং সার্বত্রিক উন্নয়নের যে বাস্তবতা তার প্রেক্ষিতে মনে হয়, আমাদের নিরাপত্তাবিদদের কথিত-কল্পিত সব বহিঃআক্রমণ সাধারণ জনপরিসরে বাস্তব কারণে এখনো পর্যন্ত সুদূরতর কল্পনারই অংশ। তাই আপাতদৃষ্টিতে এসব মায়া-মরীচিকাময় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য এখনো যথেষ্ট সময় তাঁদের হাতে মজুদ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে দেশের মাত্র এক দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা, অখন্ডতা নিয়ে আমাদের কথিত নিরাপত্তাবিদেরা সবসময় যতটা তৎপর ও ভাবিত, সমতলের বাকি ৯০ শতাংশ অঞ্চলকে নিয়ে তাঁদের সেই তৎপরতা ও আয়োজন সেভাবে চোখে পড়ে না। বাংলাদেশের মোট সেনাশক্তির এক তৃতীয়াংশ এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত। অথচ এই অঞ্চলটি দেশের মোট আয়তনের মাত্র এক দশমাংশ। অর্থাৎ দেশটির দশ ভাগের এক ভাগ। তাও পুরোপুরি নয়। তাহলে দেশের বাকি ৯০ শতাংশের জন্য বরাদ্দ মাত্র দুইভাগ সেনাশক্তি? আসলে রাষ্ট্রের বিশেষ মহল কর্তৃক পাহাড়ি-বিরোধী জুজুর ভয় ছড়ানোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বোঝার জন্য এই পরিসংখ্যানটিই যথেষ্ট।

এহেন একটি বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে বহুকাল আগে থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিজ দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাঁদের যাবতীয় বঞ্চনাবোধকে প্রশমিত করাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির মৌল আদর্শ ও কর্মপন্থা হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু দেশটির বৃহৎ নৃগোষ্ঠীর বিশেষ বাঙালি জাত্যাভিমানের কারণে বাস্তবে তা কখনো সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। রাজনীতির কুটিল-জটিল বাস্তবতার শিকার হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু মানুষ ১৯৪৭ সালে ভারতের পতাকা উত্তোলনে এবং ১৯৭১ সালে সামন্ত শ্রেণির কয়েকজন পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনে বাধ্য বা প্ররোচিত হয়েছিলেন। বহুযুগের প্রতারিত জীবনে অধিকার বঞ্চনা এবং স্বকীয় জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির বিষয়ে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তথা নিজেদের স্বাধীন সত্তা হারানোর ভয়ই ছিলো তাঁদের এহেন পক্ষাবলম্বনের কারণ। আদিবাসী জুম্মদের সে আশঙ্কা পরে বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। কারণ পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধের পানিতে পুরনো চাকমা রাজবাড়ি তলিয়ে দেওয়াসহ লক্ষাধিক পাহাড়ি মানুষ উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল হয়ে পড়েছেন। পরবর্তীকালে পার্বত্য জুম পাহাড়ে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের আগ্রাসন অপ্রতিরোধ্য গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পাহাড়ে জুম্ম আদিবাসী নিধনের নির্মম সব ঘটনা ঘটেছে। মৃগাঙ্ক শেখর চাকমা নামের এক পাহাড়ি মুক্তিযোদ্ধা সেদিন মেজর জিয়াকে কোলেপিঠে করে কমলছড়ির নিকটস্থ চেঙেই নদী পার করিয়ে দিয়ে তাঁর আগরতলায় পাড়ি জমানোর পথে সাহায্য করেছিলেন। অথচ সেই মৃগাঙ্ক চাকমা পাহাড়ি জাতিসমূহের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকালে শান্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়লে ১৯৭৭ সালে তখনকার প্রেসিডেন্ট জিয়ার সেনারাই তাঁকে ঐ কমলছড়ির ফেরীঘাটে (চেঙেই নদীর পাশে) গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এহেন ঐতিহাসিক নির্মমতা ও বঞ্চনার প্রেক্ষিতে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংহতির স্বার্থে দেশের স্বাধীনতার পর পাহাড়ের এইসব প্রান্তিক মানুষকে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার/স্বাধিকার বুঝিয়ে দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় ছিলো। কারণ ইতিহাসের নানা পর্বে বহুযুগের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বঞ্চনাই এসব মানুষকে বিপ্রতীপ স্রোতে প্রবাহিত হতে প্ররোচিত করেছিলো। তাই শুরুতেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শাসনকাঠামোর অভ্যন্তরে তাঁদেরকে স্বকীয় সত্তায় ও মর্যাদায় আগলে রাখাটা জরুরি কর্তব্য ছিলো। এতে তাঁদের বঞ্চনা ও বিপন্নতার বোধ প্রশমিত হতো। ফলে রাষ্ট্র কর্তৃক পাহাড়ে সেনা মোতায়েন জনিত যে হাজার কোটি টাকার অর্থহীন অপচয়, তা অবশ্যই রোধ করা যেতো। আর সেই অর্থসম্পদ কাজে লাগিয়ে দেশের সর্বত্র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভবপর হতো।

দেশের নীতিনির্ধারকদের মনোজগতে শুভবুদ্ধির উদয় হলে পার্বত্যাঞ্চলের সামরিক ব্যয় কমিয়ে এনে সেই অর্থ দিয়ে এখনও দেশের সর্বত্র 'উন্নয়নের জোয়ার' বইয়ে দেওয়া সম্ভব। সেই সুযোগ ও সুসময় এখনো বর্তমান। কারণ এটি সুনিশ্চিত যে, পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়ি জনগণ কোনোভাবেই দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি নন। অথচ আমাদের দেশের সকল কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠী আদিবাসীদের বিরুদ্ধে এই

নেতিবাচক মিথ্যাটিকেই নিজেদের স্বার্থে এযাবৎ ব্যবহার ও প্রচার করে আসছে। আর পার্বত্য অঞ্চলে অবাধে পর্যটন ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবসা, ভারত ও মিয়ানমারের সাথে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য, মোটা বেতনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে চাকরি, আভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং অস্ত্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণসহ আর্থিকভাবে লোভনীয় নানান ক্ষেত্রে এইসব কায়েমি গোষ্ঠীর যে সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে, তা দেশ-বিদেশের অনেক গবেষক অকাট্য যুক্তি সহকারে ইতিমধ্যে নিজেদের গবেষণায় তুলে ধরেছেন।

এহেন নেতিবাচক পরিস্থিতি ও বাস্তবতায় এখন রাষ্ট্রের জাতীয় সংহতি জোরদারকরণই প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। কারণ অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতের কথা আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। দেশের অভ্যন্তরের অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণের মওকা অন্য কাউকে দেওয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দেশের অভ্যন্তরের সেই ঐক্য কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? একক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ছায়াতলে তো সেই ঐক্য কোনোদিনই প্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ এদেশে বাঙালি জাতি ছাড়াও আরও অনেক জাতির বসবাস। আপনারা তাদেরকে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, জাতিসত্তা, সংখ্যালঘু বা সম্প্রদায় যে নামেই অভিহিত করুন না কেন বাস্তবতা হলো, বর্তমান বিশ্বসমাজে প্রচলিত ধারণা তথা আধুনিক নৃবিজ্ঞান ও সমকালীন বিদ্যাজগতের ভাষ্য অনুসারে এরা প্রত্যেকেই এক একটি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র জাতি। এই তত্ত্বটি এখন আইএলও এবং জাতিসংঘ দ্বারাও স্বীকৃত। সরকারের উচ্চশিক্ষিত মন্ত্রী-আমলাদের অনেকেই তা স্বীকার করেন। প্রায় ক্ষেত্রে সেটি তাঁরা করেন স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক তাড়নায়, কখনওবা বেখেয়ালে, অবচেতন মনে। আমি বাংলাদেশের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী জনাব আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, সাবেক তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক, প্রয়াত সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রমোদ মানকিন প্রমুখের বক্তৃতায় বহুবার দেশের আদিবাসীদের ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসহ এইসব জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী নামে ও পরিচয়ে সম্বোধন করতে শুনেছি।

একসময় বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে দেশের আদিবাসীদেরকে সম্মান জানিয়ে শুভেচ্ছাবাণী দিয়েছিলেন এবং 'আদিবাসী' নামেই তাঁদেরকে সম্বোধন করেছিলেন। অর্থাৎ আমলাতন্ত্র প্রভাবিত সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে গিয়ে তাঁরা অবচেতনে মেনে নিয়েছেন যে, বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও অন্য বহুজাতির বসবাস। এক কথায় বাংলাদেশ বহুজাতির, বহুভাষার, বহুধর্মের, বহুসংস্কৃতির দেশ।

সুতরাং উন্মুক্ত এই বিশ্ব ব্যবস্থায় আধুনিক বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানজগতের প্রতিষ্ঠিত ও সর্বসমাদৃত সত্যকে আপনি কিছু কাঠমোল্লার গবেষণা দিয়ে ঠেকাবেন কী করে? শুধু গোঁয়ার্তুমি দিয়ে কি সমকালীন জ্ঞানপ্রবাহকে ঠেকানো সম্ভব? আপনার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রাগ্রসর ছাত্র-ছাত্রী তো ঠিকই আপনার জবরদস্তিমূলক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। রাষ্ট্র পরিচালকদের বিশেষ ক্ষমতাধর একটি অংশের অনিঃশেষ বোকামির প্রতি সদর্প চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন - আপনাদের জ্ঞান, জানাশোনার পরিধি ও সিদ্ধান্ত ভুল। একটি আধুনিক দেশে বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যই দেশকে অধিক নিরাপদ, গণতান্ত্রিক, ইনক্লুসিভ এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে অধিকতর সমাদৃত ও আদরণীয় করে তোলে। একজাতির রাষ্ট্র একটি একঘেয়ে, বর্ণহীন ও প্রায়শই স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। তাই বর্তমান বিশ্বের আধুনিক ও উন্নত প্রায় সকল রাষ্ট্রই দেহে ও মননে বহুজাতিক এবং বিশ্বের বাকি রাষ্ট্রগুলোর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

এমনকি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষ হওয়া কিংবা ধর্মীয় চরমপন্থারসমূহ আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও জার্মানী এখনও লক্ষ লক্ষ সিরীয় উদ্বাস্তুকে নিজ দেশে নাগরিকত্ব দিয়ে বরণ করছে। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা বহুযুগ ধরে সেই কাজটি করে এসেছে, এথনিক ও কালচারাল ডাইভারসিটিকে প্রাধান্য দিয়ে। এখন সিদ্ধান্ত আপনার উপর, কোন পথে আপনি হাঁটবেন। ডাইভারসিটিকে গ্রহণ করবেন, নাকি একঘেয়ে, মনোটোনাস আত্মরতিতে তৃপ্ত থাকবেন। আধুনিক মননের অধিকারী হলে (আইএস সমর্থক হলে ভিন্ন কথা) আপনি ডাইভারসিটিকেই আসলে বেছে নেবেন। আপনি হয়তো বলবেন যে, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি হলো যুদ্ধবাজ ও পরসম্পদ লুণ্ঠনকারী দেশ ও জাতি। আর তারা এখন দরিদ্র দেশের নাগরিকদের প্রতি দরদ দেখাচ্ছে নিজেদের অর্থনীতির স্বার্থে। কিন্তু আপনি যেসব দেশ যুদ্ধবাজ নয় অথচ এথনিক ও কালচারাল ডাইভারসিটিকে সর্বদা প্রমোট করে যাচ্ছে, তাদের কথা কিন্তু বলবেন না। কানাডা, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়ামসহ অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলো যার প্রমাণ। শুধু সুইজারল্যান্ড ও সুইডেন কতোজন বাঙালিকে নিজ দেশে স্থান দিয়েছে তা কি আপনি জানেন?

অন্যদিকে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ যুদ্ধবাজ না হয়েও এবং কথিত উন্নত-উদার সংস্কৃতির অধিকারী হয়েও কেনো ডাইভারসিটি-সন্ত্রস্ত, কৃপণ ও 'দেবো না' আক্রান্ত মননের অধিকারী, তা আমরা কখনও আলোচনা করি না। আমাদের

দেশে ও সমাজে পারতপক্ষে অন্যকে কিছুই না দিয়ে সবকিছুকে নিজের ভোগদখলে নেওয়ার অনন্য মানসিকতাকে আমরা কি অস্বীকার করতে পারি? না হলে সারা দেশে কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষের মধ্যে সম্পদ দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা লাগিয়ে রেখে দেশের মাত্র ২% মানুষ কীভাবে এদেশের সিংহভাগ সম্পদের মালিক হতে পারেন? স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৬ বৎসর পরেও কীভাবে আমাদের দেশে ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার বৈষম্য চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে? এক্ষেত্রে দেশের সংখ্যাস্বল্প জাতিগুলোর দুরবস্থাটি কেমন হতে পারে, তা কি আমরা কখনো বিবেচনায় নিয়েছি? তাদের অধিকার সংরক্ষণে এবং আত্মপরিচয় নির্মাণে বৃহৎ নৃগোষ্ঠী কি কোনো আন্তরিক ও উদার ভূমিকা কখনও রেখেছে? পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৪টি আদিবাসী জুম্ম জাতির কথা বাদই দিলাম। তার বদলে শুধু মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেস্টিনীয় এবং কুর্দিদের কথাই ধরুন। তাঁদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এখনও নেই। কিন্তু তাই বলে কি তাঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র জাতি নন? দেশ নেই বলে আপনি যদি তাদেরকে জাতি হিসেবে স্বীকৃতি না দেন, তাহলে মিথ্যাভাষণের দায়ে আপনার দোজখবাস অবধারিত। কারণ আলোচ্য দুই জাতির জনগণ প্রত্যেকেই ঈমানদার মুসলমান এবং দুর্ভাগা হলেও ঐতিহাসিকভাবে এক একটি গৌরবদীপ্ত ও স্বতন্ত্র জাতির সন্তান। তাদের প্রত্যেকেরই গৌরবোজ্জ্বল অতীত, নিজস্ব উন্নত সংস্কৃতি, প্রথাগত শাসনব্যবস্থা, ভাষা, রীতিনীতি ও জীবনাচার রয়েছে। বিশ্বের ভূ-রাজনীতির মারপ্যাঁচে পড়ে আজ তাদের দুরবস্থার কোনো কমতি নেই।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের রয়েছে নিজস্ব প্রথাগত শাসনব্যবস্থা, উন্নত সংস্কৃতি, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম, ভাষা ও সমৃদ্ধ জীবনাচার। তাই এদেশে বসবাসরত বহু জাতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত এবং তা করার জন্য সংবিধানটিকে আরও একবার সংশোধন করা উচিত। কারণ দেশের স্বার্থে বা অপস্বার্থে এ পর্যন্ত অন্তত ষোলোবার তো সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করা হলো। এবার দেশের প্রকৃত সংহতি ও সামষ্টিক উন্নয়নের স্বার্থে আরেকবার না হয় এর সংশোধন করলেন। না হলে আমাদের সামনে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন কাহিনীর উদাহরণ তো আছেই। তার মানে দেশের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সুযোগ অন্যরা নেবেই। সেটি আগে বা পরে যখনই হোক। তাই বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সংহতির স্বার্থে পাহাড় ও সমতলের সকল আদিবাসী জাতিকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে একটি বহুজাতির, বহুধর্মের, বহুবর্ণের, বহুসংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক, জেন্ডার সমতাপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

> ‘আমি খুলে বলছি। বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে ব্রিটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা–পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার বিস্ময়।’
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আশু করণীয়

মঙ্গল কুমার চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে। রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাতের ফলে একদিকে জুম্ম জনগণের আত্মত্যাগ করতে হয়েছে অনেক তাজা প্রাণের, তেমনি প্রাণ দিতে হয়েছে সেনাবাহিনীর অনেক টগবগে জওয়ানেরও। ক্ষতি হয়েছে কোটি কোটি টাকার অর্থ ও সম্পদের। পাহাড়ি-বাঙালি অনেক সাধারণ মানুষের সইতে হয়েছে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের। ১৯৭২ সালে তৎকালীন গণপরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দাবি ও প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করা হলে এ ধরনের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি ও অসহনীয় যন্ত্রণার মুখোমুখী হতে হতো না। প্রায় আড়াই দশক ধরে হানাহানি ও সংঘাতের পর ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সত্তর দশকের ভুল সংশোধনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। সৃষ্টি হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্র। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পার্বত্য সমস্যার সমাধানে আমরা দেশবাসী, সরকার, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা-গোয়েন্দা-নিরাপত্তা বাহিনী, জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নীতি-নির্ধারক, নাগরিক সমাজ, জুম্ম জনগণ কি সেই পথে হাঁটবো নাকি ১৯৭২ সালের মতো আবার ভুল পথে পা বাড়াবো?

সরকারের পক্ষ থেকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ আসলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক উন্নয়নের কথা তুলে ধরা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গোড়া থেকেই উন্নয়ন-বঞ্চিত একটি অঞ্চল। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চল সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ও পশ্চাদপদ। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে সংঘাতময় ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে ছিল না উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ। স্বভাবতই এ অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয়া তথা বিশেষ উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। তাই পার্বত্য চুক্তিতেও পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ ও বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই উন্নয়ন কার্যক্রমকে পার্বত্য চুক্তির বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়ন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখবো নাকি চুক্তি বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে পরিচালিত করবো? বস্তুত উন্নয়ন কার্যক্রমকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তথা এতদাঞ্চলের জনমানুষের স্বশাসন, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা, স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি, অংশীদারিত্ব ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। বরঞ্চ যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম এসবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই উন্নয়ন কার্যক্রমে এতদাঞ্চলের জনমানুষের জনপ্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা অর্থাৎ নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণের ভূমিকা ও অর্থবহ অংশগ্রহণ যদি না থাকে এবং সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও জীবনজীবিকা যদি বিবেচনায় না নেয়া হয়, তাহলে সেই উন্নয়ন যেমন টেকসই হতে পারে না, তেমনি সেই অঞ্চলের জনমানুষের সংস্কৃতি, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও জীবনজীবিকা, অঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প ও 'অপারেশন উত্তরণ' নামে এক প্রকার সেনা শাসন বলবৎ রয়েছে, যা একটি গণতন্ত্রমুখী শাসনব্যবস্থায় কখনোই কাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেটেলার বাঙালি এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তি কর্তৃক বেদখলকৃত জমিজমা জুম্ম অধিবাসীরা এখনো ফেরত পায়নি। ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু জুম্ম পরিবারগুলোকে এখনো তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক পুনর্বাসন করা হয়নি। পার্বত্য

“পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প ও 'অপারেশন উত্তরণ' নামে এক প্রকার সেনা শাসন বলবৎ রয়েছে, যা একটি গণতন্ত্রমুখী শাসনব্যবস্থায় কখনোই কাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

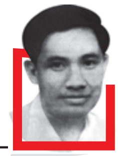

চট্টগ্রামের বাইরে এখনো সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা হয়নি সেটেলার বাঙালিদেরকেও। ফলে পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীরা প্রতিনিয়ত উচ্ছেদের কবলে পড়ছে। অব্যাহত ভূমি হারানোর প্রক্রিয়ায় তাদের জীবনজীবিকা ক্রমাগত বিপন্ন হয়ে পড়ছে। আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাসী অভিযান, ধর-পাকড়, অত্যাচার-নিপীড়নে তাদেরকে শারীরিক পঙ্গুত্ব ও জেল-জুলুম বরণ করতে হচ্ছে। তাহলে সেখানে লক্ষ কোটি টাকার উন্নয়ন কীভাবে এলাকার জনমানুষকে তৃপ্ত করবে? বলাবাহুল্য জেলে পুড়ে, ঘরবাড়ি নির্বিচার তল্লাসী ও জিনিসপত্র তছনছ করে, যে কোন সময় অকথ্য নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়-ভীতির মধ্যে দিনাতিপাত করে, ভূমি থেকে ক্রমাগত উচ্ছেদ করে, জীবনজীবিকা বাধাগ্রস্ত করে, জুম্মদের সংস্কৃতি-স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-অস্তিত্ব বিপন্ন করে, মানুষের জানমাল অনিরাপত্তার দিকে ঠেলে দিয়ে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে মানুষ কোন ভাবেই সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত থাকতে পারে না।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে পার্বত্য চুক্তির যথাযথ, পূর্ণাঙ্গ ও দ্রুত বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। এই চুক্তির প্রতি আপামর জুম্ম জনগণের সমর্থন রয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে রয়েছে। এ চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়ন চান দেশের গণতন্ত্রকামী নাগরিক সমাজ। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ চুক্তিকে সাদরে গ্রহণ করেছে। দেশের দক্ষিণপন্থী ও মৌলবাদী রাজনৈতিক শক্তি এ চুক্তির বিরোধিতা করলেও চুক্তির পর পাঁচটি রাজনৈতিক সরকার ও দুইটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার– মোট ৭টি সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসলেও কোন সরকার এ চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। জুম্ম জনগণসহ দেশে-বিদেশে আজ অন্যতম দাবি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, পূর্ণাঙ্গ ও দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের তরফ থেকে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা করা। বস্তুত পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের যথাযথ, পূর্ণাঙ্গ ও দ্রুত বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান। নিম্নে পাঠক সমাজের জানা ও বুঝার সুবিধার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের উপর বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় যুক্তি ও অবস্থা তুলে ধরা হলো–

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম/উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ

ঐতিহাসিক কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জুম্ম/পাহাড়ি/উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল। ব্রিটিশ আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিশেষ বিধিবিধান কার্যকর ছিল এবং বর্তমানেও কিছু মাত্রায় বলবৎ রয়েছে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৫১ ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বসতিস্থাপন ও প্রবেশের উপর বিধি-নিষেধ ছিল। জুম্ম জনগণের মতামত ব্যতিরেকে বিভিন্ন সরকার কর্তৃক ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির একের পর এক কাটাছেঁড়ার পরও উক্ত শাসনবিধিতে যা অবশিষ্ট আছে তাতে এখনো বহিরাগতদের নিকট উদ্যান চাষের জন্য কেবল দীর্ঘমেয়াদী ভূমি ইজারা দেয়ার বিধান রয়েছে, স্থায়ী বন্দোবস্তী দেয়ার কোন বিধান নেই। তারই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে এই উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য এখনো পর্যন্ত কোন আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে সহায়ক চুক্তির অন্যান্য বিষয়গুলোও অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে।

সরকার বলছে, "সরকারের রূপকল্প ভিশন ২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।" বস্তুত এখানে কেবল 'অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা'র কথা বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধানের কথা বলা হয়নি। তাই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ পরিপূরণ হতে পারে না।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি/উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে– পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল মর্মে সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা; সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের ৪ উপ-অনুচ্ছেদে "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের" শব্দসমূহের অব্যবহিত পরে 'বা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর পাহাড়িদের' শব্দসমূহ সংযোজন করা; উনিশ্শো আশি দশকে পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে সমতল জেলাগুলোতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা; এবং পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন

মর্মে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২১/১২/২০০০ তারিখে ইস্যুকৃত প্রশাসনিক আদেশ প্রত্যাহার করা অতীব জরুরী হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

২. চুক্তির কার্যকারিতা ও আইনী হেফাজত

এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সই করার তারিখ হতে বলবৎ হবে এবং বলবৎ হওয়ার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে বদিউজ্জামান ও ২০০৭ সালে এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত পৃথক দু'টি মামলায় গত ১২-১৩ এপ্রিল ২০১০ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসাংবিধানিক মর্মে অবৈধ বলা হয়েছে বলে যে রায় দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আপিল আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের রায় স্থগিতাদেশ জারি করে। আপীল বিভাগে চলমান আপীল মামলা নিষ্পত্তির জন্য সরকারের তরফ থেকে তেমন সক্রিয় ও কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। ফলে আজ ১০ বছর ধরে মামলাটি আপীল বিভাগে ঝুলে রয়েছে। এই আপীল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি তথা চুক্তি অনুসারে প্রণীত আইনের সাংবিধানিক গ্যারান্টি এখনো অর্জিত হয়নি। বলাবাহুল্য, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে চুক্তির সাংবিধানিক গ্যারান্টির দাবি করা হয়েছিল। তখন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাই তাদের পক্ষে সাংবিধানিক গ্যারান্টি বা স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হবে না। তবে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তা প্রদান করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। অথচ সংসদে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরে ৩০ জুন ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮ এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ (সংশোধন) সংবিধানের ১নং তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কালে এ বিষয়ে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং বর্তমান সংসদেও এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কার্যকারিতা ও সাংবিধানিক আইনী হেফাজত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে চলমান আপীল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮ এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন-১৯৮৯ (১৯৯৮ সালের সংশোধনীসহ) সংবিধানের ১নং তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য বিভিন্ন আইন ও বিধানাবলী সংশোধন

চুক্তির 'ক' খণ্ডের ২নং ধারায় এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করা হবে বলে বিধান রয়েছে। তদনুসারে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধিত ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ পাশের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর যথাযথভাবে বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হয়েছে। তবে এখনো এই আইনের অধীনে ভূমি কমিশনের বিধি তৈরি হয়নি।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আরো অনেক জাতীয় আইন ও বিধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ আইন ও বিধি রয়েছে যেগুলো এখনো সংশোধন করা হয়নি। এসব আইন ও বিধি সংশোধিত না হওয়ার ফলে চুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে ও কার্যকরকরণে সাংঘর্ষিক ও বিরোধাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির দোহাই দিয়ে জেলা প্রশাসকরা এখনো তিন পার্বত্য জেলার ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি পরিচালনা করে চলেছেন। চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪(ক) ধারায় ও চুক্তি অনুসারে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের প্রথম তফসিলের ২৪ ক্রমিকে 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি এবং চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৬ ধারায় ও চুক্তি অনুসারে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ ধারায় "আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন" পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ যে কোন জায়গা-জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর বা

অধিগ্রহণ করা যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে। অথচ ডেপুটি কমিশনাররা তথা সরকার পার্বত্য জেলা পরিষদের এই বিধান বেমালুম ভুলে যান। অধিকন্তু একাধিক আইনের মধ্যে সাংঘর্ষিক বিধান থাকলেও সর্বশেষ আইনটিই কার্যকারিতা ও প্রাধান্য লাভ করে থাকে তার আইনী ব্যাখ্যাও তাদের না জানার কথা নয়। তা সত্ত্বেও ডেপুটি কমিশনাররা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে ও শাসকগোষ্ঠীর মদদে চুক্তিতে বিধৃত এসব বিধানাবলী অবাধে লঙ্ঘন করে চলেছেন।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশ পুলিশ আইন ১৮৬১ ও পুলিশ রেগুলেশনের দোহাই দিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদকে উপেক্ষা করে পুলিশ কর্তৃপক্ষ পার্বত্য জেলার পুলিশ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়টি একতরফাভাবে পরিচালনা করে চলেছেন। অথচ চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪ ধারায় 'আইন-শৃঙ্খলা' ও 'পুলিশ (স্থানীয়)' বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর এবং চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪ ধারায় পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য নিয়োগ এবং তাদের বদলী ও তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধি-বিধান রয়েছে। দেশে বিদ্যমান পুলিশ আইন ও রেগুলেশনের দোহাই দিয়ে চুক্তিতে বিধৃত পার্বত্য জেলা পরিষদের পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা এখতিয়ার সংক্রান্ত বিধানাবলী কার্যকর করতে সরকারি বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বর্ণিত আইন, বিধি ও প্রবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ধারা বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ৪২টি আইন, বিধি ও প্রবিধানের তালিকা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে এখনো কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০; পুলিশ আইন ১৮৬১ ও পুলিশ রেগুলেশন; পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) প্রবিধান ১৯৫৮; স্থানীয় পরিষদ (ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা) আইন; বন আইন ১৯২৭ ইত্যাদি আইনগুলো অগ্রাধিকারসহ আঞ্চলিক পরিষদের দেয়া ৪২টি আইন, বিধি ও প্রবিধান অচিরেই সংশোধন করা অপরিহার্য।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল একটি আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত একক অঞ্চল এবং ঐতিহাসিকভাবে একটি বিশেষ শাসিত অঞ্চল। তারই আলোকে পার্বত্য চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে নিয়ে পার্বত্যাঞ্চলের বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে পরিষদের আওতাধীন ৩৩টি কার্যাবলী সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা এবং অঞ্চল পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলী, পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার, ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান ইত্যাদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা। কিন্তু এসব বিষয় এখনো যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অনেকটা অকার্যকর অবস্থায় রাখা হয়েছে। পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার পরিপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী পূর্ণাঙ্গ কার্যকর করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার সম্বলিত স্বশাসন এবং নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করা ও বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধিকতর শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), বন (রিজার্ভ ফরেস্ট ব্যতীত) ও পরিবেশ, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, পর্যটন (স্থানীয়), আদিবাসী/উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার, যুব কল্যাণ, জুম চাষসহ মোট ৩৩টি বিষয় বা কার্যাবলী হস্তান্তরে বিধান করা হয়েছে। মোট ৩৩টি কার্যাবলীর মধ্যে ১৭টি বিষয়/কার্যাবলী হস্তান্তরিত হয়েছে। তবে তার মধ্যে ১২টি বিষয় অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু সরকার দাবি করছে যে, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে ২৮টি করে এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে ২৬টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে। চুক্তির পূর্বে হস্তান্তরিত বিষয়/কার্যাবলী অধীনে ৭টি কর্ম/প্রতিষ্ঠান সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) হস্তান্তর করেছে এবং এসব কর্ম/প্রতিষ্ঠানগুলো একেকটি স্বতন্ত্র বিষয়/কার্যাবলী হিসেবে গণ্য করে হস্তান্তরিত বিষয়/কার্যাবলীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৮টি ও ২৬টি হিসেবে দেখানো হচ্ছে যা প্রতারণামূলক ও অসত্য। এখনো ১৬টি বিষয়/কার্যাবলী হস্তান্তরিত হয়নি এবং হস্তান্তরিত ১২টি কার্যাবলীর বিভিন্ন কর্ম, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অবকাঠামো, বেতন-ভাতা ইত্যাদি হস্তান্তরিত হয়নি। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন– জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন; ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; পুলিশ (স্থানীয়); বন ও পরিবেশ; যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি

বিষয়সমূহ- যেগুলোর সাথে পার্বত্যবাসীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ও ভূমি অধিকার যুক্ত রয়েছে সেসব বিষয়সমূহ এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ বিশেষ শাসনকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং জুম্ম জনগণসহ পার্বত্যবাসীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ৩৩টি বিষয়/কার্যাবলী যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে হস্তান্তর করা অপরিহার্য।

এভাবে সরকার পার্বত্য চুক্তিতে বিধৃত অনেক ক্ষমতা ও কার্যাবলী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণভাবে হস্তান্তর করে চলেছে। এর ফলে হস্তান্তরিত বিষয় ও কার্যাবলীর উপর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ না আসায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। তাই বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পার্বত্য চুক্তিতে সন্নিবেশিত সকল বিষয় ও কার্যাবলী পরিষদের পূর্ণাঙ্গভাবে আওতাধীন করতে হবে। এক্ষেত্রে চুক্তিনামার মধ্য দিয়ে হস্তান্তর না করে আইন অনুসারে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পূর্ণাঙ্গভাবে বিষয়/কার্যাবলী হস্তান্তর করা অত্যাবশ্যক।

ইহা বিশেষ উল্লেখ্য যে, তৎকালীন তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে, যার মেয়াদ শেষ হয় ১৯৯২ সালে। তারপর থেকে, এমনকি ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর দুই দশকের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা আজ অবধি প্রণীত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত দু'টি খসড়া বিধিমালা সরকারের নিকট জমা দেয়া হলেও সরকার সেগুলো বছরের পর বছর ধরে ফেলে রেখে দিয়েছে।

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ গঠনের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অথচ এগুলো আজ বছরের পর বছর ধরে অনির্বাচিত বা মনোনীত পরিষদ দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে মূল কাজটাই সম্পন্ন হয়নি অর্থাৎ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচিত পরিষদই গঠিত হয়নি সেখানে সরকার কিভাবে দাবি করতে পারে এসব বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে? অনির্বাচিত বা মনোনীত পরিষদ দিয়ে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে সরকার ফেরি করছে যে, আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে, এ সংক্রান্ত সিংহভাগ ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে ইত্যাদি। বস্তত জবাবদিহিমূলক, জনপ্রতিনিধিত্বশীল, বলিষ্ঠ পরিষদ গঠনে এবং পার্বত্যাঞ্চলের বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা অত্যন্ত জরুরী। তদুদ্দেশ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা অচিরেই প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক।

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯(গ)নং ধারায় তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করার বিধান রয়েছে। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির দোহাই দিয়ে পূর্বেকার মতো জেলার সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন। বলাবাহুল্য, একাধিক আইনের মধ্যে কোন সাংঘর্ষিক বিধান থাকলে তাহলে সর্বশেষ আইনটিই কার্যকারিতা ও প্রাধান্য লাভ করে থাকে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় তার উল্টোটাই লক্ষ করা যায়। ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে প্রণীত আইন থেকে ১৯০০ সালে উপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রণীত প্রবিধানই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। বস্তত সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে জেলা প্রশাসকরা এভাবে চুক্তি লঙ্ঘন করে আঞ্চলিক পরিষদের এখতিয়ারকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা দেখিয়ে চলেছেন। অপরদিকে চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১১ ধারায় ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই শাসনবিধি এখনো সংশোধিত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে এই শাসনবিধি সংশোধনের সুপারিশমালা ও প্রস্তাবাবলী সরকারের কাছে পেশ করা হলেও সরকার তা বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রেখেছে। তাই পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধন করা অপরিহার্য। সর্বোপরি আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণের (জেলা প্রশাসকগণের) Charter of Duties নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ও বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্বার্থে পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করার বিধান কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরী।

৫. প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করা

আশি ও নব্বই দশকে সংঘাতময় ও অশান্ত পরিস্থিতির কারণে দফায় দফায় প্রায় এক লক্ষাধিক জুম্ম অধিবাসী ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে সরকারি প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা রেখে কিংবা স্বউদ্যোগে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালে জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ও সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি এবং জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১নং ধারা মোতাবেক ১২,২২২ পরিবারের ৬৪,৬০৯ জন জুম্ম শরণার্থী দেশে ফেরত আসেন। টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে প্রত্যাগত শরণার্থীদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির মতে, প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে ৯,৭৮০ পরিবার জুম্ম শরণার্থী জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ পাননি এবং অনেকে অর্থনৈতিক সুবিধাদিসহ অন্যান্য অনেক সুযোগ-সুবিধাদি লাভ করেননি। প্রত্যাগত শরণার্থীদের অন্তত ৪০টি গ্রাম সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো যথাযথভাবে হতে পারেনি।

সংঘাতময় ও অশান্ত পরিস্থিতির কারণে আশি ও নব্বই দশকে আরো অনেক জুম্ম অধিবাসী নিজ গ্রাম, এলাকা ও মৌজা হতে উদ্বাস্তু হয়ে নিরাপত্তার স্বার্থে পার্বত্যাঞ্চলের অভ্যন্তরে অন্য স্থানে কিংবা গভীর অরণ্যে বা দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, যাদেরকে পার্বত্য চুক্তিতে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১ ও ২নং ধারায় পার্বত্য চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে এসব জুম্ম আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদেরকে পুনর্বাসনের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি সেসব জুম্ম আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি।

পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠিত হয়ে আসছে। খাগড়াছড়িতে টাস্কফোর্সের একটি কার্যালয়ও স্থাপন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স গঠিত হলেও টাস্কফোর্সকে পর্যাপ্ত তহবিল, প্রয়োজনীয় জনবল ও পারিসম্পদ বরাদ্দ করা হয়নি। ফলে জুম্ম আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক পুনর্বাসনের কাজ টাস্কফোর্স যথাযথভাবে এগিয়ে নিতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চুক্তিকে লঙ্ঘন করে ১৯ জুলাই ১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে সেটেলার বাঙালিদেরকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য টাস্ক ফোর্সকে এক নির্দেশনা দেয়া হয়। পার্বত্য চুক্তি বিরোধী এই নির্দেশনার বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতি ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং চুক্তি বিরোধী উক্ত নির্দেশনা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। এতে করে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে এক জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয়। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের উক্ত নির্দেশনা অচিরেই প্রত্যাহার করা দরকার।

৬. ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম দিক হচ্ছে ভূমি সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানকল্পে পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৪, ৫ ও ৬ ধারায় বিশেষ বিধান সন্নিবেশ করা হয়। সরকারের মতে, ৪নং ধারায় উল্লেখিত বিষয়– "জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে" মর্মে যে উল্লেখ রয়েছে তা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে।

সরকারের মতে, ৫নং ধারায় অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে এবং আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তিন চেয়ারম্যান, তিন প্রথাগত সার্কেলের তিন সার্কেল চীফ এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারকে নিয়ে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠনের যে বিধান রয়েছে, তা বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারি প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ৬(ক)নং ধারায় বর্ণিত "কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে" মর্মে যে বিষয়টি রয়েছে তাও বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে সরকারি প্রতিবেদনে ৬(খ) ধারায় উল্লেখিত "কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন" মর্মে যে বিধান রয়েছে তা চলমান রয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির অবস্থা কোথায় রয়েছে তা তলিয়ে দেখা হয়, তাহলে এককথায় বলা যায়, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বিগত দুই দশকে একটি ভূমি বিরোধও নিষ্পত্তি হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা

ও পরামর্শ ছাড়া ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণয়ন করায় চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্মক ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ক্রমাগত দাবি-দাওয়া এবং বাদ-প্রতিবাদের পর ২০১৬ সালের অক্টোবরে আইনের সেসব বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হয়। কেবল আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করতে যদি ১৫ বছর সময় লাগে, তাহলে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ কতটুকু এগিয়েছে তা অনুমান করতে তেমন কোন বেগ পেতে হবে না। আর যেখানে এখনো একটিও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব হয়নি, সেখানে সরকার দাবি করছে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তিনটি ধারার মধ্যে ৪নং ধারাটি আংশিক বাস্তবায়িত, ৫নং ধারাটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত এবং ৬নং ধারার (ক) দফা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে আর (খ) দফা বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে, তাহলে সরকারের ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে সেটা কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ তা অনায়াসে ধারণা করা যায়। বিষয় ভিত্তিক সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়নের অবস্থা তুলে না ধরে সরকার খণ্ডিতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে গাণিতিক হারে চুক্তি বাস্তবায়নের বিরাট অর্জন দেখাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারাসমূহ ২০১৬ সালে যথাযথভাবে সংশোধিত হলেও এখনো কমিশনের বিধিমালা প্রণীত হয়নি। ভূমি কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক কমিশনের বিধিমালা খসড়া তৈরি করে ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সরকারের নিকট জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিধিমালা এখনো ঝুলিয়ে রাখা রয়েছে। অধিকন্তু ভূমি কমিশনের প্রধান কার্যালয় খাগড়াছড়ি জেলায় স্থাপন করা হলেও কমিশনের নেই পর্যাপ্ত জনবল, তহবিল ও অপর দুই জেলায় শাখা অফিস। কমিশনের বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ আটকে রয়েছে। সর্বশেষ গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন, কমিশনের কাজের অগ্রগতি, আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু ব্যক্তিগণ ইত্যাদি গতানুগতিক বিষয়ে আলোচনা হয়। বস্তুত এই পর্যন্ত ভূমি কমিশনের কাজে কোন অগ্রগতি হয়নি। এভাবেই চুক্তির পর দুই দশক ধরে একের পর এক চেয়ারম্যান নিয়োগের মধ্য দিয়ে ভূমি কমিশন পুনর্গঠন এবং সময় বিশেষে কমিশনের গতানুগতিক সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভূমি কমিশনের কার্যক্রম সীমিত রয়েছে এবং সেভাবে ভূমি কমিশনকে সরকার অনেকটা ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করে রেখে দিয়েছে।

চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৮নং ধারা মোতাবেক যে সকল অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা লীজ পাওয়ার পর দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির ইজারা বাতিল করার বিধান থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৯ সালে আওয়ামলীগ কর্তৃক পুনরায় সরকার গঠনের পর বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৫৯৩টি প্লটের প্রায় ১৫,০০০ একর জমি এবং রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রায় ৩৫০ একর ভূমি লীজ বাতিল করা হয়। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে লীজ বাতিলের দু' মাসের মাথায় বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করা হয়। অন্যদিকে পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসকরা অস্থানীয়দের নিকট নতুন নতুন ইজারা প্রদান করে চলেছে। এসব ভূমি হচ্ছে আদিবাসী জুম্মদের প্রথাগত মৌজা ও জুম ভূমি। এসব ভূমির ইজারা বাতিল না হওয়ায় কিংবা আরো নতুন নতুন ইজারা প্রদান করায় বিশেষ করে বান্দরবান জেলায় স্থানীয় জুম্মদের জীবনজীবিকা সংকটের মধ্যে পড়েছে এবং ভূমি নিয়ে বেদখলকারী তথাকথিত ইজারাদারদের সাথে জুম্ম গ্রামবাসীদের প্রতিনিয়ত সংঘাত সংঘটিত হচ্ছে। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির স্বার্থেই অচিরেই অস্থানীয়দের নিকট দেয়া সকল ভূমি ইজারা বাতিল অতীব জরুরী।

৭. অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার

চুক্তির 'ঘ খণ্ডের ১৭নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত দুই দশকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়ার লক্ষ্যে সময়-সীমা

নির্ধারণ করা হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) দুই দফায় ৬৬টি ক্যাম্প (যার তালিকা জনসংহতি সমিতির নিকট হস্তগত হয়েছে) এবং ২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ কর্তৃক পুনরায় সরকার গঠনের পর আরো ৩৫টি ক্যাম্প– মোট ১০১টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জনসংহতি সমিতি স্বীকার করেছে। কিন্তু অন্যদিকে সরকার দাবি করছে যে, এযাবৎ ৯৬টি সেনা ক্যাম্প, ৪৬টি বিজিবি ক্যাম্প, ৩৪টি এপিবিএন ক্যাম্প, ৪৬টি জেলা পুলিশ/রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স ও ১৬টি আনসার ক্যাম্প মোট ২৩৮টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে পার্বত্য চুক্তির অন্যতম পক্ষ হিসেবে জনসংহতি সমিতির নিকট এসব ক্যাম্পের সকল তালিকা হস্তগত হয়নি বলে সমিতি দাবি করছে। অপরদিকে অনেক প্রত্যাহৃত ক্যাম্প পরবর্তীতে পুনর্বহাল করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আরো উল্লেখ্য যে, চুক্তির পূর্বে জারিকৃত 'অপারেশন দাবানল' এর নাম পরিবর্তন করে সরকার ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনা শাসন বলবৎ রাখে। 'অপারেশন উত্তরণ' এর বদৌলতে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, ভূমি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বনজ সম্পদ ইত্যাদির উপর হস্তক্ষেপ করে চলেছে। 'অপারেশন উত্তরণ' জারির মাধ্যমে একপ্রকার সেনাশাসন বলবৎ থাকায় পার্বত্যাঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকরকরণে বাধা হিসেবে কাজ করছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে তথা গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অচিরেই 'অপারেশন উত্তরণ' নামক একপ্রকার সেনাশাসনসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা অতীব জরুরী।

৭. উপসংহার

২০০৯ সালে বর্তমান মহাজোট সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অব্যাহতভাবে দাবি করে চলছে পার্বত্য চুক্তির ৭২ ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। বাকিগুলোর মধ্যে কয়েকটি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত, আর কতকগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে প্রচার করে চলেছে। অপরদিকে জনসংহতি সমিতি মতে চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বোপরি চুক্তির মৌলিক ধারাসমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থার ব্যাখ্যা দিয়ে জনসংহতি সমিতি প্রতিবছর প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের জন্য যে কমিটির দায়িত্ব রয়েছে, যে কমিটি চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার ও জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সেই কমিটির মতামত ও প্রতিবেদনের উপর প্রাধান্য না দিয়ে কিংবা প্রতিবেদন না চেয়ে সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এককভাবে (জনসংহতি সমিতির মতামত না নিয়ে) ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। অথচ পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে চুক্তির বাস্তবায়িত ও অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ পরিচিহ্নিত করে এই পাল্টাপাল্টি বিতর্ক লাঘব করা যায় এবং তদনুসারে চুক্তি বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় বলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চুক্তিতে তিনটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। সেগুলো হলো– (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি, যার বর্তমান আহ্বায়ক হচ্ছেন সরকারের পক্ষে পার্বত্য চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ও তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এমপি; (২) প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য একটি টাস্কফোর্স, যার বর্তমান চেয়ারম্যান হচ্ছেন খাগড়াছড়ি আসনের সাংসদ কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এবং (৩) ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন যার বর্তমান চেয়ারম্যান হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ার-উল হক।

এই তিনটি কমিটি বাহ্যত কার্যকর রয়েছে এবং কমিটি তিনটির নিয়মিত সভাও হচ্ছে। কিন্তু এসব কমিটি কার্যত অচলই বলা যায়। এসব কমিটির সভায় নিয়মিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কিন্তু গৃহীত সিদ্ধান্তবলী প্রায়ই বাস্তবায়িত হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ২০১৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে পাঁচটি উচ্চ পর্যায়ের সভা, যেমন– জানুয়ারি ২০১৮-তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার মধ্যে একটি সভা, ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের দুইটি সভা, ২০১৮ সালের এপ্রিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির একটি সভা, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের মধ্যে পরপর দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ গত ১৬ জুন ২০১৯ ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এসব সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের

কোন নামগন্ধ নেই। এভাবেই সরকার এসব কমিটিগুলোকে কার্যত অচল ও অকার্যকর অবস্থায় রেখে দিয়েছে।

উপরন্তু এসব কমিটির, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় অফিস, জনবল ও পারিসম্পদ বরাদ্দ নেই বললেই চলে। কাজেই যেসব কমিটির উপর পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব, সেসব কমিটির সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবায়ন না হয় এবং সেসব কমিটির যদি পর্যাপ্ত অর্থ, প্রয়োজনীয় অফিস, জনবল ও পারিসম্পদ না থাকে, তাহলে চুক্তি বাস্তবায়ন হবে কিভাবে? এসব কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অর্থ, জনবল ও অফিস ব্যবস্থার মাধ্যমে শক্তিশালীকরণের দায়িত্ব সরকারের। সরকার কর্তৃক এভাবে এসব কমিটিগুলোকে অথর্ব ও অকার্যকর অবস্থায় রাখার মধ্য দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতি সরকার কতটুকু আন্তরিক ও সদিচ্ছাপূর্ণ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। দেশের সামগ্রিক স্বার্থেই এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থেই এ চুক্তি বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী। চুক্তি মোতাবেক চুক্তির অন্যতম পক্ষ জনসংহতি সমিতি তার অধীনস্থ সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মে মাসের মধ্যে চারদফায় সরকারের নিকট জমা দিয়েছে। সরকারের প্রতি আস্থা রেখে সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। সেই সাথে সাথে জনসংহতি সমিতি তার সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী বিলুপ্ত করেছে। তাই এখন চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যই হচ্ছে প্রধান। এক্ষেত্রে দেশের নাগরিক সমাজসহ জনসংহতি সমিতির দায়িত্ব হচ্ছে সহযোগী ভূমিকা পালন করা এবং তারা তা নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করে আসছেন। তাই আর বিলম্ব না করে দেশের সামগ্রিক স্বার্থে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ পূর্বক রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও সদিচ্ছাপূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে সরকারকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

> “আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*”

জুমের দেশে ফিরে এসো

সৌরভ চাকমা জুম্ম

শরতের বিদায়ে, শীতের আগমনে
জুম পাহাড়ে ফিরে আসে শোকের মাস,
জুমিয়াদের মননে নেমে আছে শোকের ছায়া,
পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে যায় এক হৃদয় বিদারক হাওয়া।
১০ নভেম্বর ভোরের রাতে
ধুধুকছড়ার পাহাড়ের বুকে গড়িয়েছিল
বীর সেনানীদের বুকের তাজা রক্ত;
বুলেটের আঘাতে সেদিন
পাহাড়ের বুকে লুটিয়ে পড়েছিল
চেতনার অগ্রদূত মহান নেতার নিষ্প্রাণ দেহখানি,
চিরবিদায়ের সন্ধিক্ষণেও সহযোদ্ধাদের শুনিয়েছিল অভয় বাণী।
সেদিনের আকাশ ছিল মেঘলা, প্রকৃতিও কেঁদেছিল অঝোরে
পাহাড়ের প্রকৃতিতে বেড়ে উঠা প্রিয় নেতার চির বিদায়ে।
শত শত অনুগামীরা,
সেদিন লিডারের গুলিবিদ্ধ ঝাঁঝড়া বুকের দিকে তাকিয়ে
অশ্রুসিক্ত নয়নে বিলাপ করে কেঁদেছিল,
'স্যার, ও স্যার, আমরা তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না'
'তুমি ছাড়া কোথায় থাকবো স্যার?'
কেঁদেছিল শত শত দেশপ্রেমিক, লড়াকু সৈনিকরা
পাহাড়ের আকাশ-বাতাস কম্পিত হয়েছিল আর্তনাদে
সেদিন লিডারের চোখ থেকে অশ্রু ঝরেনি,
গড়িয়ে পড়েছিল বুকের তাজা রক্ত।
ধীরে ধীরে দুচোখ বন্ধ হয়ে স্বপ্নগুলো হয়ে গেল বিলীন,
প্রিয় নেতার বিদায়ে,
পাহাড় জুড়ে অরণ্য জননী
বড়গাঙ-কাজলং-চেঙে-মেয়োনি-শঙ্খ-মাতামুহুরী
ফুরোমোন-কেওক্রাডং-চিম্বুক
পাহাড়ের বুকে জুম ক্ষেত
পাহাড় বেয়ে আসা ঝর্ণা
জুমের পায়ে হাটা পথ
সবাই কেঁদেছিল।
পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পায়ে হাটা পথে
কিংবা শিশির ভেজা বুনো পথ ধরে
হয়তো কখনো ফিরবে না,
কখনো সাদাসিধে মুখ নিয়ে হাসবে না,
ফিরবে নতুন রূপে,
শত শত অনুগামীর মাঝে সে ফিরবে
জুম পাহাড়ে তাকে ফিরতে হবে।
গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের ষড়যন্ত্র
কেড়ে নিয়েছিল লিডারের তাজা প্রাণ,
কেড়ে নিতে পারেনি চিন্তা-চেতনা।
লিডারের চিন্তা-চেতনা, মুক্তির আদর্শ
আজ তরুণ প্রজন্মের সাধনা
রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ, বিপ্লবী চেতনা।
পাহাড় যতদিন রবে
পাহাড়ের উপর বেয়ে চলা ঝর্ণা যতদিন থাকবে
তোমার মুক্তির আদর্শ পাহাড়ের বুকে ততদিন বেঁচে থাকবে,
শত শত অনুগামীকে পথ দেখাবে,
চিরদিন আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে,
তোমার নীতি-আদর্শ অজেয় ও অমর,
তুমি রবে নীরবে
পাহাড়ের প্রতিটি মানুষের অন্তরে।

অভিলাষ

জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু

আমরা জুম্ম জাতির নর-নারী।
আমরা মুক্তিকামী, শান্তিকামী,
আমরা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারকামী।
আত্ম চেতনায় সংগ্রামী হয়ে
মোরা লভিব মোদের জীবন।
পরাধীন জীবন করিব জয়
লভিব মোরা একান্ত সাধনার ধন।

জাগো, জাগোরে জুম্ম জাতি
আছো যত ভিন্ন ভাষা-ভাষি
ভাঙোরে ভাঙো মোদের ঘুম
দৃপ্ত জীবনে মুক্তি সাধনে জাগো।

হে যৌবন

সাল ত্রিপুরা

হে যুবক–
তোমরাই পারবে সূর্যদেবকে ডেকে নিয়ে এসে
এ পাহাড় আলোকিত করতে,
এ পাহাড় আবার আলোয় ভরে উঠবে;
বেজে উঠবে আবার পাহাড়ি সুর, সংকীর্তন
রূপবতী সবুজ বনানীর পথে প্রান্তরে।

হে যুবতী, তোমরাই পারবে–
ঝর্ণার পানি সেচে
কঠিন পাহাড়ে সোনার ফসল ফলাতে;
তোমরাই পারবে-
বনের হিংস্র বাঘ-ভল্লুক,
ভূমি খেকো, বন খেকোদের তাড়িয়ে
চিরহরিৎ সবুজ বনানী ফিরিয়ে দিতে।

তোমরাই পারবে-
আমার জীবন-যৌবন, আমার
চিরন্তন সবকিছুকে ফিরিয়ে দিয়ে
আমায় আগলে রাখতে,
যেমনি সব মা আগলে রাখে
তার প্রিয় সন্তানকে;

তোমরাই পারবে–
বেঁচে থাকার সংগ্রাম শেখাতে
বাঁশির সুরের মূর্ছনায়
ক্লান্তপাখির মুখে সুর এনে দিতে,
তোমরাই পারবে– হারানো সব সুরকে
এক করে সুরের মালা গেঁথে নিতে;
এ সুর আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে
আমার জন্মভূমি প্রকম্পিত হবে
সে সুরে পাহাড়ের সব প্রান্তর
সিক্ত হবে, স্নিগ্ধ হবে, হবে– সুশোভিত।

তব অপেক্ষায় পথ পানে হে যৌবন
এসো হে যৌবন এসো–
স্মরিবে, বন্দিবে তোমার পদচিহ্নে
গাইবে, রচিবে গান-কবিতা তোমাকে নিয়ে
পাহাড় ঝর্ণায়, শহরে বন্দরে
এসো হে যৌবন এসো।

তোদের স্বপ্ন, সাহস ও সংগ্রাম
প্রেম প্রীতি ভালবাসা
তোদের চিত্ত, দঢ় সংকল্প
নমি শত কোটিবার
কামনা করি সফলতা–
সংগ্রাম ও স্বপ্নের,
ধীর, স্থৈর্য, দীর্ঘ জীবনের
হে বীর, হে আমার প্রিয়তমা।

মোদের গর্ব মোদের আশা, হে নেতা!

দৈবারিক চাকমা

মোদের গর্ব মোদের আশা, মোদের প্রিয় নেতা
সংগ্রামে অবিচল বুকে মনোবল, নেই কোন ভীরুতা।
হে কাণ্ডারী, মহাবিপ্লবী, জুম্ম জাতির বন্ধু,
লড়াকু মনে, অদম্য সাহসে, পাড়ি দিচ্ছো অথৈ সিন্ধু।
ঘুমন্ত জাতির ভাঙিয়ে ঘুম, সৃষ্টি করেছো আলোড়ন,
শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনে, মোদের জেগেছে শিহরণ।
সহে ক্লেশ, বিঘ্ন বিনাশন, জুম্ম জাতির তরে,
আলো ভরবে মুক্তির পথে, অমানিশার তিমিরে।
বুক ফাটা বজ্রের নিনাদে খুঁজে যাচ্ছো মুক্তির পথ,
নত নাহি শির, সততা ও নীতির প্রশ্নে, চলেছো দিবারাত।
শাসকগোষ্ঠীর ফাঁদে, পড়োনি লোভে, নির্লোভে রয়েছো অটল,
সত্যিই তুমি বিপ্লবী নেতা, নীতি-আদর্শে অবিচল।
অকুতোভয়ে লড়েছো তুমি, সাথে লয়ে জুম্ম জাতি,
হাজারো বাধায়, অধিকার আদায়ে রেখে যাবে স্মৃতি।
অরিন্দম তুমি, জুম্ম জাতির মাঝে, থাকবে তোমার নাম,
সশ্রদ্ধাভরে লও হে দেবতা, জুম্ম জাতির প্রণাম।

হিল চাদিগাঙ : আমার জন্মভূমি

জড়িতা চাকমা

এই আমাদের জন্মভূমি, হিল চাদিগাঙ তার নাম,
মোদের গৌরব, মোদের আশা, মায়ের স্নেহ দান।
জুম্ম জাতি, আদিবাসী, কথা বলি নানান ভাষায়,
তোমার মতো মাকে মোরা, কোথায় খুঁজে পাই।

তোমার আলো, তোমার বাতাস, দেহে আছে মিশে,
আছে আরো সবুজ পাহাড়, নীল আকাশের নীচে।
এই পাহাড় আদিবাসীর, জুম্ম জাতি জনতার,
অনেক স্বপন দেখে তারা, এই পাহাড়কে বাঁচাবার।

সবুজ ঘেরা এই পাহাড়ে, হবে শান্তির জয়,
শান্তি হবে সদাজয়ী, মানবে নাকো পরাজয়।
প্রভাতকালে পূব আকাশে, যখন তাকাই তোর দিকে,
শ্যামল শোভা, উদার হৃদয়, মাগো দেখি চারদিকে।

আদিবাসী জুম্ম মোরা, ভিন্ন ভাষাভাষী,
বিনি সূতোয় গাঁথা মালা, যেন পাশাপাশি।
জুম্ম মোরা বাংলাদেশি, এই পাহাড়ে বাস,
সুখে-দুখে থাকা হেথায়, করে জুম চাষ।

পাহাড় দেশের জুম্ম মোরা, ভূমি মোদের প্রাণ,
বাঁচা-মরা, লড়তে হবে, রক্ষিতে নিজের মান।
মাগো, সোনালী দিনের স্বপ্ন দেখি, শুঁয়ে তোমার বুকে,
থাকবো মোরা জনমভরে, তোমার কোলে মাথা রেখে।

দেশ থেকেও দেশহীন, ভূমি থেকেও হয়ে ভূমিহীন,
দেশ ছেড়ে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে বয়ে যায় দিন।
দেশ ভাগ, আর কাপ্তাই বাঁধ, মোদের করেছে ভিন দেশি,
বঙ্কুল, গোমেতকূল, উত্তরকূল আর দেশকূল সবখানে মোরা আছি।

রাষ্ট্র সীমানা, কাঁটার বেড়া, পারেনি বিচ্ছেদ ঘটাতে,
রাধামন-ধনপুদি, চলাবাপ-চান্দবী রয়েছে, সব জুম্মর ঘরে ঘরে।
ভিন দেশি, এক ভাষায় বলি কথা, থাকি এপাড়-ওপাড়ে,
হিল চাদিগাঙ মোদেরই, বাঁচার স্বপন দেখি আজো এক সাথে।

আমাদের চাওয়াটা কি আসলেই বেশি কিছু?

ত্রিজিনাদ চাকমা

আমাদের চাওয়াটা বেশি কিছু নয়–
মানুষ হিসেবে বাঁচতে যতটুকু অধিকার শুধু ততটুকু চাই।

অন্যায় করাটা ভালো নয়,
কাউকে শোষণ করা
বঞ্চিত করা
নিপীড়ন করা
অবদমিত করে রাখা
মোটেই শুভ লক্ষণ নয়,
অপরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার মানসিকতা সভ্যতা নয়।

আমাদের চাওয়াটা আসলেই বেশি কিছু নয়–
আমরা শুধু মানবিক মর্যাদা চাই
আমরা শুধু সম্মানটুকু চাই
আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ চাই
আর, অন্য সকল জাতির মত মানবাধিকার চাই।

মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাওয়াটা কি বেশি কিছু চাওয়া?
ভিটেমাটি হারাতে না চাওয়াটা কি অন্যায়?
উচ্ছেদ হতে না চাওয়াটা কি অপরাধ?
আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চাওয়াটা কি আসলে গর্হিত কাজ?
মানবাধিকারের দাবি করাটাও কি পাপ?

সে যাই হোক–
এম এন লারমা কিন্তু নিজ ভিটেমাটিতে
স্বকীয়তা নিয়ে মানুষ হিসেবে বাঁচতে চেয়েছিলেন,
আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের গ্যারান্টি চেয়েছিলেন,
মানবিক মর্যাদা চেয়েছিলেন,
আমরাও ঠিক সেরকমটাই চাই।

এক খণ্ড বিকেল বেলায়

নিতীষ চাকমা

হয়তো,
কোন এক বেখেয়ালি সময়ে
সোনালী রোদ্দুরের ছোঁয়ায়
নীলাভ হ্রদের জলরাশির ঝিলিকের খেলায়
কড়া লিকারের লাল চায়ের উষ্ণতায়
বাঁশির মিহি সুরের মূর্ছনায়
গল্পে-গানে-কথার ছলে
হারিয়ে যায় দলে দলে।

আমি সে মঞ্চে তোমাদের মাঝে
কিছু পংক্তির কবিতা শোনাব।
যেন বেখেয়ালি অন্যমনা কবির বেশে।
এ এক বিরহের কবিতা'রে ভাই,
যে কবিতায় জুম্মদের অস্তিত্বের আর্তনাদ
মিশে যায় কর্ণফুলীর স্রোত ধারায়।
রক্ত আর জল মিলে একাকার
বুঝে নিও বন্ধুরা, এ কেমন যন্ত্রণার সমাহার!

তোমরা কি দেখেছ?
বোন হারানো ভাইয়ের রূঢ় স্বর
সন্তান হারানো বাবা-মার দীর্ঘশ্বাসে
ভেঙে পড়ে কৃষ্ণ গহ্বরের ঐ অম্বর!
বারুদের গন্ধে আমার নবাগত প্রজন্ম
নিত্য হা-হুতাশ করে,
বিকট আওয়াজের ঠেলায় ঘুম ভাঙে
ভয়-উৎকণ্ঠায় কান্নাকাটি দেয় জুড়ে।

হে প্রিয় মঞ্চ-
অরাজকতারে অরাজকতা...
মিথ্যার স্তূপে জমে যায় সব সভ্যতা।
কদাকার বর্ণে ভেসে উঠে
প্রিয় জুমভূমির রুগ্নতা।
তবে খুলে ফেল অহেতুক ভদ্রতা
জেগে উঠুক প্রতিরোধের ইস্পাত রূঢ়তা।

১০ নভেম্বর ভোর বেলায় তোমার সাথে দেখা হবে

এস জে চাকমা

১০ নভেম্বর ভোর বেলায় তোমার সাথে দেখা হবে
পাহাড়ি মেঠো পথ হেঁটে এম এন লারমার শহীদ বেদীতে এসো
আমিও থাকবো,
প্রভাত ফেরির রণ গর্জে, জঞ্জাল ত্যাগের বাসনায়
আরেকবার নাম নিবো গভীর শ্রদ্ধায়
এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ মহান বিপ্লবী নেতা এম এন লারমার।
ঘন কুয়াশায় যদি রাস্তা পিচ্ছিল হয় তবুও এসো
একখানা ফুল দিয়ে নিরবে দাঁড়িয়ে-
জুম ভূমির লাখো জনতার অনিশ্চিত জীবনের আর্তচিৎকারেও
বেঁচে থাকার ইচ্ছাগুলো মিতালি করবে
অবহেলিত জীবন আর প্রিয় পাহাড়ের সাথে।
১০ নভেম্বর ভোর বেলায় তোমার সাথে দেখা হবে
এম এন লারমার শহীদ বেদীতে
একখানা ফুল দিয়ে নিরবে দাঁড়িয়ে থেকো
শুনবে ফুলময় শহীদ বেদীর অশ্রুহীন কান্নার ধ্বনি
প্রতিধ্বনিত হয়, পাহাড়ে, জুম ঘরের প্রতি কোণায়।
ঘন কুয়াশায় যদি রাস্তা পিচ্ছিল হয় তবুও এসো
মহান নেতা এম এন লারমার একতার সমীকরণ জেনে নিবো
ক্ষমো হে, ভুলো হে- একটি আলোকিত ভোরের প্রত্যাশায়
জঞ্জাল ত্যাগের শপথে
জুম পাহাড়ের ভালবাসায়, এসো
আরেকবার নাম নিবো, মহান নেতা এম এন লারমার।

অনুভব

শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা

যেদিন থেকে তোমার প্রদর্শিত আদর্শের পথ ধরে চলা শুরু করেছি,
সেদিন থেকে অনুভব করে চলেছি তোমার পদচিহ্নের স্পর্শ।
অনুভব করে চলেছি তোমার রেখে যাওয়া স্বপ্ন
অনুভব করি তোমার রেখে যাওয়া বইয়ের ঘ্রাণ
অনুভব করি হারানো দিনের গানের সুরে
কিংবা কবিতার লাইনে।
অনুভব করি তোমার অস্তিত্ব পাহাড়ের প্রকৃতিতে,
চেঙে, মেয়োনী, কাজলং, শঙ্খ
মাতামুহুরী আর বড়গাঙের সাথে;
তুমি মিশে রবে পাহাড়ের গল্পে।

হে মহান নেতা,
তোমাকে হারিয়ে কেঁদেছিলো পাহাড়-প্রকৃতি,
পাহাড়ে বয়ে চলা নদী।
পাহাড় হারিয়েছে তার প্রিয় সন্তান,
জুম্মরা হারিয়েছে পথের দিশা
পাহাড়ে নেমেছিলো শোকের ছায়া।

পাহাড়ের হারানোর যন্ত্রণা এখনো শেষ হয়নি,
হারাতে বসেছি নিজের অস্তিত্ব,
হারাতে বসেছি নিজের পরিচয়।

অনুভব করি তুমি এখনো বেঁচে আছো আমাদের মাঝে,
হয়তো এক আদর্শবান নেতৃত্বের সাজে,
তুমি বেঁচে আছো পাহাড়ের মানুষের মননে।
আবার যখন পেছনে ফিরে তাকায়
অনুভব করি অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা, শোষণ, নির্যাতন
পাহাড়ের অসহায় জুম্মবীদের তীব্র ধর্ষণের যন্ত্রণা।

আবার যখন সামনে দিকে তাকিয়ে দেখি,
সারি সারি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতন কিছু নাম আমাকে অভিভূত করে,
সেখানে আমিও নিজেকে আবিষ্কার করি।
তীব্রভাবে অনুভব করি যখন অনাত্মীয় রাতের গরল প্রহর,
ডুবে যেতে থাকে পঞ্চমীর চাঁদ,
হাহাকার হয়ে উঠে চারদিকটা।
তখন অসহায় হয়ে নীরবে ফেলি দীর্ঘশ্বাস।

হঠাৎ ধ্যানমগ্নতা ভেঙ্গে দেখি
আমি কাপ্তাই হ্রদের কূলে, চারদিকটা অন্ধকার!
তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি রাতের সব তারকারাই ঝলমল করছে,
কিন্তু পাহাড়ে সুখের আলো ফিরতে এখনো অনেক দূরে।

বিশেষ প্রতিবেদন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর: সভায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির একতরফা অভিযোগ, উস্কানীমূলক বক্তব্য ও হুমকি; জনমনে সৃষ্টি হয়েছে চরম আতঙ্ক

গত ১৬ ও ১৭ অক্টোবর ২০১৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল বেশ ঘটা করে দুই দিনের এক সফরে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেন। এসময় খাগড়াছড়ির রামগড়ে এক সমাবেশে এবং রাঙ্গামাটি শহরে দেশের ও পার্বত্যাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুধী সমাজকে নিয়ে অন্তত দুইটি সভায় যোগদান করেন এবং গণমাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে 'তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিশেষ সভা' ও আলোচনা সভার ব্যানারে অনুষ্ঠিত দুইটি সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, সংঘাত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং যেকোন মূল্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং পাহাড়ে যারা চাঁদাবাজি ও রক্তপাত করছে তাদের জন্য ভয়ংকর দিন আসছে বলে তিনি হুমকি প্রদান করেন।

অপরদিকে এসব সভায় সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)-এর মহাপরিচালক ও পুলিশের মহাপরিদর্শক প্রমুখ কর্তাব্যক্তিরাও একতরফাভাবে সন্ত্রাস, হানাহানি ও চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে উস্কানীমূলক ও হুমকিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। মাটির তিন ফুটের গভীরে লুকিয়ে থাকলেও সন্ত্রাসীদের বের করে আনা হবে। দুই কোটি লোক বসবাসকারী ঢাকা শহরে এবং অন্য জেলা থেকে ঢাকা শহরে এক কোটি লোকের প্রতিনিয়ত যাতায়াত সত্ত্বেও যেখানে ঢাকা শহর থেকে সন্ত্রাসীদের অনায়াসে খুঁজে বের করা হয়, সেখানে ১৫/১৬ লক্ষ বসবাসকারী পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করা কোন ব্যাপারই নয় বলে হুমকি প্রদান করা হয়। এধরনের একতরফা অভিযোগ ও হুমকির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমনে চরম আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ধারাবাহিকভাবে চলমান ধরপাকড়, তথাকথিত ক্রসফায়ারে হত্যা, রাত-বিরাতে ঘরবাড়ি তল্লাসী ও জিনিসপত্র তছনছ, নির্বিচারে শারীরিক নির্যাতনের ফলে পার্বত্য জনজীবন আজ যেখানে শ্বাসরুদ্ধকর, সেখানে আবার 'সামনে ভয়ংকর দিনের' হুমকি জনমানুষকে চরম আতঙ্কগ্রস্ত ও নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে।

বলাবাহুল্য, রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত এসব সভা কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রক্রিয়াকে সরাসরি লঙ্ঘন করে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক প্রণীত পার্বত্য

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ অনুসারে সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়টি সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ অনুসারে আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং পুলিশ (স্থানীয়) বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন একটি কার্যাবলী। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একতরফাভাবে এসব সভা আয়োজন করা হয়। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে কেবল উক্ত সভাগুলোতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মাত্র। সভা আয়োজনের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর সাথে কোনরূপ আলোচনা করা হয়নি। তাই আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত এসব সভা পার্বত্য চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান আইনকে লঙ্ঘন করেই অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এসব সভায় একতরফা, মনগড়া ও ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এধরনের অশান্ত পরিস্থিতির পেছনে যে গভীর প্রেক্ষাপট ও ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র রয়েছে সে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়ে উস্কানীমূলক ও হুমকিমূলক বক্তব্য দেয়া হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'র যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সরকারের অব্যাহত টালবাহানা ও গড়িমসির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি দিন দিন যে অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ মদদ ও যোগসাজশে স্বার্থান্বেষী ও তাবেদার মহলকে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, সংঘাত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরণ চালানো হচ্ছে সে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে চেপে যাওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করা, চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করা, সর্বোপরি জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের হীনউদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি বাহিনী ও শাসক দলের একটি বিশেষ মহল যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরই ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সংগঠন গঠন ও মদদ দান, সংস্কারপন্থী নামধারী নব্য দালাল চক্রকে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সহায়তা প্রদান, আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) নামধারী বিদেশী সশস্ত্র গ্রুপকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি একের পর এক ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র চলছে। সরকার, সরকারি বাহিনী ও শাসকদলের বিশেষ মহলের এসব ষড়যন্ত্রের কারণেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, রক্তপাত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরণের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতির পশ্চাতে কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর এই সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধামাচাপা দিয়ে গোয়েবলসীয় কায়দায় খুন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির অভিযোগ চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে তোলা হচ্ছে এবং পরিস্থিতিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ১৬ অক্টোবর ২০১৯ সকালের দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন রামগড় উপজেলায় নবনির্মিত রামগড় থানা ভবন উদ্বোধন করেন এবং দুপুরে খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে রামগড় হাই স্কুল মাঠে সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিবাদবিরোধী সুধী সমাবেশে বক্তৃতা করেন। ঐ দিনই তিনি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শহরে আসেন এবং সন্ধ্যা ৬টা হতে রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উক্ত বিশেষ সভায় যোগদান করেন। এর পরদিন ১৭ অক্টোবর ২০১৯ সকাল ১১টার দিকে রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের

> এক্ষেত্রে আলোচনা সভায় চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ের বক্তব্যও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন যে, "আমার পূর্ণ আস্থা আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, তিনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত নেই। আমি মনে করি তাঁর (সন্তু লারমা) সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ যত বেশি হয়, তত বেশি ভালো। এতে সব না হলেও আমাদের কিছু না কিছু সমস্যা যেগুলো আছে সেগুলোর সমাধান হবে।"

উদ্যোগে একই বিষয়ে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন তিনি। এসমস্ত সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি, রাঙ্গামাটি আসনের সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদ বাসন্তী চাকমা, র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ সাফিনুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান, পুলিশের মহাপরিদর্শক মো. জাবেদ পাটোয়ারী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা বিভাগের সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিন, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মিসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব সুদত্ত চাকমাসহ সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের জেলা ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দসহ সুধী সমাজের কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

উক্ত সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'তিন পার্বত্য জেলায় হঠাৎ করে রক্তপাত শুরু হয়েছে। ...বেশ কিছু দিন ধরে তিন পার্বত্য জেলায় নির্বিচারে খুন ও চাঁদাবাজির কারণে পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠেছে। ভয়ংকর এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সেই ভয়ংকর পরিস্থিতি থামানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যেকোনো মূল্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব।' এছাড়া তিনি বলেন, 'যেসব স্থান থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে, সেসব স্থানে নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ বা বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে, প্রয়োজনে আরো হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বিজিবি, পুলিশকেও আমরা কেলিকপ্টার কিনে দেবো। সব জায়গায় আমরা রাস্তা এবং হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা সবকিছু আমরা করবো। যাতে করে এই জায়গায় আবার শান্তি ফিরে আসে।'

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান বিভিন্ন সংঘাত ও সহিংস ঘটনাবলীকে বিচ্ছিন্নভাবে ও একদেশদর্শীভাবে দেখলে এবং দেশের সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তির প্রশ্নে বাহ্যিকভাবে অবলোকন করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য সাধারণভাবে সন্ত্রাসবিরোধী বলেই প্রতীয়মান হতে পারে। অপরদিকে সবকিছু জেনেও কারা এই সন্ত্রাসী কাজ করছে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা না করায় তা বিভ্রান্তিমূলকও বটে। কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সেনাবাহিনীর একটি মহল সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে আসলেও, প্রকৃতপক্ষে তারাই আবার এই সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের লালনপালন, প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে আসছেন। বস্তুত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কায়েমী স্বার্থবাদী এই মহলটি একদিকে চুক্তি বিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, তেমনি জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণের লক্ষ্যে জুম্মদের মধ্যে 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি প্রয়োগ করে কখনো ইউপিডিএফ নামে, কখনো 'সংস্কারপন্থী', কখনো 'গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফ' সৃষ্টি করে তাদেরকে ভাড়াটে বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। এই চুক্তি বিরোধী মহলটি চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বা চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিভিন্ন মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত ও অভিযুক্ত করে সন্ত্রাসী সাজিয়ে জেলে পুড়ছে বা এলাকাছাড়া করে চলেছে অথবা গ্রেফতারকৃতদের সন্ত্রাসী বানিয়ে গুলি করে হত্যা করে ক্রশয়াফারে নিহত হয়েছে বলে প্রচার করছে। অপরদিকে ভাড়াটে বাহিনীকে দিয়ে চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজিসহ জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের অপহরণ ও খুন করে চলেছে। উল্লেখ্য যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সৃষ্টি করা হয় এবং কায়েমী স্বার্থবাদী মহলটিই এই চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে আশ্রয়, প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে থাকে। অপরদিকে একই গোষ্ঠী সেটেলারদের সংগঠন সমঅধিকার, বাঙালি গণ ও ছাত্র পরিষদকে দিয়ে জুম্ম বসতিতে একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়।

বলাবাহুল্য, সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করলেও চুক্তি বাস্তবায়ন না করার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আজ জটিল অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ফলে যারা সন্ত্রাসের জন্মদাতা তারাও আজ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে, অপরদিকে পার্বত্য সমস্যাকে সন্ত্রাসের সমস্যা হিসেবে দেখিয়ে পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও সেনাশাসন জোরদার ও জায়েজ করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চার্য ও পরিতাপের বিষয় যে, আজ সেই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও অস্ত্রধারীদের মদদদাতারাই গলার আওয়াজ বড় করে খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও অস্ত্রবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে!

প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পে বিজিবি, পুলিশ ও র‍্যাব মোতায়েন করা হবে এবং পাহাড়ে চাঁদাবাজদের জন্য ভয়ংকর দিন আসছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রচ্ছন্ন হুমকি প্রদান করেছেন। ইতিহাসে দেখা যায়, যারা স্বৈরাচারী ও ফ্যাসীবাদী তারা বরাবরই যে কোন অধিকারকামী আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হিসেবে অভিহিত করে জনমত বিভ্রান্ত ও সামরিক উপায়ে দমন-পীড়নকে জায়েজ করার অপচেষ্টা করে থাকে। বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই বা অন্য দেশের উদাহরণের দরকার নেই, কয়েক দশক পূর্বেও জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ সরকারও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো 'ভয়ংকর দিনের' ভয় দেখিয়ে জুম্ম জনগণকে হুমকি দিয়েছিল।

কিন্তু জুম্ম জনগণের ন্যায্য আন্দোলনকে নস্যাৎ করা যায়নি। ফলে সামরিক উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে জাতীয়ভাবে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে জেনারেল এরশাদ ও খালেদা জিয়া সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনা সরকার ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ সামরিক শাসন ও ফ্যাসীবাদী দমন-পীড়নের মধ্যে রয়েছে। জুম্ম জনগণ প্রায় পাঁচ দশক ধরেই শ্বাসরুদ্ধকর ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দিন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সরকারের স্মরণে রাখা উচিত, একটা জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা সামরিক দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে কখনোই সমাধান করা যায় না।

এমনকি কূটনীতিকদের সাথে আঞ্চলিক দলগুলোর বৈঠকের সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চরম সাম্প্রদায়িক ও জুম্ম-বিদ্বেষী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। তবে বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা ইতিবাচক দিক উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে, 'চুক্তি অনুযায়ী আমরা এখনও শান্তিচুক্তিকে সম্মান (অনার) করছি। আমরা চাই, এই শান্তিচুক্তিকে অনুসরণ করেই আমরা এই জায়গায় শান্তি নিয়ে আসবো।' তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চুক্তির কোন বিষয়গুলো অনুসরণ বা বাস্তবায়ন করে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন তা তিনি কোন দিক নির্দেশনা বা সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেননি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চুক্তি যদি অনুসরণ করে পার্বত্যাঞ্চলে প্রকৃত শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে, তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যায়–

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং এলক্ষ্যে আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- চুক্তি মোতারেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাধ্যমিক শিক্ষা, পর্যটন, উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যাবলী ও ক্ষমতা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে;
- 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসনসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে হবে;
- ভূমি কমিশনের বিধিমালাকে অচিরেই যথাযথভাবে প্রণয়ন করে এবং ভূমি কমিশনে পর্যাপ্ত তহবিল ও জনবল বরাদ্দ এবং রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে কমিশনের শাখা স্থাপন পূর্বক ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি ফেরত প্রদান করতে হবে;
- চুক্তি মোতাবেক ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের তাদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক যথাযথভাবে পুনর্বাসন করতে হবে;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ প্রদান করতে হবে;
- চুক্তি মোতাবেক জনমুখী ও প্রকৃতি-বান্ধব উন্নয়নের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে আঞ্চলিক পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসতে হবে এবং পার্বত্যবাসীকে নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করতে আত্মনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন ধারা গড়ে তুলতে হবে;
- পার্বত্য চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধি সংশোধন করতে হবে;
- অলিখিত চুক্তি মোতাবেক সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন প্রদান করতে হবে।

বলাবাহুল্য পার্বত্য চুক্তির উল্লেখিত বিষয়সমূহ যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে তবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি ঘটতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করবে।

সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যে 'ধৈর্যের একটা সীমা আছে' বলে হুমকি দিয়ে 'বাঘাইছড়িতে সরকারি দায়িত্ব পালন শেষে ফেরার পথে সরকারি লোককে গুলি করে হত্যা' ও 'রাজস্থলীতে একজন সেনা সদস্যকে হত্যার' যে দু'টি ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন সেই দু'টি ঘটনা সেনাবাহিনীরই মদদপুষ্ট সংস্কারপন্থী ও এএলপি সশস্ত্র সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর কারণে সংঘটিত হয়েছে তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এমনকি সম্প্রতি খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে সেনা সদস্য আহত হওয়ার ঘটনাটিও সেনা-সমর্থিত সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সদস্যদের কারণেই সংঘটিত হয়েছে। জিওসি মহোদয় অপারেশন উত্তরণের দোহাই দিয়ে যে চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতার কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি জানেন যে, পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৭(ক) ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, "সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা)

ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।"

উল্লেখ্য, জিওসি মহোদয় চুক্তির উক্ত বিধান অনুসারে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প স্থায়ী নিবাসে ফিরিয়ে নেয়া ও এলক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণের উদ্যোগ নেননি। বস্তুত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। বরঞ্চ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে চুক্তির বিধানাবলীকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে প্রত্যাহৃত ক্যাম্প পুনর্বহালের অঙ্গীকার করতে দেখা যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে 'অপারেশন উত্তরণ'-এর সাফাই গেয়েছেন। কিন্তু যেখানে চুক্তিতে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা রয়েছে সেখানে 'অপারেশন দাবানল'-এর স্থলে চুক্তি-উত্তর কালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামক এক প্রকার সেনাশাসন জারি করা চুক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে সাংঘর্ষিক। এই অপারেশন উত্তরণ-এর দোহাই দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, ভূমিসহ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে; গ্রামে গ্রামে তল্লাসী অভিযান, রাত-বিরাতে ঘরবাড়ি তল্লাসী ও জিনিসপত্র তছনছ, অবৈধ গ্রেফতার ও শারীরিক নির্যাতন করতে; সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে খুন-খারাবি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস চালাতে মদদ দিতে; সর্বোপরি জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে সেটেলারদের মদদ দিতে প্রতিনিয়ত প্রতীয়মান হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ২৪ আর্টিলারি ব্রিগেড ও গুইমারা রিজিয়নের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তোফায়েল আহমেদের মতো কর্তব্যরত উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদেরকে "শান্তিচুক্তির কিছু ধারা দেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক" বলেও চুক্তি বিরোধী মতামত ব্যক্ত করতে দেখা যায়।

উক্ত আলোচনা সভায় জিওসি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেছেন "চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর তারা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছেন, এটা দুঃখজনক। যারা চুক্তি করেছিল সেই জনসংহতি সমিতির তখন যে জনসমর্থন ছিলো তা এখন আর নেই। ...তখন সরকার যার সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তখন তার যে সমর্থন ছিল, আমাদের একটি জরিপ ও ক্যালকুলেশনে দেখেছি, বর্তমানে তিনি মাত্র ১০% মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন।...তাদের মাঝে দেশপ্রেম বলতে কিছুই নেই, তারা বরাবরই রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।" জিওসি মহোদয় আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে রাজনৈতিক নেতার মতো দেশপ্রেম মেপে দিচ্ছেন এবং জনগণের রায় নির্ধারণ করে 'মাত্র ১০%'-এর সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছেন যা হাস্যকর। উচ্চ পদস্থ একজন সামরিক কর্মকর্তা হয়ে চাকরিরত অবস্থায় কোন শিষ্টাচার নীতির আলোকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের মতো একজন প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার ব্যক্তির বিরুদ্ধে এধরনের কথা বলতে পারেন তা বোধগম্য নয়। তবে এ থেকে অনায়াসে বুঝা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী কতটা উদ্যত ও কর্তৃত্বপরায়ণ এবং নিজেদের চুক্তি বিরোধী ভূমিকাকে জায়েজ করতে কীভাবে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির জিগির তুলে ধরে পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্র করতে পারেন।

র‍্যাব মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ হুমকি দিয়ে বলেছেন, "এই অঞ্চলে ১৬ লাখ মানুষ বসবাস করে, আর ঢাকা শহরে বসবাস করে দুই কোটির ওপরে। প্রত্যহ আরও এক-দেড় কোটি মানুষ ঢাকা শহরে যাওয়া আসা করা সত্ত্বেও ঢাকা শহর থেকে অনায়াসে সন্ত্রাসী খুঁজে বের করা হয় সেখানে ১৫/১৬ লাখ বসবাসকারী পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী বের করা কোন ব্যাপারই নয়।" অপরদিকে স্বরাষ্ট্র সচিব কামাল উদ্দিন একই সুরে কথা বলে এই মর্মে হুমকি দিয়েছেন যে, "বাংলাদেশের মানুষ ১৭ কোটি, তার মধ্যে এই তিন জেলায় বসবাস করে ১৬ লাখ মানুষ, যা মোট জনসংখ্যার এক পার্সেন্টেরও কম। আমরা ১২ লাখ রোহিঙ্গা ম্যানেজ করতে পারছি, এখানে ম্যানেজ করাটা কোন ব্যাপার না।" যেহেতু সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির অভিযোগ কেবল জুম্ম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে, তাই র‍্যাব মহাপরিচালক ও স্বরাষ্ট্র সচিবের ইঙ্গিতটা এমন যে, ১৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে কয়েক লক্ষ পাহাড়ি লোককে 'ম্যানেজ' করা কোন ব্যাপারই নয়। তাঁদের এমনিতর জনমিতিগত পরিমাপক বক্তব্যে নিঃসন্দেহে জুম্ম জনগণকে স্মরণ করে দেয় সেই উগ্র জাতীয়তাবোধ ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ফ্যাসীবাদী নৃশংসতাকে।

র‍্যাব মহাপরিচালক আরো বলেছেন, "আমরা যদি জঙ্গি বিতাড়িত করতে পারি, জলদস্যু মুক্ত করতে পারি, মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সমস্ত লোককে মাটির তিনহাত নিচে থেকেও বের করে আনার ক্ষমতা রাখি।" আইজিপি ড. মোঃ জাবেদ পাটোয়ারীও একই ধঙে বলেছেন যে, "আমরা কিভাবে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ দমন করেছি, মাদকের ব্যাপারে কিভাবে জিরো টলারেন্স নীতিতে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং এই তিন পার্বত্য জেলার সমস্যা সমাধান করা আমাদের জন্য

কঠিন কিছু না।" তাঁদের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের চরম অজ্ঞতারই প্রকাশ পেয়েছে। যথাক্রমে দেশের এই এলিট বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের এমনিতর অজ্ঞতাই যদি থেকে থাকে, তাহলে দেশের সাধারণ মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সম্পর্কে কতটুকু সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান রাখেন তা বলাই বাহুল্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং সারাদেশের বিদ্যমান মাদক সমস্যা কিংবা ধর্মীয় জঙ্গীবাদ বা সুন্দরবনের জলদস্যু সমস্যার মতো সমস্যা নয়, সেই ন্যূনতম বোধটুকুও তাদের মধ্যে অনুপস্থিত তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক ও লজ্জাজনক। উক্ত আলোচনা সভায় খাগড়াছড়ি আসনের সাংসদ ও টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা যথার্থই বলেন, সমতলের সন্ত্রাসীদের কায়দায় আত্মসমর্পণ করার প্রক্রিয়া পাহাড়ে প্রযোজ্য হবে না। সমতলের প্রেক্ষাপট আর পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপট এক নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। তিনি আরও বলেন, পাহাড়ের আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটানো দরকার। তবে তা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে করা দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

"খাগড়াছড়ি আসনের সাংসদ ও টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা যথার্থই বলেন, সমতলের সন্ত্রাসীদের কায়দায় আত্মসমর্পণ করার প্রক্রিয়া পাহাড়ে প্রযোজ্য হবে না। সমতলের প্রেক্ষাপট আর পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপট এক নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। তিনি আরও বলেন, পাহাড়ের আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটানো দরকার। তবে তা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে করা দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।"

এক্ষেত্রে আলোচনা সভায় চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ের বক্তব্যও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন যে, "আমার পূর্ণ আস্থা আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, তিনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত নেই। আমি মনে করি তাঁর (সন্তু লারমা) সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ যত বেশি হয়, তত বেশি ভালো। এতে সব না হলেও আমাদের কিছু না কিছু সমস্যা যেগুলো আছে সেগুলোর সমাধান হবে।" তিনি আরো বলেছেন, "১৯৯৭ সালের আগের অবস্থায় যদি সমাধান হতে পারে, তাহলে এখানে দুইটি কিংবা চারটি আঞ্চলিক দলের সমস্যাও সমাধান হবে।" পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থাকে তুলে ধরে রাজা দেবাশীষ আরো বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে বিওপি ও বিজিবির ছাউনি স্থানান্তর, প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাঝে মধ্যে জটিলতা দেখা দেয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সমতলে প্রযোজ্য অধিগ্রহণ আইনটি এখানে প্রযোজ্য নয়। এখানে বিশেষ রেগুলেশন রয়েছে।"

আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিব নতুন সংজ্ঞা আরোপ করে বলেছেন যে, "এই তিন জেলায় যে সমস্যা তা কোন ধর্ম বা জাতিগত সমস্যা নয়, এটি শুধুমাত্র গোষ্ঠীগত স্বার্থের সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, সন্ত্রাসের সমস্যা। নৃ-তাত্ত্বিক মানুষের সাথে সাধারণ মানুষের কোন সমস্যা নেই।" বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। পার্বত্য সমস্যা যে একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা তা ১৯৮৫ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির আনুষ্ঠানিক বৈঠক চলাকালে সরকার পক্ষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির ঐতিহাসিক চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। ২০১৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনর্ব্যক্ত করেন যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা'। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই রাজনৈতিক সমস্যাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবের মতো দেশের আমলাতন্ত্রের একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহলের এধরনের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণেই আজ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া তথা পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য থেকে সহজেই প্রমাণিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীনউদ্দেশ্যে পুলিশ প্রধান ড. পাটোয়ারী বলেছেন যে, "পর্যটনের অপার সম্ভাবনা এই তিন জেলায় রয়েছে, কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতির কারণে এ শিল্পের বিকাশ ঘটছে না, এখানে যদি সব স্বাভাবিক থাকতো, তাহলে সারাদেশের মানুষ একনজর দেখার জন্য এখানে ভীড় জমাতো, শুধু তাই নয়, বিদেশী পর্যটকের প্রচুর আগমন ঘটতো। ...কতিপয় দুষ্কৃতিকারীকে আমরা প্রতিহত করে ছাড়বোই।" এই পর্যটন শিল্পের দোহাই দিয়ে হাজার হাজার একর জমি জবরদখলের কারণেই জুম্মদের শত শত পরিবার যে উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে বা উচ্ছেদের মুখে রয়েছে এবং তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে তা আইজিপি মহোদয়ের জানা থাকলেও স্বীকার করার কথা না। কারণ তাঁর মতো আমলা ও প্রভাবশালীরাই সবচেয়ে বেশি পার্বত্য জেলায় অবৈধভাবে জমি লীজ নিচ্ছে বা পর্যটন

কেন্দ্র স্থাপন করছে। আর তিনি বিদেশী পর্যটকের দোহাই দিচ্ছেন, অথচ তারাই বিদেশীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবেশে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে জুম্মদের সাথে বিদেশীদের কথা বলতে বাধানিষেধ আরোপ করেছেন।

আর পার্বত্য চুক্তিতে 'পর্যটন' বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন কার্যাবলী। কিন্তু এই পর্যটন বিষয়টি পরিচালনার জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদকে যথাযথভাবে এখতিয়ার দেয়া হয়নি। চুক্তিকে লঙ্ঘন করে পার্বত্য জেলা পরিষদকে সীমিত এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। অপরদিকে পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে তথা বিদ্যমান আইন লঙ্ঘন করে সেনাবাহিনী, বিজিবি, জেলা প্রশাসনসহ বহিরাগত প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিরা পর্যটন ব্যবসায় জেকে বসেছে এবং পর্যটন শিল্প সম্প্রসারণের নামে বনসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ, মাদকাসক্তি ও পতিতাবৃত্তি বিস্তার ইত্যাদি অপকর্ম সাধন করে চলেছে। আইজিপি সাহেব পার্বত্যাঞ্চলের এই অসহায় ও প্রতিনিয়ত বঞ্চনার আগুনে দগ্ধ পাহাড়ি জনগণের মর্মবেদনা অনুভব করতে পারবেন বলে মনে হয় না। তাই তাঁর মতো ক্ষমতাধর লোকেরা একতরফা ও একচোখাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হানাহানির বিরুদ্ধে কথা বললেও পর্যটনের দোহাই দিয়ে আদিবাসীদের উচ্ছেদ ও জমি হারানোর বিরুদ্ধে কখনোই টু শব্দটিও করবেন না তা বলাই বাহুল্য। অনুরূপভাবে র‍্যাব মহাপরিচালক যেভাবে প্রশ্ন রেখে বলেছেন, "এখানে একশ্রেণির লোক বিশ্ববিদ্যালয় করতে বাধা দেয়, মেডিকেল কলেজ করতে বাধা দেয়, তারা কারা?" তাঁর উদ্যত কথাবার্তা থেকে এটা সহজে বলা যায় যে, তাঁর এই প্রশ্নের যথাযথ ও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দেয়া হলেও তিনি সহজে বিষয়টা বুঝবেন এটা ভাবার কোন অবকাশ নেই। যে রাজনৈতিক দল ও যে দলের নেতৃত্বের অগ্রণী ও বলিষ্ঠ ভূমিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তার ঘটেছিল সেই দল বা নেতৃত্ব কেন বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ বিরোধিতা করছে তা বুঝতে হলে যে পরিমাণে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল মানসিকতার অধিকারী হতে হয় সেই রকম বড় মাপের উদারতা ও চিন্তা-চেতনা র‍্যাব মহাপরিচালকের মতো লোকদের থাকবে বলে মনে হয় না।

আইজিপি বলেছেন যে, "প্রথম দিন আমরা প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কথা শুনেছি, দ্বিতীয় দিন আমরা জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের কথা শুনলাম।" র‍্যাব মহাপরিচালক বলেছেন, "আমরা এসেছি সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় আকস্মিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে অবনতি লক্ষ করছি এটার কারণ জানতে।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গী প্রায় প্রত্যেকে একই সুরে কথা বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো যাদের কাছ থেকে তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা শুনেছেন তারা কারা? বলা অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য জেলায় যারা প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা রয়েছেন তারা বহিরাগত, সাম্প্রদায়িক ও পার্বত্য চুক্তি বিরোধী। সুতরাং সেইসব উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ে কী ধরনের মতামত আসবে তা বলাই বাহুল্য। জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনা সভায় চুক্তি বিরোধী ও ক্ষমতাসীন দলের লোক, যারা বক্তব্য দিয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন বাদে সবাই সুযোগসন্ধানী তাঁবেদার ব্যক্তি। তাদের কায়েমী স্বার্থ হাসিলের জন্য পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে তারা বিভ্রান্তিমূলক, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অভিমত তুলে ধরবেন তা না বলাই শ্রেয়। যেমন- আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা এবং খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের দুই চেয়ারম্যান যথাক্রমে কংজরী চৌধুরী ও বৃষকেতু চাকমা পার্বত্য চুক্তি ও চুক্তি মোতাবেক প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রণীত জাতীয় ভোটার তালিকা অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবি জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। পার্বত্য চুক্তির ফসল হিসেবে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং সেই পরিষদে আসীন হয়ে তারা আবার পার্বত্য চুক্তি পরিপন্থী মতামত প্রদান করছেন। চরম চুক্তি বিরোধী ও তাঁবেদারি দৃষ্টিভঙ্গি না হলে এধরনের আত্মঘাতী ও স্ববিরোধী মতামত কেউ তুলে ধরতে পারে না।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর আজ ২২ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার আজ দীর্ঘ ১১ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে এ যাবৎ এগিয়ে আসতে কোন দৃশ্যমান ও সদিচ্ছাপূর্ণ উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। চুক্তি করে চুক্তি বাস্তবায়ন করা হবে না, প্রতারণা করা হবে, জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্নকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, পক্ষান্তরে নিজেদের ব্যর্থতাকে ও প্রতারণামূলক ভূমিকাকে ধামাচাপা দিতে তথাকথিত খুন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে দমন-পীড়নের হুমকি দেয়া হবে- এটা কোন গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তির নীতিবোধ হতে পারে না। মোদ্দা কথা হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হলে, সামরিক উপায়ে দমন-পীড়নের পরিবর্তে চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হলে, তবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হবে। অন্যথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হতে বাধ্য এবং তার জন্য সরকার কখনোই দায়ভার এড়াতে পারে না।

বিশেষ প্রতিবেদন

তিন পার্বত্য আসনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: নজীরবিহীন কারচুপির মহোৎসব

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসনেও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের নজীরবিহীন কারচুপি, ভোটের আগের রাতে ব্যালট বাক্সে ব্যালট পেপার ভর্তি, কেন্দ্র দখল, প্রতিপক্ষ পোলিং এজেন্টদেরকে কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়া কিংবা ঢুকলেও পরে বের করে দেয়া, ভোট দেয়া হয়ে গেছে বলে ভোটারদের বাধা প্রদান, পরিচয়পত্র না থাকার কারণে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা ইত্যাদি অনিয়মের মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনের বাঘাইছড়ি উপজেলার ১৭টি ভোটকেন্দ্র, লংগদু উপজেলার ১৭টি কেন্দ্র, কাপ্তাই উপজেলার ৬টি কেন্দ্র, কাউখালী উপজেলার ১৩টি কেন্দ্র, নানিয়ারচর উপজেলার ২টি কেন্দ্র, বিলাইছড়ি উপজেলার ২টি কেন্দ্র এবং রাজস্থলী উপজেলার ১টি ভোটকেন্দ্রে সকাল ৮ টায় ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আওয়ামীলীগের কর্মীরা সিংহ মার্কায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ঊষাতন তালুকদার এবং ধানের শীষ মার্কায় বিএনপি প্রার্থী মণিস্বপন দেওয়ানের পোলিং এজেন্টদেরকে ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়নি। এ সময় প্রসাইডিং অফিসার, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কাছে অভিযোগ দিয়েও কোন সুরাহা পাওয়া যায়নি। ভোটগ্রহণ চলাকালে দুপুর ১২ টার দিকে এসব অনিয়ম ও কারচুপি বিষয়ে রাঙ্গামাটি জেলার রিটার্নিং অফিসার তথা জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ দিলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নির্বাচনের পরদিন ১লা জানুয়ারি ২০১৯ রাঙ্গামাটির রাজবাড়িস্থ সাবারাং রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী (সিংহ মার্কা) ঊষাতন তালুকদার কারচুপির নির্বাচন প্রত্যাখান করেন এবং পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান। সেই সাথে তিনি নির্বাচনকালীন আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান। ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল বাতিল করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে বলে তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের ব্যাপক কারচুপি, জাল ভোট প্রদান, কেন্দ্র দখল, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টদের উপর হামলা ও কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়া কিংবা ঢুকলেও পরে বের করে দেয়া, ভোট দেয়া হয়ে গেছে বলে ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা, পরিচয়পত্র না থাকার অজুহাতে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশে বাধাদানের মধ্য দিয়ে নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির নির্বাচন কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এতে রাঙ্গামাটি জেলাবাসীর সংবিধান-স্বীকৃত ভোটাধিকার তথা গণতান্ত্রিক

অধিকার জোর করে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এটা রাঙ্গামাটি জেলাবাসী কখনোই গ্রহণ করবে না।

উষাতন তালুকদার বলেন, আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা কাপ্তাই উপজেলার কাপ্তাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট প্রদানে বাধা দান করে। প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা রাজস্থলী উপজেলার বলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটার আইডি কার্ড ছাড়া ভোটদানে বাধা প্রদান করে। রাইখালী ইউনিয়নের রাইখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ওয়াগ্গা ইউনিয়নের বড়ইছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, চন্দ্রঘোনা কেপিএম উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট প্রদানে বাধা প্রদান করা হয়। রাইখালী ইউনিয়নের ভালুক্কাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা পাহাড়ি ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান ও কেন্দ্র থেকে এজেন্টদের বের করে দিয়ে জাল ভোট প্রদান করে। ফলে ভাঙ্গামুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৯১% ও খাগড়াছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৮৯% ভোট কাস্ট হয়েছে। গুলশাখালী, বগাচতর ও ভাসান্যাদাম ইউনিয়নের পাহাড়ি ভোটারদের উপর হামলায় ১০-১২ জন জুম্ম ভোটার মারাত্মক আহত হয়। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত প্রতুল চাকমা, বাধিধন চাকমা ও শুভলক্ষ চাকমাকে লংগদু সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

মারিশ্যাচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পাহাড়ি ভোটারদের উপর হামলায় ৪০-৫০ জন জুম্ম আহত অবস্থায় মারিশ্যাচর মুসলিম ব্লক কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আটকা পড়ে। অনেক জুম্ম পালিয়ে বন জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভাইবোনছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এজেন্টদের মারধর ও ভোট কেন্দ্র দখল করে নেয়। এতে দু'জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। মাইনীমুখ ইউনিয়নের হাজাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র ও আটারকছড়া ইউনিয়নের করল্যাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে তাতিন্দ্র লাল চাকমা-সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী ও আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা যৌথভাবে সকাল থেকে ভোট কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট প্রদান করে।

> স্বতন্ত্র প্রার্থী (সিংহ মার্কা) উষাতন তালুকদার কারচুপির নির্বাচন প্রত্যাখান করেন এবং পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান। সেই সাথে তিনি নির্বাচনকালীন আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান। ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল বাতিল করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে বলে তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

যুবলীগ সন্ত্রাসীরা বিদেশী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় আমার এজেন্টদের বের করে দিয়ে কেন্দ্র দখল করে ব্যাপক জাল ভোট প্রদান করে। যার অন্যতম উদাহরণ হলো বড়ইছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৯৩% ও নারানগিরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৯২% ভোট কাস্ট করা হয়। এত উচ্চ হারে ভোট কাস্ট হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার।

আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় লংগদু উপজেলার ভাসান্যা আদাম ইউনিয়নের চাইল্যাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র দখল ও উষাতন তালুকদারের এজেন্টদের বের করে দিয়ে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে জাল ভোট প্রদান করে। একই ইউনিয়নের খাগড়াছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে লাঠিসোটা নিয়ে তাতিন্দ্র ও সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী এবং আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের খেদারমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাবলাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উলুছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করে ও ভোট দেয়া হয়ে গেছে বলে ভোটারদের ফিরে যেতে বাধ্য করে এবং একপর্যায়ে তারা ব্যাপকভাবে জাল ভোট প্রদান করে। যার মধ্যে অন্যতম উদাহরণ হলো রূপালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৯৭% ও কিশলয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৯৫% ভোট কাস্ট করা। এ সময় বাঘাইছড়ি উপজেলায় আওয়ামীলীগ, তাতিন্দ্র ও সুদর্শন চাকমার নেতাত্বাধীন সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের হামলায় তুলাবান

গ্রামের রূপায়ন চাকমাসহ ৫ জন ভোটার মারাত্মক আহত হন এবং তুলাবান নবরত্ম বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ আর্যকীর্তি স্থবিরকে তাতিন্দ্র লাল চাকমা-সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা শারীরিকভাবে নির্যাতন চালিয়ে আহত করে। এ ঘটনার পরে ওই এলাকায় পাহাড়ি ও আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিজিবি সদস্যরা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কেবল পাহাড়ি ভোটারদেরকে এলাকা থেকে সরে যাওয়ার জন্য মাইকিং করে।

নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের বুড়িঘাট পুনর্বাসন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা প্রদান করে। নানিয়ারচর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে তাতিন্দ্র ও সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা ভোট কেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা করে। এছাড়া নানিয়ারচর পুনর্বাসন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বগাছড়ি পুনর্বাসন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা প্রদান ও ব্যাপকভাবে জাল ভোট দেয়া হয়।

কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের নিম্ন কচুখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জুম্ম ভোটারদের ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা ছিড়ে ফেলে। ঘাগড়া ইউনিয়নের আইডিয়াল কেজি স্কুল কেন্দ্রে আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা জুম্ম ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে পথে বাধা প্রদান ও কলমপতি ইউনিয়নের পোয়া পাড়া মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা কেন্দ্র দখল করে। ফটিকছড়ি ইউনিয়নের ডাবুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা ব্যাপকভাবে জাল ভোট প্রদান করে। কাউখালী উপজেলার অন্তত ১৩টি ভোট কেন্দ্র আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা দখল করে একচেটিয়া জাল ভোট প্রদান করে।

রাঙ্গামাটির সদর উপজেলার বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের কিচিং আদাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারদেরকে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পথে ইঞ্জিন চালিত বোটগুলো নিরাপত্তা বাহিনী ঘরে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার আসামবস্তী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা মার্কায় জাল ভোট দেওয়ার সময় সিংহ মার্কার পোলিং এজেন্টরা একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলে আওয়ামীলীগ নেতারা তাদের কর্মী দাবি করে পুলিশের কাছ থেকে আটককৃতকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের বড়নাছড়ি জোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, ভূষণছড়া ইউনিয়নের ভূষণছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছোট হরিণা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট প্রদানে বাধা ও ভোটারদের উপর হামলা চালায়। এসব কেন্দ্রগুলো দখল করে আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা ব্যাপকভাবে জাল ভোট প্রদান করে।

বিলাইছড়ি উপজেলা নির্বাচন পরিচলনা কমিটি আহ্বায়ক বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যাকে নিরাপত্তা বাহিনীর জনৈক হাবিলদার কর্তৃক আটকে রাখা হয়। ফারুয়া ইউনিয়নের গোয়াইছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের এজেন্ট শম্ভু লাল তঞ্চঙ্গ্যা ওরফে সতেজ তঞ্চঙ্গ্যাকে ফারুয়া ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। ফারুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা জুম্ম ভোটারদের ভোট প্রদানে বাধা প্রদান করে। ফারুয়া ইউনিয়নের তারাছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সিংহ মার্কার এজেন্ট মিলন তঞ্চঙ্গ্যাকে আনুমানিক দুপুর ১:০০ ঘটিকায় ফারুয়া সেনা ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। বিলাইছড়ি ইউনিয়নের বিলাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের স্থানীয় ইউপি মেম্বার জয়ন্তন তঞ্চঙ্গ্যাকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আটক করে। কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের কেংড়াছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিতে যাওয়ার সময় জনসংহতি সমিতি বিলাইছড়ি থানা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমাকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ধরে নিয়ে ১২:৩০ ঘটিকা থেকে বেলা ২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আটক করে রাখে। বিলাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের এজেন্ট প্রিয় রতন তঞ্চঙ্গ্যাকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা কেন্দ্র ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি প্রদান করে।

রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া ইউনিয়নের বাঙালহালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আনুমানিক সকাল ১০ ঘটিকায় বাঙালহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক ঞোউমং মারমার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা ভোট কেন্দ্র দখল ও ব্যাপকভাবে জাল ভোট প্রদান করে। এর আগে ১৪ ডিসেম্বর আওয়ামীলীগের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুছা মাতব্বরের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসীরা বাঙালহালিয়া বাজারে উষাতন তালুকদারের পূর্ব-নির্ধারিত ও রিটার্নিং অফিসার থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বাচনী পথসভার স্থান আগে ভাগে দখল করে রাখে ও পথসভায় বাধা প্রদান করে।

২৮ ডিসেম্বর আলিক্ষ্যং ক্যাম্পের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিলাইছড়ি উপজেলাধীন পাংখো পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক সমীর কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, উক্ত কেন্দ্রের পোলিং এজেন্ট মঞ্জু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও নির্ভয় তঞ্চঙ্গ্যাকে অবৈধভাবে আটক করে। নানাভাবে হয়রানির পর বিলাইছড়ি সেনা জোন থেকে পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। ঐদিন তক্তানালা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা

বিলাইছড়ি উপজেলার তক্তানালা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব রবিন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, নিলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও ভরত কুমার তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি ব্যাপকভাবে ভাংচুর ও তল্লাসী চালায়। ২৮ ডিসেম্বর পুলিশ কাউখালী উপজেলার কচুখালী গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে কাউখালী নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব সোহেল চৌধুরীকে এবং কাপ্তাই উপজেলার চিৎমরম বাজার থেকে পুলিশ ও গোয়েন্দা সদস্যরা প্রচারকর্মী বাচ্চু মারমাকে তুলে নিয়ে আসে এবং বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর উৎকোচের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

শুধু তাই নয়, আওয়ামীলীগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় তাতিন্দ্র ও সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা বাঘাইছড়ি উপজেলার অন্তত ৯টি ভোটকেন্দ্রের ভোটারদেরকে এবং লংগদু উপজেলার অন্তত ৪টি ভোটকেন্দ্রের ভোটারদেরকে মোবাইল নম্বর থেকে সিংহ মার্কায় ভোট না দেয়ার জন্য মৃত্যুর হুমকি দিয়ে স্থানীয় জনগণকে ফোন করে। এতে এলাকার জনমনে চরম ভীতি ও আতঙ্ক দেখা দেয়। ২৫ ডিসেম্বর রাতে সশস্ত্র সংস্কারপন্থীরা সুনীল চাকমা নামে বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড থেকে এক সমর্থককে প্রচারণার সময় অপহরণ করে। এ ধরনের হুমকি ও অপহরণ নির্বাচন আচরণবিধির সরাসরি লঙ্ঘন এবং সুষ্ঠু, ভয়ভীতি মুক্ত, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে হুমকি বিধায় এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারের নিকট অভিযোগ দিয়েও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আওয়ামীলীগ ও নিরাপত্তা বাহিনী অবৈধ অস্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও নির্বাচনে উষাতন তালুকদারের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তাতিন্দ্র ও সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নানাভাবে মদদ দিয়ে থাকে। এলক্ষ্যে আওয়ামীলীগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় ২১ ডিসেম্বর তাতিন্দ্র ও সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাঙালহালিয়া এলাকায় আনা হয়। এছাড়া সিংহ মার্কায় ভোটদানে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা দুরছড়ি ইউনিয়নের নলবন্যা ও বড় দুরছড়ি গ্রামের নিরীহ চারজন গ্রামবাসীর বাড়িসহ বিভিন্ন গ্রামের ঘরবাড়িতে ব্যাপক তল্লাসী চালায় ও জিনিসপত্র তছনছ করে। ফলে এলাকার পাহাড়ি ভোটারদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়।

অপরদিকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতাসীন প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানে এলাকাবাসীকে বাধ্য করার হীনলক্ষ্যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা, রোয়াংছড়ি ও রুমা উপজেলায় এবং রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলায় এএলপি সশস্ত্র দলকে নিয়ে আসে। তখন থেকেই এই এএলপি সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থী (সিংহ মার্কা) উষাতনের বিরুদ্ধে এবং রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর পক্ষে স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীদের কৌশলে মতামত দিতে থাকে। রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থক এবং সাধারণ লোকদেরকে খুন ও অপহরণের হুমকি এবং চাঁদা দাবি করতে থাকে।

বান্দরবান ও খাগড়াছড়িঃ ৩০০ পার্বত্য বান্দরবান আসনের লামা উপজেলায় ৪টি ভোটকেন্দ্র, আলিকদম উপজেলায় ২টি, সদর উপজেলায় ৪টি এবং থানছি ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ১টি করে ভোটকেন্দ্র দখল করে জাল ভোট প্রদান, বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের বের করে, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ বাধা ইত্যাদি ভোট ডাকাতি হয় বলে জানা যায়। অন্যদিকে ২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি আসনেও আওয়ামী লীগ ও সংস্কারপন্থীরা ভোটকেন্দ্র দখল করে জাল ভোট প্রদান, স্বতন্ত্র প্রার্থী নতুন কুমার চাকমা ও বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ বাধা ইত্যাদি অনিয়মের মধ্য দিয়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গেছে।

> ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তিত হওয়ার গুণ– এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

বিশেষ প্রতিবেদন

তিন পার্বত্য জেলায় ব্যাপক ভোট ডাকাতির মাধ্যমে ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটিতে ১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা

সারাদেশের সাথে ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ২য় পর্যায়ে ১৮ মার্চ ২০১৯ তিন পার্বত্য জেলাধীন ২৫টি উপজেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের যোগসাজশে ক্ষমতাসীন দলের ভোটের আগের রাতে কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবৈধভাবে ব্যালট বাক্সে ব্যাপক ব্যালট পেপার ভরতি, ভোট গ্রহণের সময় ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়াসহ ভোট কেন্দ্র দখল করে নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলাধীন ২৫টি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শাসকদলের নজীরবিহীন ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে ভোট চলাকালে কেবল রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি, নান্যাচর ও কাউখালীসহ বিভিন্ন উপজেলায় ১২ জন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (সাধারণ ও সংরক্ষিত মহিলা) প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানান। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (দোয়াত-কলম মার্কা) বড়ঋষি চাকমা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (প্রজাপতি মার্কা) সুমিতা চাকমা এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (বই মার্কা) সমীরণ চাকমা; কাউখালী উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান প্রার্থী অর্জুন মণি চাকমা ছিলেন অন্যতম। তারা ভোট গ্রহণের সময় সকাল ৯:৩০ ঘটিকার দিকে সহকারি রির্টানিং অফিসারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও রাঙ্গামাটি জেলার রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।

১৮ মার্চ বাঘাইছড়িতে আহুত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (দোয়াত-কলম মার্কা) বড়ঋষি চাকমা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (প্রজাপতি মার্কা) সুমিতা চাকমা এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (বই মার্কা) সমীরণ চাকমা ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ ও তাতিন্দ্র-সুদর্শন নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক ভোটের আগের রাতে অন্তত চারটি কেন্দ্রে অবৈধভাবে ব্যালট বাক্সে ব্যাপক ব্যালট পেপার ভরতি, ভোট গ্রহণের সময় ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়াসহ ভোট কেন্দ্র দখল করে নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। সেই সাথে অনতিবিলম্বে বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের ভোট গ্রহণ স্থগিত করে পুনর্নির্বাচনের জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য যে, ১৭ মার্চ দিবাগত রাতে রাতের আঁধারে উলুছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, খেদারমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, বাঘাইহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, করেঙ্গাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র– এই চারটি ভোট কেন্দ্রসহ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ ও সংস্কারপন্থীদের সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী সুদর্শন চাকমার সন্ত্রাসীরা ব্যালট বাক্সে ব্যাপক ব্যালট ভরে রাখে। ভোট গ্রহণের দিন সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হলে বাঘাইছড়ি পৌরসভার ৭টি কেন্দ্র, রূপাকারী ইউনিয়নের অন্তর্গত ৩টি কেন্দ্র, খেদারমারা ইউনিয়নের ৩টি কেন্দ্রসহ আরো কমপক্ষে ১৮টি ভোট কেন্দ্রে আওয়ামীলীগ ও তাতিন্দ্র-সুদর্শন নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসীরা ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়। ভোট কেন্দ্রে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও গণ্ডগোল হবে মর্মে অজুহাত দেখিয়ে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয় এবং ভোট না দিয়ে চলে যেতে ভোটারদের নির্দেশ প্রদান করে। কেন্দ্র দখল করে নজিরবিহীন ভোট ডাকাতির নির্বাচন বাতিল করা না হলেও বাঘাইছড়ি উপজেলায় যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশন ও সরকারই দায়ী থাকবে বলে তারা হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

রাঙ্গামাটি জেলার মতো খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়ও প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যোগসাজশে ক্ষমতাসীন দল ও সংস্কারপন্থীদের ভোট ডাকাতির কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের অনুকূলে সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নানাভাবে হয়রানি ও নাজেহাল করা হয়। তার

অন্যতম উদাহরণ হলো রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। ভোটের আগের দিন ১৭ মার্চ ২০১৯ সাল তারিখে সকাল ৯:০০ টায় উক্ত উপজেলায় জনসংহতি সমিতির তারাছা ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি উনুমং মারমাকে বেতছড়া সেনাক্যাম্পের কমাণ্ডার ক্যাম্পে ডেকে বসিয়ে রাখে। তাছাড়া ঘেরাউমুখ ভোটকেন্দ্রের কর্মী তারাছা ইউপির সাবেক ওয়ার্ড মেম্বার উবাসিং মারমা ও বড়শিলা পাড়ার রোয়াংছড়ি ইউপির বর্তমান মেম্বার প্রুসানু মারমাকে বেতছড়া ক্যাম্পে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারের বরাবরে অভিযোগ দাখিল করা হলে তাঁদেরকে দুপুর ২:০০টার দিকে ছেড়ে দেয়া হয়। নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ না হলে তাদেরকে বিশেষ অবস্থার মুখোমুখী হতে হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। এটি ক্ষমতাসীন দলের মূলত প্রতিদ্বন্দ্বী কর্মীদের কাজে বাধা দেয়া এবং এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর লক্ষ্যেই করা হয়েছে।।

ভোটের আগের রাতে আনুমানিক ৯:৩০ টায় দিকে উপজেলা নির্বাচন অফিস ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়কে সেনাবাহিনী ঘিরে রাখে। ইউএনও অফিসের কর্মচারীদের হতে জানা যায়, ইউএনও অফিসে সেনাসদস্যরা পৌঁছার পর কর্মচারীদের ইউএনও কক্ষে যেতে দেয়া হয় নাই। সেনাবাহিনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অগ্রিম ব্যালটে সিল মারার জন্য বাধ্য করে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাত ১০:০০টা দিকে বান্দরবান হতে যৌথবাহিনীর ৪টি গাড়ি চলে আসে। জানা যায়, রাত ১২টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য কাঞ্চনজয় তঞ্চঙ্গ্যা, রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউপির চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ তঞ্চঙ্গ্যা ও ছাত্রলীগ কর্মীরা ইউএনও অফিসে প্রবেশ করে। পুলিশসহ তাঁরা সিল মারার ব্যালটগুলো বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছিয়ে দেয়। তাছাড়া রাত ১২:০০টা দিকে বিজয় পাড়া হান্টুকরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার আবদুস সবুর ও পুলিশ মিলে ব্যালটে অগ্রিম সিল দেয়া দেখে কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত ভিডিপি থোয়াইউমং মারমা আনারস প্রতীকের প্রার্থীকে ফোনে খবর দেয়। রাতে সহকারি রিটার্নিং অফিসার ও নির্বাচন কর্মকর্তাকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁরা ফোন ধরেননি।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্যাঞ্চল এখন সাজানো মামলা, জামিনপ্রাপ্তদের পুনঃগ্রেফতার, বিচার-বহির্ভূত হত্যার গারদখানা

সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের যোগসাজশে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব, সংস্কারপন্থী খ্যাত সেনা-সমর্থিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী এবং সেটেলার ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে একের পর এক সাজানো মামলা দায়ের, নির্বিচার গ্রেফতার, একটা মামলায় জামিন হলে সাথে সাথে আরেকটি সাজানো মামলায় জেল গেইট থেকে গ্রেফতার বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', 'অস্ত্রধারী' সাজিয়ে অবৈধ গ্রেফতার ও জেলে প্রেরণ, জোরপূর্বক গুম, তথাকথিত 'ক্রসফায়ার'-এর নামে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন, সন্ত্রাসী খোঁজার নামে রাত-বিরাতে ঘরবাড়ি তল্লাসী ইত্যাদি অব্যাহত গতিতে চলছে।

কেবল ২০১৯ সালের জানুয়ারি হতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক ক্রশফায়ারের নামে ৫ জনকে বিচার-বহির্ভূত হত্যা; ৪ জনকে জোরপূর্বক তুলে নেয়া, যাদের মধ্যে দুইজন এখনো নিখোঁজ; ৮৪ জনকে অবৈধভাবে গ্রেফতার, যাদের মধ্যে উচ্চ আদালতের জামিনে বের হওয়ার সময় জেল গেইট থেকে অন্য সাজানো মামলায় অন্তত ১০ জনকে পুনঃগ্রেফতার; ১৭টি সাজানো মামলায় ২৭৮ জনকে মিথ্যাভাবে জড়িতকরণ; ২২টি ঘরবাড়ি তল্লাসী ও ৭ জনকে আটক করে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া বিজিবি সদস্য কর্তৃক একজন জুম্ম কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টাসহ অন্তত ৬ জন জুম্ম নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছে, যাদের মধ্যে দুইজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। উৎপাদিত কৃষিপণ্য রাঙ্গামাটি শহরে নেয়ার পথে জুরাছড়ি ও বরকলের সুবলঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্মদের মালবাহী দেশীয় বোটগুলো আটক করা হয় এবং এসময় সংস্কারপন্থী খ্যাত সেনা-সমর্থিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে অবাধে চাঁদা আদায় করতে সুযোগ করে দেয়া হয়। অপরদিকে পার্বত্য চুক্তিকে লঙ্ঘন করে ২০১৯ সালে বাঘাইছড়ি ও জুরাছড়িতে তিনটি নতুন ক্যাম্প করা হয়েছে, যার মধ্যে

বাঘাইছড়ির সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের শিজকদোরে বৌদ্ধ বিহারের জায়গায় একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করা, আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে দুর্বল করা, সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্র অবাধে বাস্তবায়নের হীনলক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী একদিকে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে সংস্কারপন্থী খ্যাত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে, অন্যদিকে বান্দরবানের সদর উপজেলা, রুমা ও রোয়াইছড়ি উপজেলায় ও রাঙ্গামাটির রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলায় 'আরাকান লিবারেশন পার্টি' (এএলপি) নামক প্রতিবেশী মিয়ানমারের সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। সেনা-সমর্থিত এসব সংস্কারপন্থী ও এএলপি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অবাধে মারপিট, হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে গেলেও নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে পক্ষান্তরে এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো দ্বারা সংঘটিত ঘটনায় জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থক এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সোচ্চার ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, ঘরবাড়ি তল্লাসী, মারপিট ইত্যাদি চালানো হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান থাকলেও এখনো চার শতাধিক ক্যাম্প পার্বত্যাঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে। পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে একপ্রকার সেনাশাসন কায়েমের ফলে সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার, ভূমি ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে উপনিবেশিক কায়দায় হস্তক্ষেপ করে চলেছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রেখে নিজেদের হীন কায়েমী স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র সংগঠনসমূহের পরস্পরের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত, চাঁদাবাজি, হত্যা, অপহরণ ইত্যাদি ঘটনা অবাধে চালিয়ে যেতে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। আর এসব ঘটনাবলী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি ও সশস্ত্র কার্যক্রম' হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্যাপক অপপ্রচারণা ও তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একদিকে ভাড়াটে ভূঁইফোড় সাংবাদিক দিয়ে প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অপরদিকে প্রশাসন ও সরকারি বাহিনীর ফ্যাসীবাদী দমন-পীড়ন ও মানবতা বিরোধী নিপীড়ন-নির্যাতনের খবর প্রচার ও প্রকাশের বিরুদ্ধে গণমাধ্যম কর্মীদের উপর কড়া হুমকি ও নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা হয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণসহ অসহায় পার্বত্যবাসী প্রশাসন ও সরকারি বাহিনীর অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাসে অবরুদ্ধ হয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় পার্বত্যাঞ্চল এখন অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাস, সাজানো মামলা, জামিনপ্রাপ্তদের পুনঃগ্রেফতার, বিচার-বহির্ভূত হত্যার এক বৃহত্তর গারদখানায় পরিণত হয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার যে কোন ষড়যন্ত্র এবং জুম্ম জনগণের এই চুক্তি বাস্তবায়নের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের যে কোন চক্রান্ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্ম জনগণের পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তাদের আর পেছনে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে।

> দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

বরকলের ভূষণছড়ায় বিজিবি সদস্য কর্তৃক এক চাকমা কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বরকল উপজেলাধীন ভূষণছড়া ইউনিয়নের তাগলকবাগ বিজিবি ক্যাম্পের সদস্য মোঃ আলমগীর তাগলকবাগ গ্রামের ১৭ বছর বয়সী এক চাকমা কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। জানা যায়, মেয়েটি বাড়ির অনতিদূরে পাশের এক ঝর্ণায় পানি আনতে গেলে ঐ বিজিবি সদস্য হঠাৎ করে পেছন থেকে মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। তবে মেয়েটি চিৎকার দিয়ে কোনমতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপরই ঘটনাটি জানাজানি হতে থাকলে, ক্যাম্প কমান্ডার মোঃ হাবিব দ্রুত গ্রামে আসেন এবং ঐ মেয়েটিকে ও কৃষ্ণবরণ চাকমাসহ তার পরিবারকে ব্যাপারটি প্রকাশ না করার জন্য নির্দেশ দেন।

লক্ষ্মীছড়িতে একজন চাকমা নারী খুন

গত ২ মে ২০১৯ খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলাধীন বক্কাছড়া গ্রামের নাগরি চাকমা নামে ৩০ বছরের একজন জুম্ম নারীকে হত্যা করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, প্রতিদিনের মতো সেদিনও বিকালে নাগরি চাকমা মজুরীর বিনিময়ে গরুর জন্য ঘাস আনতে যান। কিন্তু বাড়িতে ফিরে না আসায় তার স্বামী মুরল্যা চাকমা গ্রামবাসীদের নিয়ে রাত অবধি খুঁজেও নাগরি চাকমার কোথাও হদিশ পাননি। তার পরদিন ৩ মে আশেপাশের জঙ্গলে নাগরী চাকমার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। আরো জানা যায় যে, জঙ্গলের পাশে জায়গা দখল করে মো: আনিসের মালিকানাধীন একটি কোম্পানী আলুর চাষ করে। নাগরি চাকমার গরুগুলো আলুর ক্ষেত নষ্ট করে দিতো বলে নাগরি চাকমার বিরুদ্ধে উক্ত মো: আনিস প্রায়ই অভিযোগ করতো। উক্ত মো: আনিসই নাগরিকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে বলে স্থানীয়দের সন্দেহ। নাগরি চাকমার শরীরের বিভিন্ন অংশে জখমের চিহ্ন দেখা যায়। মুরল্যা চাকমা লক্ষ্মীছড়ি থানায় অজ্ঞাতনামার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন বলে জানা যায়।

নাইক্ষ্যংছড়িতে একজন আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ১৪ আগস্ট ২০১৯ রাত আনুমানিক ৮:৩০ ঘটিকার সময় বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন দোছড়ি ইউনিয়নের পাইনছড়ি উক্যজাই হেডম্যান পাড়ার এক আদিবাসী গৃহবধূকে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে একই এলাকার স্থানীয় প্রতিবেশী মো: লোকমান হাকিম (৩৩) পীং-মৃত আব্দুল নবী ধর্ষণের চেষ্টা করে। গৃহবধু ও পাড়াবাসী সূত্রে জানা যায় যে, এলাকায় বখাটে হিসেবে পরিচিত লোকমান হাকিম গৃহবধুর বাড়িতে রাত আনুমানিক ৮:৩০টার সময় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে মশারির ভিতরে ঢুকে গৃহবধূকে জড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এই সময় গৃহবধু চিৎকার করলে পাড়ার আশেপাশের লোকজন এসে বখাটে মো: লোকমান হাকিমকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ভুক্তভোগী গৃহবধু স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানা যায়।

বান্দরবানে বেড়াতে এসে এক আদিবাসী ত্রিপুরা কিশোরী অপহরণের শিকার

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিকেলের দিকে চট্টগ্রাম জেলার জোরারগঞ্জ থানার বরেন্দ্র ত্রিপুরার স্কুল পড়ুয়া এক কিশোরী মেয়ে (১৫) বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদরে তার বড় বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে সেখান থেকে নুর হোসেন নিশাদ (১৮) পীং-জাকের হোসেন নামে এক বহিরাগত বাঙালি তরুণ কর্তৃক অপহরণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপহরণের সময় নুর হোসেন নিশাদের কয়েকজন সহযোগীও ছিল বলে জানা যায়। নুর হোসেন নিশাদের বাড়ি নোয়াখালী জেলার কবিরহাট পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড এলাকায় বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় অপহৃতার ভাই বাদী হয়ে কোম্পানীগঞ্জ থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন বলে জানা যায়। এদিকে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ভোর বেলায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে স্থানীয় জনতা অপহৃতাকে উদ্ধার ও অপহরণকারী নুর হোসেন নিশাদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

খাগড়াছড়িতে তিন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক একজন ত্রিপুরা নারীকে ধর্ষণের পর খুন

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের ৩ মাইল এলাকা থেকে প্রীতি রাণী ত্রিপুরা নামে ২৮ বছরের এক জুম্ম নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে প্রীতি রাণী ত্রিপুরা খাগড়াছড়ির চম্পাঘাট থেকে নিখোঁজ হন। পরে জানা যায় যে, পানছড়ি উপজেলার কলোনীপাড়ার বাহার মিয়ার ছেলে আসাদুল ইসলাম রাসেল

(২২), সাঁওতাল পাড়ার তারা মিয়ার ছেলে আল আমীন (১৯) এবং দমদম এলাকার মৃত আবদুল বারেকের ছেলে কামাল হোসেন (২৩) নামে তিনজন সেটেলার বাঙালি প্রীতি রাণী ত্রিপুরাকে অপহরণ করে। পরে অপহরণকারীরা প্রীতি রাণীকে ধর্ষণের পর হত্যা করে বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে।

ঢাকায় এক আদিবাসী নারী গৃহকর্মীকে ধর্ষণ

গত ৭ অক্টোবর ২০১৯ রাজধানী ঢাকার হাতিরঝিল থানাধীন মগবাজার এলাকায় ১৮ বছরের আদিবাসী এক গৃহকর্মীকে গৃহকর্তা কর্তৃক ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ধর্ষিত গৃহকর্মী গৃহকর্তা লুৎফর রহমান জং (৪০)-এর বিরুদ্ধে হাতিরঝিল থানায় এক ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। তিনমাস ধরে গৃহকর্তা তাকে ধর্ষণ করে আসছে বলে গৃহকর্মী অভিযোগ করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অভিযুক্ত গৃহকর্তা লুৎফর রহমান জং পলাতক রয়েছে। আদিবাসী গৃহকর্মীর বাড়ি বান্দরবান জেলায় বলে জানা গেছে।

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালিদের হামলা, একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ২ জন আহত

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ দুপুর ২:০০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার ক্যায়াংঘাট ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের রাঙাপানি এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের একটি বাড়িতে অগ্নিসংযাগ ও তবলছড়ি গ্রামে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জানা যায়, ঘটনার সময়ে সাতগুড়িয়া সেটেলার গুচ্ছগ্রাম হতে ১০/১২ জন সেটেলার বাঙালি জুম্মদের ভূমি দখল করতে গেলে জুম্মরা বাধা দেয়। পরে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দু'জন জুম্ম আহত হয়। আহতদের মধ্যে একজন হলেন জীব লাল চাকমা (৪০), পিতা: অশ্বিনী কুমার চাকমা, গ্রাম: তবলছড়ি। সেটেলার বাঙালিদের হামলায় তার বাম হাত ভেঙ্গে যায়। আরেকজন হলেন সম্প্রতি চাকমা (৩৫), পিতা: সুকৃতি চাকমা, গ্রাম: তবলছড়ি। সেটেলার বাঙালিদের হামলায় তার মাথা ফেটে যায়। অপরদিকে সেটেলার বাঙালিরা রাঙাপানি গ্রামের চন্দ্র মোহন চাকমার ছেলে রতন মনি চাকমার (৪০) বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে।

থানচিতে বিজিবি কর্তৃক উচ্ছেদের মুখে ৫৪ জুম্ম পরিবার

গত ২৯ জুলাই ২০১৯ সকাল আনুমানিক ৯:০০ টায় বিজিবি'র বান্দরবান জোনের সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন থানচি উপজেলার থানচি সদর ইউনিয়নের আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত জিনি অং পাড়ার প্রায় ১০০ একর ভূমিতে জোরপূর্বক একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপনের চেষ্টা চালায়। এতে অন্তত ৫৪ পরিবারের বসবাস রয়েছে এবং প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন হলে তারা উচ্ছেদ হবে বলে জানা গেছে। তবে ঐদিন ঐ এলাকার আদিবাসী জুম্মরা বিজিবি কর্তৃক অবৈধভাবে তাদের ভূমি বেদখলের চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। এতে সেক্টর কমান্ডার জুম্মদের উপর চটে গিয়ে হুমকিমূলক কথা বলেন বলে জানা যায়।

লামায় তিনটি কোম্পানী কর্তৃক ২০ ম্রো পরিবারের ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদের সম্মুখীন

গত ১ আগস্ট ২০১৯ তিন প্রাইভেট কোম্পানী যথাক্রমে মেরিডিয়ান কোম্পানী, লামা রাবার লিমিটেড ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক জোরপূর্বক বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন লামা উপজেলার নতুন পাড়া গ্রামের ২০ আদিবাসী ম্রো পরিবারের চাষযোগ্য জমি ও বাগান বেদখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, মেরিডিয়ান কোম্পানী ও লামা রাবার লিমিটেড-এর লোকজন গত ৩০ ও ৩১ জুলাই ২০১৯ উক্ত আদিবাসী ম্রোদের ভূমি নিজেদের দাবি করে ঐ ভূমিতে জঙ্গল কাটতে শুরু করে। আদিবাসী ম্রোরা এসময় বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে কোম্পানীর লোকজন মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করার হুমকি প্রদান করে। তবে ম্রোদের বাধার মুখে কোম্পানীর লোকজন ঐদিন ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এরপর ঐদিন আদিবাসীরা লীজ বাতিল করা, ভূমি বেদখল বন্ধ করা ও উক্ত লীজকৃত জমি সরকারের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের বরাবরে একটি স্মারকলিপি দাখিল করে। উল্লেখ্য যে, আদিবাসীরা ঐ ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত আইন অনুসারে বহু বছর থেকে চাষাবাদ করে আসছে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর লোকজন গত ১ আগস্ট ২০১৯ প্রায় শ'খানেক ভাড়াটে লোকের সহায়তায় আদিবাসী ম্রোদের ভূমি বেদখল করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, আদিবাসী ম্রোদের জীবিকার একমাত্র উৎস হচ্ছে এইসব ভূমি।

অপরদিকে আরো জানা যায়, মেরিডিয়ান কোম্পানী বহু বছর ধরে ম্রো আদিবাসীদের উচ্ছেদের চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

কোম্পানীর লোকজন পূর্বেও আদিবাসীদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি প্রদান করে। আদিবাসীদের অভিযোগ, এই হিংসাত্মক কাজের পেছনে প্রশাসনের ভূমিকা রয়েছে। সে কারণে আদিবাসীদের অভিযোগ দাখিলের পরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, লীজের নামে মেরিডিয়ান কোম্পানী ৩,০০০ একর, লামা রাবার লিমিটেড ১,৬০০ একর ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ৩,০০০ একরের অধিক ভূমি দখল করেছে বলে জানা গেছে। এভাবে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, ভূমি বেদখল, ভূমি ও সম্পদ ধ্বংস করার ফলে স্থানীয় ম্রো আদিবাসীদের জীবন জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রশাসন, সেনা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

সেটেলার বাঙালিদের সহায়তার জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি বিরোধী নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের গোয়েন্দা পরিদপ্তর হতে ইস্যুকৃত সার্কুলেশনের সূত্র ধরে ১লা নভেম্বর ২০১৮ "সাধারণ বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং বাঙালি আঞ্চলিক দলসমূহের প্রতি নিরাপত্তা বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের বর্তমান মনোভাব এবং সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব প্রসঙ্গে" শীর্ষক এক সাম্প্রদায়িক ও পার্বত্য চুক্তি পরিপন্থী নির্দেশনা জারি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

উক্ত স্মারকে বলা হয় যে, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের গোয়েন্দা পরিদপ্তর হতে সাধারণ বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং বাঙালি আঞ্চলিক দলসমূহের প্রতি নিরাপত্তা বাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের বর্তমান মনোভাব এবং সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিষয়ে করণীয় আদেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশে সুপারিশ করা হয় যে, (ক) নিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রশাসন কর্তৃক বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক আচরণ এবং হেয় প্রতিপন্ন না করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে; (খ) বাঙালি সংগঠন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন ও বাঙালিদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; (গ) সোনামিয়া টিলাসহ বাঙালিদের বেদখল হয়ে যাওয়া ভূমি উদ্ধারে পূর্ণ প্রশাসনিক ও আইনী সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং (ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সমতলে বাঙালিদের সম্ভাব্য স্থানান্তর রোধকল্পে তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার পাশাপাশি এদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও, স্থানীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে কার্যকরী ভূমিকা পালনে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

উক্ত সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী সার্কুলেশন জারির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক একজন মারমা ছাত্রকে গুলি করে হত্যা

গত ১২ নভেম্বর ২০১৮ বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলাধীন ১নং রোয়াংছড়ি ইউনিয়নের ঘেরাউ পাড়ায় রাত ৮:০০ টার দিকে দোকানে আসার সময় হ্লানুমং মারমার পুত্র ক্যাসিংমং মারমা (১৪) নামের রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক ছাত্র রোয়াংছড়ি সেনাক্যাম্পের লেফটেনেন্ট ফারহান এর নেতৃত্বাধীন সেনাদের গুলিতে গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায় বলে জানা যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ছেলেটি তার আরও দুই ছাত্রসঙ্গীসহ পাড়া থেকে বৌদ্ধ বিহার হয়ে ঘেরাউ রাস্তার পাশের দোকানে যায়। বৌদ্ধ বিহার থেকে দোকানে যাওয়ার সময় বিহারের সীমানা বেড়ার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রোয়াংছড়ি থেকে ঘেরাউ ভিতর পাড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সেনাসদস্যরা কোন উস্কানী ছাড়া তাদের লক্ষ্য করে গুলি করে। এতে ছেলেটির বামবাহু ভেদ করে গুলি বের হয়ে যায় এবং তার ছাত্রসঙ্গীরা ভয়ে পালিয়ে যায়। পরে সেনাসদস্যরা আহত ছাত্রকে গাড়িতে নিয়ে এসে রোয়াংছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর বান্দরবান জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যায়। মারাত্মক আহত হওয়ায় চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে রাত ১১:৪০ টার দিকে মারা যায়। লেফটেনেন্ট ফারহান-এর নেতৃত্বাধীন সেনা সদস্যরা ঘেরাউ পাড়ায় ছাত্রকে গুলি করে আহত করার সময় দোকানে অবস্থানকারী এলাকার অনেকজন ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করেছে।

বাঘাইছড়ির বঙ্গলতলীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক দোকানদারকে ব্যাপক মারধর

গত ১৮ নভেম্বর ২০১৮ বাঘাইছড়ির বঙ্গলতলী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে নোয়াপাড়া নামক স্থানে বঙ্গলতলী ক্যাম্পের সেনাবাহিনী তল্লাসী অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা

এক দোকানদারকে ব্যাপক মারধর করে। অপরদিকে ২৩ নভেম্বর ২০১৮ রাতব্যাপী ঘিলাছড়ি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা নান্যাচরের ঘিলাছড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। আতঙ্কে এলাকা থেকে পুরুষরা সবাই নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যায়।

রাঙ্গামাটির মগবানে সেনাবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র গুজে দিয়ে যুব সমিতির সভাপতিকে আটক

গত ১৯ নভেম্বর ২০১৮ দিবাগত রাত আনুমানিক ২:০০ টার দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের কাপ্তাই হ্রদ ঘেরা নতুন বাজার এলাকা হতে পার্শ্ববর্তী কাপ্তাই থেকে আগত সেনাবাহিনীর একদল সদস্য অস্ত্র গুজে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির মগবান ইউনিয়নের সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা ওরফে শ্যামলকে (৩১) আটক করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, ঐদিন রাত উজ্জ্বল চাকমা নতুন বাজারস্থ নিজস্ব দোকানে তার স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। রাত আনুমানিক ২:০০ টার দিকে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য তাদেরকে ঘুম থেকে জেগে তুলে এবং বাড়ির বাইরে আসতে বলে। উজ্জ্বল চাকমা ও তার পরিবার বাড়ির বাইরে আসলে সেনাসদস্যরা বাড়িতে প্রবেশ করে তল্লাশী চালায়। বাড়িতে তল্লাশী চালানোর পর সেনাসদস্যরা রান্নাঘরের দরজা খুলে বাড়ির বাইরে গিয়ে ল্যাট্রিনে যায়। এরপর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ল্যাট্রিনের চাল হতে একটি দেশীয় বন্দুক পেয়েছে বলে দাবি করে তারা এবং ঐ দেশীয় বন্দুকসহ উজ্জ্বল চাকমাকে মোবাইল ক্যামেরায় ছবিও তোলে। আর তাতেই সেনাসদস্যরা উজ্জ্বল চাকমাকে আটক করে স্পীড বোটে করে কাপ্তাইয়ের দিকে নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা দেয়া হয় এবং জেলে প্রেরণ করা হয়।

খাগড়াছড়িতে পুলিশ কর্তৃক দুইজনকে গ্রেফতার

২৮ নভেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নতুন কুমার চাকমার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে পুলিশ অমল ত্রিপুরা এবং এন্টি চাকমাকে আটক করে। তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা বা গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল না। পুরাতন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাদেরকে জেলে প্রেরণ করা হয়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঘাইছড়ির দুরছড়িতে তল্লাসী অভিযান, জেএসএস সদস্যদের তথ্য সংগ্রহ

গত ২৮ নভেম্বর ২০১৮ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার দুরছড়ি সাব-জোনের একদল সেনা দুরছড়ি ও গলাচিপা এলাকায় তল্লাসী অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা জনসংহতি সমিতির সদস্যদের নাম, তারা কোথায় থাকে, কখন বাড়িতে আসে ইত্যাদি খোঁজ করে।

জেএসএসের সদস্য সাজিয়ে রাঙ্গামাটিতে গ্রেফতার ও অপপ্রচার

গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৮ পুলিশ ও সেনাবাহিনী আলোময় চাকমা ও আনন্দ কুমার চাকমা ওরফে ধন নামে দু'জন ব্যক্তিকে রাঙ্গামাটি শহরের তবলছড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তাদের উভয়কেই জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্য সাজিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগ আনা হয়। বস্তুত তারা জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য নয়। তাদের গ্রেফতারের ঘটনায় জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি সাজানো মামলা দায়ের করা হয়।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন অভিযান, গ্রেফতার ও তল্লাসী

(১) ৯ ডিসেম্বর ২০১৮ দুরছড়ি সাব-জোন থেকে একদল সেনা বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের শিজক, যৌথখামার, সার্বোয়াতলী, মোষপয্যা ইত্যাদি গ্রামে অভিযান চালায়। এ সময় সেনা সদস্যরা খোকন চাকমাসহ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের খোঁজ করে। সেদিন শিজক কলেজে সেনা সদস্যরা রাত যাপন করে।

(২) ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ রাঙ্গামাটির বন্দুকভাঙ্গা খারিক্ষ্যং ক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য বন্দুকভাঙ্গা এলাকায় এক অভিযানে বের হয়। সেনা সদস্যরা বন্দুকভাঙ্গা ও লংগদুর মধ্যবর্তী যমচুক উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত যমচুগ বৌদ্ধ বিহার ও ভাবনা কেন্দ্রে অবস্থান নেয়। এতে এলাকায় চরম আতঙ্ক দেখা দেয়।

(২) ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু জোন থেকে হেলিকপ্টার যোগে হালিমপুর বিজিবি ক্যাম্পে একদল সেনা এবং মাঝিপাড়া বিজিবি ক্যাম্পে আরেকদল সেনা নেয়া হয়। তাদের মধ্যে মাঝিপাড়া বিজিবি ক্যাম্পে নেয়া সেনা সদস্যরা

আশেপাশের জুম্ম বসতিতে পেট্রোলিং দেয়। সেসময় সেনা সদস্যরা কিছু কিছু জুম্ম গ্রামবাসীকে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে নির্দেশ দেয় বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছে। তার পরদিন ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ লংগদু জোন থেকে হেলিকপ্টার যোগে সেনা সদস্য বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নাধীন কজইছড়ি বিজিবি ক্যাম্পে নেয়া হয়।

(৩) ১৫-১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যবর্তী রাতে সারারাত কুতুকছড়ি ক্যাম্পের একদল সেনা রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার কুতুকছড়ি ইউনিয়নের ধর্মঘর এলাকায় তল্লাসী অভিযান চালায়। এসময় অনেক গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানি করা হয়।

(৪) ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ ভোর রাতে সেনাবাহিনী বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের তাংগুম এলাকা থেকে সমর বিকাশ চাকমা (৩৮) পীং- নীলধর চাকমা, গ্রাম- তাংগুম ডাঙ্গাছড়া; মিলন জ্যোতি চাকমা টুক্কো (৩৫) পীং- নীলব্রত চাকমা, সাং- তাংগুম উজ্জেংছড়ি; নিউটন চাকমা (৩১) পীং- মোহনী মোহন চাকমা, সাং- তাংগুম উজ্জেংছড়ি; এবং মিঠুন চাকমা (২৭) পীং- বিত্তে চাকমা, গ্রাম- তাংগুম পেরাছড়ি প্রমুখ গ্রামবাসীদের তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে আটক করে। শেষের দুইজন নিউটন চাকমা ও মিঠুন চাকমাকে সকালে ছেড়ে দেয়া হয়।

(৫) ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ বিকালে বোট যোগে একদল সেনাসদস্য বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের শিজকছড়ার উজান বেয়ে কজইছড়ি বিজিবি ক্যাম্পে গমন করে। আবার ১৭ ডিসেম্বর দুরছড়ি সাব-জোন থেকে ৫টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বাবুপাড়া, সার্বোয়াতলী, মোষপয্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিজক হাই স্কুল এবং শিজক খাগড়াছড়ি সরকারি প্রাইমারী স্কুল প্রভৃতি এলাকায় পেট্রোলিং-এ বের হয়। এসময় শিজক হাই স্কুলে স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাতন তালুকদারের স্থাপিত নির্বাচনী কেন্দ্রে কর্মরত প্রচারকর্মীদেরকে দুরছড়ি সাব-জোনের জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসার জিজ্ঞাসা করেন, আওয়ামীলীগ বা বিএনপি প্রার্থীর জন্য কাজ না করে কেন স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাতন তালুকদারের জন্য তারা কাজ করছে। কারণ আওয়ামীলীগ অথবা বিএনপিই সরকার গঠন করবে বলে সেনা সদস্যরা তাদেরকে জানান।

রাজস্থলীর বাঙালহালিয়ায় জনসংহতি সমিতির সদস্যের বাড়িতে যৌথবাহিনীর তল্লাসী

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ রাত ১১:৩০ ঘটিকায় রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া বাজার সংলগ্ন ডাকবাংলা গ্রামে জনসংহতি সমিতি রাজস্থলী থানা শাখার কৃষি বিষয়ক সম্পাদক থুইহ্লা মারমার বাড়িতে বাঙালহালিয়া সেনা ক্যাম্প থেকে যৌথবাহিনীর একটি টহলদল তল্লাসী চালায়।

জানা যায়, ঘটনার সময়ে যৌথবাহিনীর সদস্যরা থুইহ্লা মারমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং থুইহ্লা মারমার নাম উল্লেখ করে ঘরের দরজা খুলতে ডাকে। এ সময়ে থুইহ্লা মারমার স্ত্রী জানান যে তার স্বামী নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বাইরে রয়েছে। তবুও যৌথবাহিনীর সদস্যরা ঘরের দরজা খুলতে বলে এবং দরজা না খুললে ভেঙ্গে ফেলা হবে বলে হুমকি দেয়। পরে থুইহ্লা মারমার স্ত্রী দরজা খুলে দিলে যৌথবাহিনীর সদস্যরা ঘরের ভেতরে তল্লাসী চালায় এবং বাড়ির আসবাবপত্র তছনছ করে। ঘরে তল্লাসী চালানোর সময়ে যৌথবাহিনীর সদস্যরা থুইহ্লা মারমার স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পরে যৌথবাহিনীর সদস্যরা থুইহ্লা মারমাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দিয়ে চলে যায়।

রাইখালীতে জনসংহতি সমিতির সমীরণ তঞ্চঙ্গ্যাকে গ্রেফতার

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮ বিকাল বেলায় কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনা থানাধীন রাইখালী ইউনিয়নের কারিগর পাড়া থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই থানা শাখার অর্থ সম্পাদক সমীরণ তঞ্চঙ্গ্যাকে পুলিশ কর্তৃক বিনাপরাধে ও অবৈধভাবে গ্রেফতার করা হয়। শ্রী তঞ্চঙ্গ্যা সেসময় বড়খোলা গ্রামে নির্বাচনী উঠান বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। তার বিরুদ্ধে থানায় কোন মামলা বা অভিযোগ ছিল না। গ্রেফতারের পর স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও গোয়েন্দা বাহিনীর যোগসাজশে চন্দ্রঘোনা থানায় ১০/১২/২০১৮ তারিখে জনৈক স্বপন দাশ কর্তৃক ১০/১৫ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এক চাঁদাবাজি মামলায় জড়িত করে তাকে জেলে প্রেরণ করা হয়।

বিলাইছড়ির ফারুয়াতে পিতা-পুত্রসহ জেএসএসের তিন সদস্য আটক

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যায় বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের তারাছড়ি গ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার সদস্য বঙ্কিমচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (৩৭), তার ভাই ফারুয়া ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বার যতীন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (৪২) এবং বঙ্কিমচন্দ্র-এর ছেলে পাপেল তঞ্চঙ্গ্যা (২৫) প্রমুখ তিন ব্যক্তিকে ফারুয়া ক্যাম্পের সেনাবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে যে, সেদিন সন্ধ্যায় ফারুয়া ক্যাম্পের সেনাবাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যাসহ এলাকায় মুরুব্বীদেরকে ক্যাম্পে উপস্থিত

হতে নির্দেশ দেয়। তদনুসারে ক্যাম্পে গেলে কথাবার্তা বলার পর অন্যান্যদের ছেড়ে দিলেও সেনাবাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যাকে আটকে রাখে। এরপর রাতে তাঁকে নিয়ে তারাছড়ি গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ও তার ভাই ইউপি মেম্বার যতীন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি ঘেরাও করে। এসময় তাদের বাড়িতে তল্লাসী চালায়। তল্লাসীর নামে বাড়ির জিনিসপত্র ব্যাপকভাবে তছনছ ও ভাঙচুর করে। তল্লাসীর একপর্যায়ে অবৈধ অস্ত্র পাওয়া গেছে বলে সেনাসদস্যরা ঘোষণা করে। এরপর সেনাসদস্যরা বঙ্কিমচন্দ্রসহ তাঁর ছেলে ও ভাইকে আটক করে নিয়ে আসে। তার পরদিন সকালে তাদেরকে বিলাইছড়ি থানায় সোপর্দ করে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, সেদিন বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অমৃত লাল তঞ্চঙ্গ্যা স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাতন তালুকদারের নির্বাচনী প্রচার কাজে ফারুয়া বাজারে যান। সেসময় ফারুয়া ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের নামে তাদের সাথে অমৃত লাল তঞ্চঙ্গ্যাকেও ফারুয়া বাজারে ঘুরতে বাধ্য করে।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৪টি বাড়ি তল্লাসী

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ আনুমানিক সকাল ১১:০০ ঘটিকার দিকে একদল সেনা সদস্য বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের নলবন্যা গ্রামে সূর্য লাল চাকমা (৩৮) পীং সাধন কুমার চাকমা এবং নীল রঞ্জন চাকমা (৬০) পীং মৃত দেব রতন চাকমার বাড়ি তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে তল্লাসী চালায় ও জিনিসপত্র তছনছ করে। সেসময় বাড়ির লোকজন সবাই জমিতে কাজ করতে গিয়েছিল। আবার রাত আনুমানিক ১২:০০ ঘটিকায় সেনা সদস্যরা একই ইউনিয়নের বড় দুরছড়ি গ্রামে সিন্ধু কুমার চাকমা (৪৫) পীং ধরনা চাকমা এবং রণচিত্র চাকমা ওরফে ডেমাবৈদ্য (৬২) পীং মৃত অনন্ত চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে তল্লাসী চালায় ও নানাভাবে হয়রানি করে।

বিলাইছড়িতে নিরীহ তিনজন জুম্মকে গ্রেফতার ও ৫টি বাড়িতে তল্লাসী

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮ রাত আনুমানিক ১:৩০ ঘটিকায় আলেক্ষ্যং ক্যাম্পের সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার বিলাইছড়ি ইউনিয়নের মালুম্যা গ্রাম থেকে বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড মেম্বার ও জনসংহতি সমিতির মালুম্যা গ্রাম কমিটির সভাপতি সমীর কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (৪২) পীং কমলা তঞ্চঙ্গ্যা; মঞ্জু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫) এবং নির্ভয় তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫) পীং আনন্দ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ তিন ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রার্থীর নির্বাচনী পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

অপরদিকে ২৮ ডিসেম্বর ভোরে তক্তানালা ক্যাম্পের সেনাবাহিনী বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের তক্তানালা গ্রামের ৫টি বাড়িতে তল্লাসী চালায়। সেনাবাহিনী ঘরের দরজা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র ব্যাপকভাবে তছনছ করে। তল্লাসীকৃত ঘরবাড়ির মধ্যে রবিন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও ভরত কুমার তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বাড়ি সবচেয়ে বেশি ভাংচুর করা হয় বলে জানা গেছে। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম আতঙ্ক ও ভীতি দেখা দিয়েছে।

বাঘাইছড়িতে পুলিশ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সাজানো মামলা দায়ের

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলায় বাঘাইছড়ি থানার এসআই হিরু বড়ুয়া বাদী হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সাধারণ সম্পাদকসহ জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের ২৭ জন সদস্যের বিরুদ্ধে একটি সাজানো ও মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। অবৈধ অস্ত্র ও গুলি রাখার মিথ্যা অভিযোগ এনে দায়েরকৃত এই মামলার নম্বর ০৩/০৩। অপরদিকে একই দিন জনৈক প্রভাত কুমার চাকমা কর্তৃক একই থানায় আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ বাড়িতে প্রবেশ করে বসু চাকমাকে হত্যার অভিযোগ এনে উক্ত একই ২৭ জনের বিরুদ্ধে আরেকটি মিথ্যা ও সাজানো মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলার নম্বর ০২/০২। উল্লেখ্য যে, ৪ জানুয়ারি বাঘাইছড়ি পৌরসভার অন্তর্গত বাবু পাড়ায় কে বা কারা বসু চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করার হীনউদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, স্থানীয় ক্ষমতাসীন দল ও সংস্কারপন্থী দালালদের ষড়যন্ত্রে উক্ত ঘটনার সাথে পাইকারীভাবে জড়িত করে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা দায়ের করা হয়।

বাঘাইছড়ির সার্বোয়াতলীতে জেএসএস সদস্যের খোঁজে সেনা অভিযান, ১টি বাড়ি ঘেরাও

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ বিকাল আনুমানিক ৩টায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল সেনাসদস্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের সার্বোয়াতলী,

রাঙাপাহাড়, সিজক যৌথ খামার এলাকায় সেনা অভিযান চালায়। এসময় সেনাসদস্যরা সার্বোয়াতলী গ্রামের যতীন রায় চাকমা ও রিপন চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। অভিযানের সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জনসংহতি সমিতির সার্বোয়াতলী গ্রাম কমিটির সভাপতি বরুণ চাকমার অবস্থান খোঁজ করেছিল।

বাঘাইছড়ির সার্বোয়াতলীতে সেনা কর্তৃক এক জুম্মকে আটক, পরে মুক্তি

গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ সকাল বেলায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের সার্বোয়াতলী সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য সার্বোয়াতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী হুরি চোগা চাকমাকে আটক করে স্থানীয় সার্বোয়াতলী বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরে বিকেলের দিকে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকগণ বিজিবি ক্যাম্পে গিয়ে অনুরোধ জানালে হুরি চোগা চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

চট্টগ্রামে মিথ্যা মামলায় র‍্যাব কর্তৃক দুই পাহাড়ি শ্রমিক নেতা গ্রেফতার

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ চট্টগ্রামের র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)-এর ব্যাটালিয়ান নং-৭ এর একদল সদস্য চট্টগ্রাম নগরের বন্দর এলাকা থেকে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক বিমল তঞ্চঙ্গ্যা ওরফে দিশান ও সাংগঠনিক সম্পাদক প্রশান্ত চাকমা ওরফে রাসেলকে গ্রেফতার করে এবং এরপর রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন কাপ্তাই থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ চন্দ্রঘোনা থানার পুলিশ বিমল তঞ্চঙ্গ্যা ওরফে দিশানকে তিনটি সাজানো মামলায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জড়িত করে রাঙ্গামাটির চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে। মামলাগুলি হল- (১) বাঘাইছড়ি উপজেলার বাবুপাড়ায় জনৈক বসু চাকমা হত্যা মামলা, বাঘাইছড়ি থানায় বাংলাদেশ প্যানাল কোড এর ১৪৮/১৪৯/৪৪৮/৩০২/৩৪ ধারায় দায়েরকৃত এই মামলা নং-২, তারিখ ০৫/০১/২০১৯; (২) বসু চাকমা হত্যার ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্র রাখার মামলা। বাঘাইছড়ি থানায় অস্ত্র আইন ১৮৭৮ এর ১৯(ক) এর ধারায় দায়েরকৃত মামলা নং-৩, তারিখ ০৫/০১/২০১৯ এবং (৩) ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ কাপ্তাই উপজেলার কারিগর পাড়ায় মংসানু মারমা ও জাহিদ হত্যা মামলা। ঐদিন আদালতে শুনানির পরপরই আদালত বিমল তঞ্চঙ্গ্যা ওরফে দিশানকে রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে প্রেরণ করে এবং চন্দ্রঘোনা থানায় দায়েরকৃত হত্যা মামলায় দুই দিন ও বাঘাইছড়ি থানায় দায়েরকৃত দুই মামলায় একদিন রিমান্ড মঞ্জুর করে। এরপর তদনুযায়ী বিমল তঞ্চঙ্গ্যাকে প্রথমে চন্দ্রঘোনা থানায় ও পরে বাঘাইছড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

র‍্যাব কর্তৃক চট্টগ্রামে ২ জেএসএস সদস্য গ্রেফতার

একজনকে ক্রশফায়ারে খুন, আরেকজনের হদিস নেই

গত ১৪ মার্চ ২০১৯ চট্টগ্রামের র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর একদল সদস্য চট্টগ্রাম শহর এলাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মায়াধন চাকমা এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও ঠিকাদার জ্ঞানশংকর চাকমাকে গ্রেফতার করে।

প্রায় ১৯-২০ দিন র‍্যাব পুলিশ বা আদালতে সোপর্দ না করেই বেআইনীভাবে তাদের হেফাজতে রেখে গ্রেফতারকৃতদের অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এরপর ৩ এপ্রিল ২০১৯ র‍্যাব-৭ এর কম্যান্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল মিফটাহ্ উদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে সেনা ও র‍্যাব এর যৌথ বাহিনীর সদস্যরা বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন দোছড়ি ইউনিয়নের তুলাতুলি ডলুছড়ি এলাকায় নিয়ে গিয়ে তথাকথিত এক ক্রশফায়ারের নামে গুলি করে জ্ঞানশংকর চাকমাকে হত্যা করে। অপরদিকে মায়াধন চাকমাকে এখনও পুলিশকে বা আদালতে সোপর্দ করা হয়নি। কোথায়, কীভাবে আছে তার হদিশও মেলেনি। তবে সম্প্রতি একটি সূত্রে, অমানবিকভাবে নির্যাতনে মারাত্মকভাবে জখম মায়াধন চাকমাকে চট্টগ্রাম সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।

পিসিপির জগদীশ চাকমাকে সেনাবাহিনী কর্তৃক অবৈধভাবে গ্রেফতার

গত ১৯ মার্চ ২০১৯ দুপুর আনুমানিক ১:৩০ ঘটিকার সময় জুরাছড়ি উপজেলার ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়নের রাস্তামাথা নামক এলাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) রাঙামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি এবং জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমাকে প্রথমে সেনাবাহিনী কর্তৃক বিনা অপরাধে আটক করা হয় এবং পরে পুলিশ কর্তৃক মিথ্যা মামলায় জেলে প্রেরণ করে। জগদীশ চাকমা সে সময় পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পর জুরাছড়ি থেকে রাঙামাটিতে আসছিলেন। তার বিরুদ্ধে থানায় কোন মামলা বা অভিযোগ ছিল না।

জানা যায়, জুরাছড়ি উপজেলার ২ নং ইউনিয়নের রাস্তামাথা নামক এলাকার বোট ঘাটে রাঙামাটি ফেরার জন্য ইঞ্জিনচালিত বোটের অপেক্ষা করছিলেন জগদীশ চাকমাসহ আরো কয়েকজন। এরপর জনৈক ডিজিএফআইয়ের সদস্য এসে পরিচয় জিজ্ঞেস করে এবং বনযোগীছড়া ১১ বেঙ্গল সেনা জোনে ফোন দেয়। এরপর জোন থেকে সেনাবাহিনীর ১০/১৫ জনের একটি দল এসে সেখানে থাকা কয়েকজনকে আটক করে এবং আইডি কার্ড, মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। বাকিদের ছেড়ে দিলেও জগদীশ চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হয়নি। এরপর জুরাছড়ি থানা থেকে পুলিশ এসে মামলা আছে বলে তাকে অবৈধভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। জগদীশ চাকমার বিরুদ্ধে থানায় কোন সুনির্দিষ্ট মামলা বা অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে আটক এবং গ্রেফতার করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলনরত পিসিপির নেতৃত্বকে হয়রানি করা এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি বিমুখ করা বলে পিসিপি উল্লেখ করে। পরে তিনি জামিনে ২৮ মার্চ ২০১৯ তারিখ মুক্তি লাভ করেন।

রাঙ্গামাটি সেনা জোনে ডেকে বিনাবিচারে প্রায় ৩ মাস আটক

গত ২০ মার্চ ২০১৯ সন্ধ্যার দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শহরের ট্রাইবেল আদাম নিবাসী বরুণ চাকমা (৪০) শহর থেকেই নিখোঁজ হয়। কোথাও খোঁজ না পেলে তার পরিবার-পরিজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। পরে জানা যায় যে, রাঙ্গামাটি সেনা জোনের মেজর তানভির ফোনে বরুণকে জোনে ডেকে পাঠালে বরুণ সেখানে যায় এবং তখন থেকেই সেখানে দিনের পর দিন আদালতে হাজির না করেই সেনা হেফাজতে আটকে রাখা হয়। গত ১৭ জুন ২০১৯ চট্টগাম শহরে নিয়ে বরুণ চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি শহরের বাজার কমিটির সভাপতিকে গ্রেফতার

গত ২০ মার্চ ২০১৯ রাত আনুমানিক ১১:৩০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি সেনা জোনের কমান্ডার মেজর তানভিরের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য রাঙ্গামাটি পৌরসভার বনরূপা এলাকার শশী দেওয়ান পাড়াস্থ নিজ বাড়ি থেকে তুলে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় বনরূপা বাজার কমিটির সভাপতি আশীষ চাকমাকে (৪৫)। দুই দিন নিজেদের হেফাজতে রাখার পর সেনা কর্তৃপক্ষ গত ২৩ মার্চ ২০১৯ আশীষ চাকমাকে রাঙ্গামাটির কোতয়ালী থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। এরপর তাকে মিথ্যাভাবে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা সুরেশ কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা হত্যাকাণ্ডের মামলায় জড়িত করা হয়। হাই কোর্ট থেকে জামিন পেলে তিনি গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ জেল থেকে ছাড়া পান।

বান্দরবানের রুমায় সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির ৩ সদস্য গ্রেফতার

গত ২৫ মার্চ ২০১৯ সকাল আনুমানিক ৮:৩০ টায় বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রুমা উপজেলার রুমা ক্যান্টনমেন্টের একদল সেনাসদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রুমা উপজেলার তিন সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- ক্যসা প্রু মারমা (৪৭), সহ-সভাপতি, রুমা থানা কমিটি ও সাবেক চেয়ারম্যান, পাইন্দু ইউনিয়ন পরিষদ; থোয়াই সানু মারমা (৪৬), সহ-সভাপতি, রুমা থানা কমিটি; এবং লাল রাম বম (৪২), সহ-ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক, রুমা থানা কমিটি।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের তিনজনকে রুমা ক্যান্টনমেন্টে উপস্থিত হতে বলা হলে সেই অনুযায়ী গত ২৩ মার্চ ২০১৯ তারা ক্যান্টনমেন্টে যান। কিন্তু ঐদিন ক্যাম্প কমান্ডার অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন বলে জানিয়ে দেখা করতে পারবেন না বলে জানানো হয় এবং পরবর্তী ২৫ মার্চ ২০১৯ আবার দেখা করতে যাওয়ার জন্য বলা হয়। এরপর গত ২৫ মার্চ ২০১৯ জনসংহতি সমিতির উক্ত তিন সদস্য যখন রুমা ক্যান্টনমেন্টে ক্যাম্প কমান্ডারের সাথে দেখা করতে যান তখনই ক্যান্টনমেন্টের সেনাসদস্যরা তাদের আটক করে এবং এরপর রুমা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। থানায় তাদের বিরুদ্ধে গত ১৮ মার্চ বান্দরবান জেলায় অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে লোকজনকে হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে মিথ্যা মামলা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম জিওসি'র বাঘাইছড়ি সফর ও প্রত্যাহৃত ক্যাম্প পুনঃস্থাপনের হুমকি

গত ২৭ মার্চ ২০১৯ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং (জিওসি) মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলি ইউনিয়নের নয় মাইল এলাকায় ১৮ মার্চ ২০১৯ সংঘটিত সাত জন হত্যা ঘটনার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পরপরই তিনি উপজেলার বিজিবি ২৭ ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারে স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনকে নিয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন। মেজর জেনারেল এস এম মতিউর রহমান

উক্ত সভায় জনসংহতি সমিতিকে লক্ষ্য করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বলেন যে, সরকারি কর্মচারীদের উপর বন্দুক হামলা করে আঞ্চলিক দলসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লংঘন করেছে। এমনকি তিনি হুমকি দিয়ে বলেন যে, এই অপকর্মের জন্য তাদেরকে কঠিন পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। পঞ্চাশ গজ মাটির নীচে লুকিয়ে থাকলেও তাদেরকে বের করে আনা হবে। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন যে, পার্বত্য চুক্তির পর প্রত্যাহারকৃত ২৪০টি ক্যাম্প পুনস্থাপন করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ মার্চ ২০১৯ সন্ধ্যার দিকে উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের কংলাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নির্বাচনী সরঞ্জাম নিয়ে দু'টি গাড়িতে করে বিজিবি প্রহরায় বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে ফেরার পথে ৯ মাইল নামক স্থানে অস্ত্রধারী কর্তৃক হামলার শিকার হয় এবং এতে ঘটনাস্থলে ৭ জন নিহত হন। কিন্তু সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে উক্ত ঘটনার সাথে মনগড়া, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও প্রতিহিংসামূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করা হয়। ২০ মার্চ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত ঘটনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কোনভাবে জড়িত নয় বলে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করে এবং উক্ত সহিংস ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রকৃত অপরাধীদের যথাযথ বিচারের দাবি জানায়।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপি ও জেএসএস সদস্য ত্রিদিব চাকমা গ্রেফতার

গত ২৮ মার্চ ২০১৯ রাত প্রায় ১:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু উপজেলার লংগদু সেনা জোন থেকে আসা একদল সেনাসদস্য বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও জনসংহতি সমিতির স্থানীয় গ্রাম কমিটির সভাপতি ত্রিদিব চাকমা ওরফে সাজেক্যেকে (৬০) তার উত্তর সিজক গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর সম্পূর্ণ হয়রানি ও আক্রোশ বশে তাকেও ১৮ মার্চ ২০১৯ বাঘাইছড়িতে সংঘটিত ৭ হত্যা মামলার সাথে জড়িত করা হয়। উল্লেখ্য, ত্রিদিব চাকমা ঐসময় বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী বড়ঋষি চাকমার এক সক্রিয় নির্বাচন কর্মী হিসেবে কাজ করেন।

লংগদুতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম দোকানদারকে আটক এবং মামলায় জড়িতকরণ

গত ২৮ মার্চ ২০১৯ সকাল আনুমানিক ৮:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার লংগদু সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য উপজেলার লংগদু ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের গোলাছড়ি এলাকার নিরীহ দোকানদার লাড়েই চন্দ্র চাকমা (৪৮)-কে গ্রেফতার করে। লাড়েই চন্দ্র চাকমা ইতিপূর্বে কৃষিপণ্য ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন, সর্বশেষ গোলাছড়ি এলাকায় একটি মুদির দোকান খোলেন। গ্রেফতারের পর লাড়েই চন্দ্র চাকমাকে গত ১৮ মার্চ ২০১৯ বাঘাইছড়িতে সংঘটিত ৭ হত্যার ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়।

বাঘাইছড়ির শিজকে সেনাবাহিনী কর্তৃক বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে সেনা ক্যাম্প নির্মাণ

গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার সেনাবাহিনীর ২১ বীর রেজিমেন্টের মাইনী জোনের ক্যাপ্টেন খালেদ ও ওয়ারেন্ট অফিসার হাসমতের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের শিজকমুখ সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে এক সেনা ক্যাম্প স্থাপন করে। সেনাসদস্যরা ঐ বিহার প্রাঙ্গণেই অস্থায়ী তাঁবু নির্মাণ করে অবস্থান করে চলেছে। ঐ তাঁবুর চারিদিকে তারা বেড়া ও বাংকার নির্মাণ করেছে। এতে বিহারের ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন ও পবিত্রতা রক্ষায় চরম প্রতিবন্ধকতা ও ধর্মীয় পরিহানি সৃষ্টি হয়ে চলেছে। অপরদিকে প্রায় নিয়মিত এই তাঁবু থেকেই সেনাসদস্যরা পার্শ্ববর্তী জুম্ম এলাকায় অভিযান ও তল্লাশির নামে অপরিসীম হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

জামিনে বের হওয়ার আগে জেল থেকে ধরে নিয়ে অন্য মামলায় গ্রেফতার

গত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:০০ টায় আদালত থেকে জামিনে মুক্তির আদেশ পেয়েও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরস্থ রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার থেকে প্রশান্ত চাকমা ওরফে রাসেল ও উজ্জ্বল চাকমা ওরফে শ্যামলসহ ৪ জুম্মকে আবার ধরে নিয়ে যায় সাদা পোশাকধারী নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা। উল্লেখ্য যে, উক্ত ৪ জুম্ম আদালত থেকে জামিন লাভ করেন। কিন্তু আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার আগেই সাদা পোশাকধারী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা উক্ত ৪ জনকে আবার জেল গেইট থেকেই ধরে নিয়ে যায় এবং কোতয়ালী থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। এরপর আটককৃত এই ৪ জনকে গত ৩ মে ২০১৯ সংঘটিত শক্তিমান চাকমা হত্যাসহ বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হিসেবে দেখানো হয়। উল্লেখ্য যে, প্রশান্ত চাকমা ওরফে রাসেলকে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ চট্টগ্রাম থেকে এবং উজ্জ্বল চাকমা ওরফে শ্যামলকে গত ১৯ নভেম্বর ২০১৮ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান এলাকা থেকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার করা হয়।

রোয়াংছড়িতে সেনাক্যাম্প কমান্ডার লে: ফারহান কর্তৃক ৩ আদিবাসী স্কুলছাত্র প্রহৃত

গত ১ মে ২০১৯ বিকাল প্রায় ৪:০০ টায় বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি সেনাক্যাম্পের কমান্ডার লে: ফারহান তুচ্ছ কারণে রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের তিন নিরীহ জুম্ম স্কুল ছাত্রকে অমানবিকভাবে মারধর করে। প্রহারের শিকার তিন ছাত্র হল- (১) বওসাই শোয়ে মারমা, দশম শ্রেণি, (২) উক্যসাই মারমা, অষ্টম শ্রেণি ও (৩) উবা প্রু মারমা, একাদশ শ্রেণি।

জানা গেছে, সেদিন খেলারত সেনাসদস্যদের ক্রিকেট বল অনেকবার কুড়িয়ে এনে তাদেরকে দেওয়ার পরও শেষবার বল তুলে আনতে অস্বীকার করলে ক্যাম্প কমান্ডার লে: ফারহান ছাত্রদের উপর চড়াও হয়ে তাদেরকে মারধর করে। পরদিন ২ মে ২০১৯ রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঘটনার প্রতিবাদে একটি মানববন্ধন আয়োজন করে এবং রোয়াংছড়ি সেনাক্যাম্প হতে লে: ফারহানকে প্রত্যাহারের দাবিতে বান্দরবান সেনা জোনের ২৭ বেঙ্গলের জোন কমান্ডারের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে। কিন্তু জোন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সংস্কারপন্থী সশস্ত্র গ্রুপ বরকলের সুবলং বাজারে আসতে সেনাবাহিনীর স্কর্ট ও সহায়তা

গত ১৪ মে ২০১৯ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য নিরাপত্তা এসকর্ট দিয়ে পূর্ণাঙ্গ চাকমার নেতৃত্বাধীন ১৪ সদস্যবিশিষ্ট সংস্কারপন্থীদের একটি সশস্ত্র গ্রুপ দীঘিনালা থেকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং বাজারে নিয়ে আসে।

জানা গেছে, ঐদিন সকাল বেলা সেনাবাহিনী স্কর্ট দিয়ে দুইটি মাইক্রোবাস যোগে সংস্কারপন্থীদের ১৪ জনের একটি সশস্ত্র দলকে দীঘিনালা থেকে লংগদু লঞ্চ ঘাটে নিয়ে আসা হয়। অপরদিকে আগে থেকে মাইল্যা থেকে রাশেদ, বৈরাগী বাজার থেকে কুতুব ও সোনাই-হাজাছড়ি থেকে হোসাইন-এই তিন সেটেলার ড্রাইভারকে তাদের স্পীড বোটসহ লংগদু ঘাটে প্রস্তুত রাখা হয়। সেদিন সকাল ১১:৪৫ ঘটিকায় লংগদু লঞ্চঘাটে পৌছার সাথে সাথে আগে থেকে ভাড়া করে রাখা তিনটি স্পীড বোটে তুলে সংস্কারপন্থীদেরকে বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নের শুভলং বাজারে নিয়ে আসা হয়। মাইক্রোবাস থেকে নামার সময় সুতলী বস্তায় ঢুকানো অস্ত্র ও গোলাবারুদও সঙ্গে করে স্পীড বোটে তুলে নেয় সংস্কারপন্থী অস্ত্রধারীরা। স্পীডবোটগুলো ফোরেরমুখ পার না হওয়া পর্যন্ত লংগদু উপজেলায় দায়িত্বরত ডিজিএফআই মো: বেলাল এবং লংগদুতে পৌছিয়ে দেওয়া সেনাবাহিনীর গাড়িটি লংগদু ঘাটে অবস্থান করে। সংস্কারপন্থীদের বহনকারী স্পীডবোটগুলো কাট্টলী হ্রদে পৌছালে তারপর সেনাবাহিনীর গাড়িটি দীঘিনালার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং মো: বেলালও সেখান থেকে চলে যান। সুবলং বাজারে পৌছার সাথে সাথে সংস্কারপন্থী গ্রুপটি সুবলং বাজারস্থ ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ের তালা ভেঙে সেখানে প্রবেশ করে অবস্থান গ্রহণ করে।

এরপর থেকেই সুবলং বাজার সেনা ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষ ঐ সংস্কারপন্থী সশস্ত্র গ্রুপটিকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিয়ে আসছে। সুশীল চাকমা ওরফে প্রবেশ ও পূর্ণাঙ্গ চাকমার নেতৃত্বে ১৪ জনের উক্ত সংস্কারপন্থী দল সুবলং এলাকায় আসার পর পরই এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় তারা সুবলং বাজারে চেক পোস্ট বসায়। মালবাহী ও যাত্রীবাহী সকল প্রকার জলযান তারা অবাধে চেক করতে থাকে এবং নিরীহ যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। ব্যবসায়ী ও সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে জোরপূর্বক চাঁদা ধার্য করে আদায় করতে থাকে। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে খবর দিয়ে গ্রামভিত্তিক গণহারে চাঁদা আদায় করতে থাকে। সংস্কারপন্থীদের হয়রানিতে সুবলং বাজার দিয়ে যাতায়াত করতে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

বান্দরবান জোনে ডেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক কেএস মং ও ক্যবামংসহ ৫ জন গ্রেফতার

গত ২৫ মে ২০১৯ বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সেনা জোনের সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কেএস মং মারমা এবং রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমাসহ ৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

উল্লেখ্য, ঐদিন দুপুর ২:০০টায় আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে কে এস মং মারমা ও ক্যবামং মারমা বান্দরবান সেনা জোনে যান। সেখানে আলোচনার নামে প্রায় দুই ঘন্টা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদের পর সেনাবাহিনী তাদেরকে গ্রেফতার করে এবং বিকাল ৪:০০টার দিকে বান্দরবান থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। অপরদিকে একই সময়ে বান্দরবান সদর উপজেলাধীন কুয়ালং ইউনিয়নের কোলাক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান থোয়াই হ্লা প্রু মারমা (৫৩), উজিপাড়ার কার্বারী (গ্রাম প্রধান) হ্লাচিং মং মারমা (৪৫) ও জর্ডান পাড়ার কার্বারি মং হ্লা ত্রিপুরাকেও (৬৫) গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সবাইকে গত ২২ মে বান্দরবান পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও পৌর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি চ্যথুই মং মারমাকে

অপহরণ ও হত্যার ঘটনার সাথে জড়িত করে মিথ্যা অভিযোগ এনে ঐ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ও নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় স্থানীয়ভাবে মগ পার্টি নামে খ্যাত আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি)-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বান্দরবান সদর উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক হত্যা, অপহরণ, হুমকি, চাঁদাবাজি চালিয়ে আসছে। ২২ মে চ্যথুইমং মারমার অপহরণ ও হত্যার সাথে এএলপি জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে এই বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন এএলপির বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা না দিয়ে উল্টো ২২ মে চ্যথুইমংকে অপহরণ ও খুনের ঘটনায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করে সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করা হয়।

সুবলঙের বিভিন্ন গ্রামে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও সংস্কারপন্থীদের হানা

গত ৩ জুন ২০১৯ সকাল ৯:৩০ ঘটিকার সময় আর্মি, বিজিবি ও সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সদস্যরা তিনটি বোট যোগে বেগেনাছড়ি গ্রামে যায় এবং উক্ত গ্রামের বাসিন্দা কিশোর কুমার চাকমাকে (৪৫) মারধর ও জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেদিন একজনকে ধরে নিয়ে যায় এবং কয়েকদিন পর ছেড়ে দেয়। তার পরদিন ৪ জুন ২০১৯ তারিখে তাদের ৫/৬ জনের একটি সশস্ত্র দল হাজাছড়া গ্রামে অবস্থান করে এবং প্রতি বাড়ি থেকে ২০০ টাকা চাঁদা দাবি করে। এছাড়াও প্রায়সময় শীলছড়ি, বাঘেছোলা, দেয়ানচর এলাকায় সেনাবাহিনী ও সংস্কারপন্থী সদস্যরা একসাথে রাতে টহল দেয় ও তল্লাসী করে বলে জানা যায়।

জুরাছড়ির লুলংছড়িতে প্রত্যাহৃত সেনাক্যাম্প পুনস্থাপন

গত ১৪ জুন ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার জুরাছড়ি ইউনিয়নের লুলংছড়ি এলাকায় একটি সেনাক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ঐদিনই সেনাবাহিনীর একটি দল সেখানে টিন, কাঠ ও বাঁশ নিয়ে ক্যাম্পটি নির্মাণ শুরু করে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই যে স্থান থেকে একটি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়, সেই স্থানেই এই নতুন সেনাক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়েছে।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনীর অভিযানে ৩ নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেফতার

গত ৩০ জুন ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য উপজেলার শুগুরিপাতা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন– (১) মেরুধন চাকমা, সাবেক ইউপি সদস্য, গ্রাম- পাবলাখালি; (২) অমর বিকাশ চাকমা, জনসংহতি সমিতির গ্রাম কমিটির সদস্য, গ্রাম- দক্ষিণ পাবলাখালি; (৩) সুমন চাকমা, জনসংহতি সমিতির গ্রাম কমিটির সদস্য, গ্রাম- পশ্চিম পাবলাখালি।

জুরাছড়ির জামেশছড়িতে আবারও সেনাক্যাম্প পুনস্থাপন

গত জুন ২০১৯ এর মধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার জুরাছড়ি-বনযোগীছড়া সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য উপজেলার মইডুং ইউনিয়নের জামেশছড়ি এলাকায় একটি সেনাক্যাম্প স্থাপন করে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জামেশছড়ির যে জায়গা থেকে একটি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয় সেই জায়গাতেই আবার এই সেনাক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

রাঙ্গামাটির সুবলঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম কাঁচামাল বিক্রেতাদের বাধা ও হয়রানি

গত ৬ জুলাই ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং বাজারে সুবলং সেনাক্যাম্পের সেনাসদস্যরা বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত রাঙ্গামাটি শহরগামী জুম্ম হলুদ, কলা, আনারস, কাঁঠাল বিক্রেতাদের বোটগুলো আটকে দিয়ে রাঙ্গামাটি শহরে যেতে বাধা প্রদান করে। এরপর সেনাবাহিনী জোরপূর্বক জুম্ম বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের তাদের সকল পণ্য সুবলং বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য করে।

রাঙ্গামাটির সুবলঙে সেনা ও সংস্কারপন্থী দলের যৌথ তল্লাশী অভিযান

গত ১৫ জুলাই ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং বাজার সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য ও সুবলং বাজারে অবস্থান নেয়া সংস্কারপন্থী গ্রুপের একদল সশস্ত্র সদস্য যৌথভাবে সুবলং ইউনয়নের বাঘাছোলা এলাকায় তল্লাশী অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গেছে। জানা যায়, সেনা সদস্যরা বাঘাছোলা গ্রামের অনেক বাড়িতে তল্লাশী অভিযান চালায়, অপরদিকে সংস্কারপন্থী দলটি এসময় ট্রলার বোটে

অবস্থান গ্রহণ করে। সেনা ও সংস্কারপন্থী দল তল্লাশীর সময় উভয়ই বাবুইয়্যা চাকমা নামের এক ব্যক্তিকে খোঁজ করে। তারা গ্রামবাসীদের নিকট বাবুইয়্যা চাকমার একটি ছবি প্রদর্শন করে এবং বাবুইয়্যা চাকমার মুখে একটি কালো তিল রয়েছে বলেও জানায়। তবে গ্রামবাসী কেউই ঐ ব্যক্তিকে চেনে না বলে জানায়। সেনাসদস্যরা একটি বাড়ি হতে স্থানীয় বৌদ্ধ বিহারের চাঁদার কিছু রশিদ ও একটি নোট খাতা নিয়ে যায় এবং ঐ বাড়ির বয়স্ক দম্পতির একটি ছবিও তুলে নিয়ে যায়।

রাঙ্গামাটির বালুখালিতে সেনা-সংস্কারপন্থীদের অভিযান ও হয়রানি

গত ১৬ জুলাই ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য ও সংস্কারপন্থী গ্রুপের একদল সশস্ত্র সদস্য যৌথভাবে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালি ইউনিয়নের বসন্ত এলাকায় তল্লাশী অভিযান চালায়। অভিযানের সময় তারা তথাকথিত চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী খোঁজার নামে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জনগণকে হয়রানি করে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক কাউখালি থানা জেএসএস'র তথ্য ও প্রচার সম্পাদক গ্রেফতার

গত ২০ জুলাই ২০১৯ সকাল আনুমানিক ১১:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া বাজার থেকে ঘাগড়া সেনা জোনের সেনা সদস্যরা জনসংহতি সমিতির কাউখালী থানা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক প্রদীপ চাকমা (৩৫) পীং-প্রশান্ত কুমার চাকমাকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, প্রদীপ চাকমাকে প্রথমে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে সেখানে অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এরপর গত ২১ জুলাই ২০১৯ সেনাসদস্যরা প্রদীপ চাকমাকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করার জন্য কাউখালী থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু নির্যাতনের ফলে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় কাউখালি থানার পুলিশ প্রদীপ চাকমাকে গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। ফলে সেনাসদস্যরা প্রদীপ চাকমাকে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেখানে ভর্তি করিয়ে দেয়। সেনা হেফাজতেই তার চিকিৎসা চলে। প্রদীপ চাকমার বাড়ি কাউখালি উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের চৌধুরীপাড়া গ্রামে।

লংগদুর বিজিবি কর্তৃক ২ নিরীহ গ্রামবাসী গ্রেফতার ও সেনা অভিযানের হয়রানি

গত ২৭ জুলাই ২০১৯ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার বিজিবি লংগদু জোনের একদল বিজিবি সদস্য পার্শ্ববর্তী বরকল উপজেলার বরকল ইউনিয়নের বিলছড়া গ্রামের ১. চয়ন চাকমা (৩৫ বছর) পীং-সুমতি চাকমা ও ২. বিষন্ন চাকমা (৩৮ বছর) পীং-যামিনী মোহন চাকমা নামের দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে।

জানা গেছে, ঐদিন সকাল বেলায় উক্ত দুই জুম্ম গ্রামবাসী ছাগল বিক্রি করার জন্য যাত্রীবাহী লঞ্চযোগে লংগদু উপজেলার মাইনীমুখ বাজারে যায়। ঐসময় বাজারে থাকা কয়েকজন গোয়েন্দা বাহিনীর লোক এই দুই গ্রামবাসীকে আটক করে পার্শ্ববর্তী বৈরাগী বাজারে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে বিজিবি সদস্যদের নিকট হস্তান্তর করে। অমানবিক হয়রানির পর বিজিবি সদস্যরা বিকেলের দিকে নিরাপরাধ দুই গ্রামবাসীকে জনসংহতি সমিতির চাঁদাবাজ সাজিয়ে লংগদু থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। অথচ উক্ত দুই ব্যক্তি চাঁদাবাজ তো নয়ই, জনসংহতি সমিতি বা অন্য কোন দলের সাথেও জড়িত নয় বলে জানা গেছে।

রাঙ্গামাটির বিভিন্ন স্থানে একযোগে সেনা অভিযান ও ৬ গ্রামবাসীকে হয়রানি

গত ২৭ জুলাই ২০১৯ বিকেল বেলা হতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুকভাঙা এলাকায়, লংগদু উপজেলাধীন কাত্তলী এলাকায়, বরকল উপজেলাধীন ফালিটাঙ্যাচুক ও সুবলং এলাকায় এবং জুরাছড়ি উপজেলা ও রাজস্থলী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। এসময় সেনাসদস্যরা তাদের খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র বহনের জন্য বন্দুকভাঙার ৬ গ্রামবাসীকেও তাদের সাথে যেতে বাধ্য করে।

রাঙ্গামাটির মগবানে সেনা তল্লাশী অভিযান

গত ২৮ জুলাই ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মগবান ইউনিয়নের কামিলাছড়ি এলাকার বাদিরাম চাকমা (৫২)-র বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশী চালায়। এসময় তারা রোহিত চাকমা নামের এক ব্যক্তিকে খোঁজ করে। বাড়ির লোকজন তাকে চেনে না বলে জানায়।

বাঘাইছড়ির সার্বোয়াতলীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীদের পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ

গত ২৮ জুলাই ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের সিজকমুখ বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে স্থাপিত সেনাক্যাম্পের সদস্যরা ইউনিয়নের চিন্তারামছড়া ও গলাচিবা গ্রামের প্রত্যেক জুম্ম পরিবার হতে

পরিবারের পরিবার প্রধানের নাম, পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা, বাড়ির হোল্ডিং নম্বর, পরিবারের সদস্যদের ছবি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। এর পরদিন ২৯ জুলাই ২০১৯ একই ইউনিয়নের মোষপোয়্যা গ্রামের গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও একই তথ্য সংগ্রহ করে।

লংগদুতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম বাড়ি তল্লাশী, জিনিসপত্র তছনছ ও একজনকে মারধর

গত ২৯ জুলাই ২০১৯ সকাল আনুমানিক ৯:৪৫ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার বামে লংগদু সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য লংগদু উপজেলাধীন ভাইবোনছড়া গ্রামের ছবিধন চাকমা (৩৫) নামের এক জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীর সময় সেনাসদস্যরা বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ করে এবং যাওয়ার সময় ছবিধন চাকমার দুই ছেলের জন্ম সনদ, পিএসসি ও জেএসসি সনদ এবং তার স্ত্রী নীহারিকা চাকমার জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে যায়। এছাড়া সেনাসদস্যরা ক্যাম্পে ফেরার পথে উপজেলার ডিংগিছড়া এলাকার বিনয় চাকমা (২২) নামের রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের এক ছাত্রকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং সেখানে অমানবিকভাবে মারধর করার পর ছেড়ে দেয়।

থানচিতে বিজিবি কর্তৃক জুম্ম গ্রাম দখল করে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপনের চেষ্টা

গত ২৯ জুলাই ২০১৯ সকাল ৯টায় বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিজিবি বান্দরবান জোনের সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য থানচি উপজেলার জুম্ম অধ্যুষিত গ্রাম জিনি অং পাড়ায় জোরপূর্বক একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপনের চেষ্টা চালায়। প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপনের জন্য বিজিবি সদস্যরা জুম্মদের ভূমি বেদখল করতে চাইলে জুম্মরা বাধা প্রদান করলে সেক্টর কমান্ডার তাদের হুমকি প্রদান করেন।

কেএস মং ও ক্যবামংকে বান্দরবান জেল থেকে পুনঃগ্রেফতার

গত ৪ আগস্ট ২০১৯ জনসংহতি সমিতির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কে এস মং মারমা এবং জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমাকে বান্দরবান জেলে পুনঃগ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বান্দরবান পৌরসভার সাবেক কমিশনার চ্যথুই মং মারমাকে অপহরণ ও হত্যার ঘটনায় গত ২৫ মে ২০১৯ তাদেরকে বান্দরবান সেনা জোনে ডেকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর হাইকোর্ট থেকে তারা জামিন লাভ করেন। হাইকোর্টের জামিনে জেল থেকে বের হওয়ার আগে ২ আগস্ট ২০১৯ বান্দরবান সদর থানার সাব-ইন্সপেক্টর মো: জিয়াউর রহমান কর্তৃক চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে বান্দরবানের জনৈক ক্যাচিং থোয়াই মারমার হত্যা মামলায় জড়িত করে ৪ আগস্ট ২০১৯ বান্দরবান জেলে আবার গ্রেফতার দেখানো হয়। পরে তারা আবার হাই কোর্ট থেকে জামিন নিলে গত ২৪ অক্টোবর ২০১৯ বান্দরবান জেল থেকে ছাড়া পান।

সেনা ও পুলিশ কর্তৃক থানচির জেএসএস সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান গ্রেফতার

গত ৭ আগস্ট ২০১৯ জনসংহতি সমিতির থানচি থানা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান চসা থোয়াই মারমা মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত এক হত্যা মামলায় উচ্চ আদালতের অগ্রিম জামিন নিয়ে বান্দরবান অতিরিক্ত বিচারিক হাকিম আদালতে উপস্থিত হতে গিয়ে আদালত তাকে জেলে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য যে, ২২ মে ২০১৯ বান্দরবান পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা চ্যথুই মং মারমার হত্যা ঘটনায় চসা থোয়াই মারমাসহ জনসংহতি সমিতির ১৩ জন সদস্যের বিরুদ্ধে এক সাজানো মামলা দায়ের করা হয়।

জামিন পেয়েও মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার জেএসএস সদস্যসহ বিলাইছড়ির ৪ নিরীহ ব্যক্তি

মিথ্যা মামলায় ঢাকার হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েও গত ৮ আগস্ট ২০১৯ রাঙ্গামাটি থেকে গ্রেফতার হয়েছেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার অধিবাসী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ৪ নিরীহ ব্যক্তি। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- (১) কানন কুসুম চাকমা (৬৭) পীং-মৃত ফুলচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, সাং-কুতুবদিয়া, ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়ন, সদস্য, জেএসএস'র রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি, (২) অমরেন্দ্র লাল চাকমা (৫৫) পীং-মৃত ক্ষীরোদ মোহন চাকমা, সাং-দীঘলছড়ি, বিলাইছড়ি সদর, সভাপতি, জেএসএস'র বিলাইছড়ি সদর ইউনিয়ন কমিটি, (৩) মানিক কুমার চাকমা (৩৬) পীং-মৃত চিগোন্যা চাকমা, সাং-কেরনছড়ি, ২নং কেঙড়াছড়ি ইউনিয়ন, ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক, জেএসএস'র বিলাইছড়ি উপজেলা কমিটি ও (৪) দীপঙ্কর চাকমা (৩৩) পীং-যোগেশ্বর চাকমা, সাং- কাঙারাছড়ি, ২নং কাঙারাছড়ি ইউনিয়ন, গ্রামবাসী। উল্লেখ্য, গ্রেফতারকৃতদের

স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা সুরেশ তঞ্চঙ্গ্যা হত্যা মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়। জানা গেছে, গত ১৫ জুলাই ২০১৯ তারা ঢাকার হাইকোর্ট থেকে জামিন নেন। এরপর ৮ আগস্ট ২০১৯ রাঙ্গামাটিস্থ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গেলে ঐদিনই সেখান থেকে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

জামিনে চট্টগ্রাম জেল থেকে বের হওয়ার পর র‌্যাব ও গোয়েন্দা কর্তৃক সুভাষ চাকমাকে আটক

গত ৮ আগস্ট ২০১৯ উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই চট্টগ্রাম শহরের খাতুনগঞ্জ থেকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাউখালী উপজেলার জনসংহতি সমিতির কাউখালী থানা কমিটির সভাপতি ও ব্যবসায়ী সুভাষ চাকমাকে আবার আটক করে সাদা পোশাকধারী র‌্যাব ও গোয়েন্দা বাহিনীর একটি দল। কিন্তু আটকের পর সুভাষ চাকমাকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়নি। আটকের এক মাসের অধিক নিখোঁজ থাকার পর গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ভোরে সুভাষ চাকমা তার কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়ায় বাড়িতে ফিরে আসেন। এসময় তাকে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল বলে জানা যায়। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এতদিন তাকে কোথায়, কিভাবে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। উল্লেখ্য, গত ২৪ অক্টোবর ২০১৮ ঘাগড়ার চাম্পাতলি সেনাক্যাম্পের সেনাবাহিনী ক্যাম্পে ডেকে তাকে গ্রেফতার করে এবং নানিয়ারচর উপজেলা চেয়ারম্যান শক্তিমান চাকমা হত্যা মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করে।

রুমা সেনা গ্যারিসন মেজরের হুমকি: 'একটি ছাগল ও একটি গয়াল দিলে তবেই দেশে থাকা যাবে'

গত ১২ আগস্ট ২০১৯ বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রুমা উপজেলার রুমা সেনা গ্যারিসন এর মেজর সাইফুল্লাহ'র সাফ কথা, জীবন তঞ্চঙ্গ্যা (৩৩) যদি বাংলাদেশে থাকতে চায়, একটি ছাগল ও একটি গয়াল দিলে তবেই থাকতে পারবে। সেই মোতাবেক গত ১৩ আগস্ট ২০১৯ সকালের দিকে গ্রামের কার্বারীসহ জীবনের বড় ভাই অর্জুন তঞ্চঙ্গ্যাকে (৪৭) মুনলোয়ামপাড়া সেনাক্যাম্পে গিয়ে একটি ছাগল ও একটি গয়াল দিয়ে আসতে হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১০ আগস্ট ২০১৯ সকালের দিকে মুনলোয়াম পাড়া সেনাক্যাম্পে একটি হেলিকপ্টার আসে। এরপর গত ১১ আগস্ট ২০১৯ বিকাল বেলায় সেখান থেকে রুমা সেনা গ্যারিসনের মেজর সাইফুল্লাহ'র নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য বড়থলি ইউনিয়নের টাইগার পাড়ায় যায়। এরপর সেনাদলটি টাইগার পাড়ার বাসিন্দা এবং জনসংহতি সমিতির বড়থলি ইউনিয়ন কমিটির সহ-সভাপতি জীবন তঞ্চঙ্গ্যার বাড়িতে যায়। 'টাইগার পাড়ায় নাকি জনসংহতি সমিতি ও এএলপি'র মধ্যে বৈঠক হবে এবং এ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করছে জীবন তঞ্চঙ্গ্যা' এই অভিযোগ তুলে মেজর সাইফুল্লাহ জীবন তঞ্চঙ্গ্যাকে বৈঠকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে। মেজর সাইফুল্লাহ জীবন তঞ্চঙ্গ্যার নিকট ছাগল পাওয়া যাবে কিনা সেই খোঁজখবরও নেয়। এরপর সেনাসদস্যরা জীবনের বাড়ি থেকে চলে আসে, তবে ঐদিন টাইপাড়ায় অবস্থান করে।

পরদিন ১২ আগস্ট ২০১৯ সকালে মেজর সাইফুল্লাহ বাড়িতে জীবন তঞ্চঙ্গ্যাকে খোঁজ করতে গিয়ে না পেয়ে জীবনের স্ত্রীর কাছে জানতে চান। জীবনের স্ত্রী মেজরকে সোজা জানিয়ে দেন যে, 'আপনাদের ভয়ে তো তিনি পালিয়ে গেছেন।' এরপর মেজর সাইফুল্লাহ জীবনের স্ত্রীকে এবং সেখানে থেকে ফেরার সময় গ্রামের কার্বারি উরান্যা তঞ্চঙ্গ্যাকে (৬৫) জীবনকে বাংলাদেশে থাকতে হলে একটা ছাগল ও একটা গয়াল সেনাক্যাম্পে দিয়ে আসতে হবে বলে জানিয়ে আসে।

সেনা ও বিজিবি কর্তৃক সুবলং-এর কাট্টলি বাজার থেকে ৪ নিরীহ জুম্মকে গ্রেফতার

গত ১৫ আগস্ট ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং সেনাক্যাম্পের সেনাবাহিনী ও লংগদু উপজেলার রাজানগর বিজিবি জোনের বিজিবি সদস্যদের যৌথ একটি দল বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের কাট্টলি বাজার হতে চার নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হল- সুনীল চাকমা (৩৫) পীং-শান্তি কুমার চাকমা; হিমেল চাকমা (৩৩) পীং-ধর্ম চন্দ্র চাকমা; আপন চাকমা (৩০) পীং-ভাগ্যচন্দ্র চাকমা; এবং সাধন চাকমা (২৭) পীং-ধর্ম চন্দ্র চাকমা, সর্বসাং- রাধামন পাড়া, কাত্তলি বাজার এলাকা।

জানা গেছে, মোঃ ইউসুফ নামের এক গাছ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অগ্রিম কিছু টাকা নিয়ে উক্ত চার ব্যক্তি বেশ কিছু সেগুন গাছ কাট্টলি বাজারে এনে জড়ো করে। কথা ছিল, পরিমাণমত সব গাছ সংগ্রহ হয়ে গেলে গাছের মূল্যের অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করে তবেই মোঃ ইউসুফ কাট্টলি বাজার থেকে ঐ গাছ নিয়ে যাবেন। কিন্তু মোঃ ইউসুফ উক্ত চার ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ বা লেনদেন শেষ না করেই উক্ত গাছ নিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়। বিষয়টি জানতে পারলে উক্ত চার ব্যক্তি তাদের দ্বারা সংগৃহীত গাছের বোটটি নিয়ে যেতে মোঃ ইউসুফকে বাধা প্রদান করে। এতে মোঃ ইউসুফ উক্ত সেনা ও বিজিবি

কর্তৃপক্ষকে মিথ্যাভাবে খবর দেয় যে, চাঁদাবাজরা তার সেগুন কাঠ আটক করেছে। এর পর পরই কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই উক্ত সেনা ও বিজিবি সদস্যরা উক্ত চার গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে এবং তাদেরকে জনসংহতি সমিতির চাঁদাবাজ হিসেবে সাজিয়ে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নগেন্দ্র চাকমার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গ্রেফতারের এই ঘটনাকে কতিপয় অনলাইন পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে 'জেএসএস (সন্তু লারমা গ্রুপ)'-এর ৪ সশস্ত্র চাঁদাবাজ আটক' বলে উল্লেখ ও প্রচার করায় জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

বাঘাইছড়ির শিজকে সেনা অভিযান, বাড়ি তল্লাশী ও হয়রানি

গত ১৭ আগস্ট ২০১৯ সকাল আনুমানিক ৯:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের সিজক সেনাক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মোঃ খালিদ ও ওয়ারেন্ট অফিসার হাসনাত এর নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য ইউনিয়নের সিজক পাড়ায় এক তল্লাশী অভিযান চালায়। এসময় সেনাসদস্যরা প্রদীপ চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। কিন্তু এসময় তাদের কেউই বাড়িতে ছিল না। সেনাসদস্যরা দরজা ভেঙেই বাড়িতে প্রবেশ করে। এসময় সেনাসদস্যরা সার্বোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সুভাষ কুসুম চাকমাকে বাড়ির মালিককে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়, না হলে তাকে কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে বলে জানায়।

রাজস্থলীতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ তিন গ্রামবাসী আটক

গত ১৮ আগস্ট ২০১৯ বিকেল বেলা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার রাজস্থলী সেনা সাবজোনের একদল সেনাসদস্য উপজেলার পইতু পাড়া থেকে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ তিন নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করেছে। আটককৃতরা হলেন- উ দামা ভিক্ষু (২৫), মংসা অং মারমা (৪৮) পীং-মৃত সুইচাই উ মারমা ও ছো অং মারমা (৩৩)। উল্লেখ্য যে, গত ১৮ আগস্ট ২০১৯ রাজস্থলীতে আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) কর্তৃক সেনাবাহিনীর উপর বন্দুক হামলার পরপরই সেনাবাহিনী রাঙ্গামাটি জেলার জুম্ম এলাকাসমূহে চিরুণী অভিযান জোরদার করে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, সেনাবাহিনী কর্তৃক এএলপি'র বিরুদ্ধে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বরং এই বন্দুকযুদ্ধ ঘটনাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় জুম্ম গ্রামে সেনা অভিযান চালিয়ে বাড়িতে তল্লাশী, বিনা ওয়ারেন্টে আটক, মিথ্যা মামলা দায়ের, অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাঘাইছড়ির সার্বোয়াতলীতে তিন জেএসএস সদস্যের বাড়ি তল্লাশী

গত ১৮ আগস্ট ২০১৯ বিকাল আনুমানিক ৩:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের সিজক সেনাক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য সিজক এলাকার বাসিন্দা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ত্রিদীপ চাকমা, জুপিটার চাকমা বাপ্পী ও নয়ন চাকমার বাড়িতে তল্লাশী চালায়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীকে মারধর এবং জুম্ম দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ

গত ১৮ আগস্ট ২০১৯ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল সেনাসদস্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার মহালছড়ি বাজারে আসা পার্শ্ববর্তী জুম্ম গ্রামবাসীদের অমানবিকভাবে মারধর করে এবং মহালছড়ি বাজারস্থ জুম্ম দোকানদারদের সকল দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। এছাড়া সেনাবাহিনী নিকটবর্তী বড়ানালা, মহালছড়ি কলেজগেইট, লেমুছড়ি এলাকায়ও জুম্মদের দোকান বন্ধ রাখতে বাধ্য করে।

বাঘাইছড়ির খেদারমারা ও সার্বোয়াতলীতে সেনা অভিযান, দুই নিরীহ জুম্মকে আটক

গত ১৮ আগস্ট ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের সিজক সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য উপজেলার খেদারমারা ইউনিয়নের খেদারমারা এলাকায় ও সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের চিন্তারাম ছড়া এলাকায় সামরিক অভিযান চালিয়ে দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক করে। আটকৃতরা হলেন- (১) শৈলাস চাকমা ওরফে বাবু মেকার (৫০) পীং- সুশীল চাকমা, সাং- পশ্চিম খোদারমারা ও (২) পরেশ্বর চাকমা ওরফে রাঙাধন (৩৮) পীং- একলব্যো চাকমা, সাং- চিন্তারাম ছড়া। ক্যাম্পে আটক রেখে নির্যাতন করার পরদিন ১৯ আগস্ট ২০১৯ আটককৃতদের বাঘাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

লংগদুতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্মকে আটক ও হয়রানির পর মুক্তি

গত ১৯ আগস্ট ২০১৯ বেলা আনুমানিক ১১:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার লংগদু সেনা সাব-জোনের একদল সেনাসদস্য লংগদু ইউনিয়নের রাধামন বাজার হতে সুপর্ণ জীবন চাকমা পীং- প্রভাত কুমার চাকমা নামের নিরীহ এক জুম্মকে আটক করে। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা আটক রেখে হয়রানি করার পর ঐদিন বিকেলের দিকে সুপর্ণ জীবন চাকমাকে ছেড়ে দেয় সেনাবাহিনী।

লংগদুতে সেনাবাহিনী কর্তৃক মিথ্যা মামলায় এক জুম্মকে গ্রেফতার, নির্যাতন

গত ১৯ আগস্ট ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার লংগদু সেনা সাব-জোনের একদল সেনাসদস্য লংগদু ইউনিয়নের গোলাছড়ি গ্রাম হতে দেব বিকাশ চাকমা (৩৮) পীং-অশোক কুমার চাকমা নামের এক নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। সেনাবাহিনী গ্রেফতারের পর দেব বিকাশ চাকমাকে অমানবিক নির্যাতন করে মারাত্মকভাবে আহত করে। একই দিন বিকেলে গুরুতর জখম অবস্থায় সেনাসদস্যরা দেব বিকাশ চাকমাকে লংগদু থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে এবং ৮ নভেম্বর ২০১৮ সংঘটিত এক হত্যা ঘটনার সাথে মিথ্যাভাবে জড়িত করে জেলে পাঠানো হয়।

বরকলের সুবলঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম বাড়িতে তল্লাশি ও জিনিসপত্র তছনছ

গত ২০ আগস্ট ২০১৯ দুপুর আনুমানিক ১:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের সুবলং সেনাক্যাম্পের ২০ বেঙ্গলের কমান্ডার ক্যাপ্টেন হাবিবের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য সুবলঙের বিলছড়া গ্রামে তল্লাশী অভিযান চালায়। অভিযানের সময় সেনা সদস্যরা সাধন বিকাশ চাকমা ও ইতিময় চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং বাড়ির মালিক কেউ বাড়িতে না থাকলেও দরজা ভেঙে বাড়িতে প্রবেশ করে। সেনাসদস্যরা সাধন বিকাশ চাকমার বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং বাড়ি হতে জাতীয় পরিচয়পত্র, একটি মোবাইল সেট, পিনোন-খাদি সেট, চাকরির দলিলপত্র, স্কুলের অষ্টম শ্রেণির সনদ, রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে যায়। অপরদিকে ইতিময় চাকমার বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করে দেয় সেনাসদস্যরা।

বরকলের সুবলঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম বাড়ি তল্লাশি

গত ২১ আগস্ট ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের সুবলং সেনাক্যাম্পের ২০ বেঙ্গলের কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন হাবিবের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য বাঘাছোলা গ্রামের ছোটন চাকমার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়।

খাগড়াছড়িতে উদয়ন ত্রিপুরার পিতার বাড়িতে সেনাতল্লাশি

গত ২২ আগস্ট ২০১৯ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য খাগড়াছড়ি পৌরসভার মিলনপুর এলাকাস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরার পিতার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেনাসদস্যরা বাড়ির লোকদের কাছ থেকে উদয়ন ত্রিপুরা কোথায় থাকে জানতে চাইলে জবাবে উদয়ন ত্রিপুরার মাতা জানান যে, ২০ বছর ধরে উদয়নের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাই তারা উদয়ন ত্রিপুরা কোথায় ও কী করে তা জানেন না বলে উত্তর দেন।

বাঘাইছড়ির সাজেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্মকে গুলি করে হত্যা

গত ২৩ আগস্ট ২০১৯ সকাল আনুমানিক ১০:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট সেনা জোনের ১২ বীর বেঙ্গলের একদল সেনাসদস্যের গুলিতে নিহত হয়েছেন সাজেক ইউনিয়নের কেরেটকাবা এলাকার বাসিন্দা শান্তিময় চাকমা। জানা গেছে, ঐদিন সকাল বেলা, শান্তিময় চাকমাসহ এলাকার তিন যুবক কেরেটকাবা এলাকার তিন-দোপধা নামক স্থানে এক দোকানের সামনে বসেছিল। ঐসময় হঠাৎ সেখানে সেনাবাহিনীর দলটি উপস্থিত হয়ে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। এসময় ভয়ে শান্তিময় চাকমা পালানোর চেষ্টা করলে সেনাসদস্যরা তাকে তাড়া করে। এতে সেনাসদস্যরা গুলি করলে শান্তিময় চাকমা আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যায়। এরপর সেনাসদস্যরা আহত শান্তিময় চাকমাকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং গুলি করে হত্যা করে। পরে সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে সশস্ত্র দুস্কৃতকারীদের সাথে সংঘটিত গোলাগুলিতে শান্তিময় চাকমা নিহত হয়েছে এবং নিহতের সাথে দুটি দেশীয় পিস্তল পাওয়া গেছে বলে দাবি করে।

দীঘিনালায় সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন জুম্মকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন, পরে গুলি করে হত্যা

গত ২৬ আগস্ট ২০১৯ ভোর রাত আনুমানিক ২:০০ টায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার দীঘিনালা সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য উপজেলার কবাখালি ইউনিয়নের কৃপাপুর গ্রামস্থ শান্তিময় চাকমা ওরফে সুমনের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এসময় সেনাসদস্যরা শান্তিময় চাকমার বাড়িতে অবস্থানরত তিন গ্রামবাসী– নবীন জ্যোতি চাকমা (৩২) পীং-ধন্যাসেন চাকমা; ভুজেন্দ্র চাকমা (৫০) পীং-টুংগ্যরাম চাকমা ও রুসিল চাকমাকে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে সেনাসদস্যরা তিন গ্রামবাসীকে ব্যাপক নির্যাতন চালায় বলে জানা যায়। তার পরদিন (২৭ আগস্ট) দুপুর ১২:০০ টার দিকে সেনাসদস্যরা গ্রেফতারকৃত তিন গ্রামবাসীকে দীঘিনালার বিনন্দচুক ভাবনা কেন্দ্র (বৌদ্ধ ভাবনা কেন্দ্র) এর নিকটবর্তী জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং সেখানেই এক পর্যায়ে গুলি করে হত্যা করে। সেনাসদস্যরা মৃতব্যক্তিদের সাথে দুটি অস্ত্রও রেখে দেয়। এরপর সেনাসদস্যরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দাবি করে যে, সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সাথে গুলি বিনিময়ের সময় ঐ তিন ব্যক্তি মারা গেছে।

রাঙ্গামাটির বন্দুকভাঙায় সেনাবাহিনী কর্তৃক এক বিধবা জুম্ম নারীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

গত ২৮ আগস্ট ২০১৯ মধ্যরাত প্রায় ১২:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বন্দুকভাঙা ইউনিয়নের বামে তিবিরেছড়ি গ্রামে সেনাবাহিনীর একদল সদস্য এক বিধবা জুম্ম নারীর (৩৫) বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জামিনে মুক্তি পেয়েও বান্দরবানের জেল গেইট থেকে চসাথোয়াই মারমাকে পুনঃগ্রেফতার

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে বান্দরবান জেল গেইট থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই

বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন থানচি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির থানচি থানা কমিটির সভাপতি চসাথোয়াই মারমাকে আবারও গ্রেফতার করে বান্দরবান থানা পুলিশ। গ্রেফতারের সাথে সাথেই পুলিশ চসা থোয়াই মারমাকে অন্য একটি মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করে। উল্লেখ্য, এর পূর্বে আগস্ট মাসে ক্যচিং থোয়াই মারমার হত্যার সাথে মিথ্যাভাবে জড়িত করে চসা থোয়াই মারমাকে গ্রেফতার করা হয়।

লংগদুতে সেনাবাহিনীর তল্লাশী অভিযান ও হয়রানি

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দুপুর আনুমানিক ১:০০ টার দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার বামে লংগদু সাব-জোনের কমান্ডার ক্যাপ্টেন আশিক এর নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য উপজেলার বগাচদর ইউনিয়নের বৈরাগি বাজার ও চিবারেগা এলাকায় এক তল্লাশী অভিযান চালায়। এসময় ক্যাপ্টেন আশিক অনেক নিরীহ গ্রামবাসীকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে হয়রানি করে এবং সেখানে যদি কোন সন্ত্রাসী আসে সেনাবাহিনীকে খবর দেয়ার নির্দেশ দেয়। ক্যাপ্টেন আশিক আরও বলেন, গ্রামবাসীরা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় এবং তাকে যদি দ্বিতীয়বার আসতে হয়, তাহলে তিনি অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান। প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, তল্লাশীর সময় সেনাবাহিনীর সাথে সংস্কারপন্থী এক সদস্যও উপস্থিত ছিল।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম কৃষিপণ্য বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের বোট চলাচলে বাধা

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার সুবলং সেনা ক্যাম্প ও জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের সেনাসদস্যরা উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত জুম্ম কৃষিপণ্য বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের রাঙ্গামাটি শহরগামী বোটগুলো আটকে রাখে। সেনাবাহিনী এই বোটগুলো ততক্ষণই আটকে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংস্কারপন্থী চাঁদাবাজরা এই জুম্ম কৃষিপণ্য বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের অবৈধ চাঁদা আদায় শেষ করে।

জামিনে জেল থেকে মুক্তির পূর্বেই আবার আটক জেএসএসের সায়ামং ও খ্যাইসা অং

উচ্চ আদালতের রায়ে জামিনে মুক্তি পাওয়ার আগেই গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরের রাঙ্গামাটি জেল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালি ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও রাইখালি

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সায়ামং মারমা এবং সমিতির কাপ্তাই থানা কমিটির সদস্য ও চিৎমরম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খ্যাইসা অং মারমাকে আবার আটক করে কোতোয়ালী থানায় নিয়ে যায় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। এর পরের দিন ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তাদেরকে মিথ্যাভাবে নানিয়ারচর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শক্তিমান চাকমা হত্যার ঘটনার সাথে জড়িত করে গ্রেফতার দেখানো হয় এবং ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাঙ্গামাটির চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। উল্লেখ্য যে, হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন অনুযায়ী, গত ১৫ মে ২০১৯ আদালতে উপস্থিত হলে, এডিশনাল চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত কর্তৃক তাদেরকে জেলে প্রেরণ করা হয়।

কাউখালির ঘাগড়া হতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই জুম্ম গ্রামবাসী আটক

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মধ্যরাত আনুমানিক ২টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাউখালি উপজেলার ঘাগড়া সেনা সাব-জোনের একদল সেনাসদস্য ঘাগড়া ইউনিয়নের বাদলছড়ি গ্রাম হতে সুজন চাকমা (৩৫) পীং-লক্ষীধন চাকমা ও রসমনি চাকমা (৩৬) পীং-ধন চাকমা নামে দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে ঘুম থেকে তুলে আটক করে নিয়ে যায়। সুজন চাকমা ভাড়াটে মোটর সাইকেল চালিয়ে এবং রসমনি চাকমা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে বলে জানা যায়। তাদেরকে পুলিশে হস্তান্তরের পর আদালত জেলে প্রেরণ করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তারা এখনো জেল থেকে ছাড়া পাননি।

বাঘাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক নিরীহ জুম্ম ব্যবসায়ী গ্রেফতার

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার মাইনী সেনা জোনের দুর্ভেদ্য ২১ বেঙ্গলের একদল সেনাসদস্য বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের উত্তর সার্বোয়াতলী গ্রামের বাসিন্দা নিরীহ জুম্ম ব্যবসায়ী রিন্টু চাকমা (৩৯) পীং-তেজেন্দ্র চাকমাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। এসময় সেনাসদস্যরা তেজেন্দ্র চাকমার বাড়ির আসবাবপত্র তছনছ করে দেয়। আটক করে নিয়ে যাওয়ার পর সেনাসদস্যরা রিন্টু চাকমাকে জনসংহতি সমিতির সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়ে বাঘাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

রাঙ্গামাটির রাজদ্বীপে জেএসএস সদস্যের বাড়িতে সেনা-পুলিশের তল্লাশী

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সকাল আনুমানিক ৮টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার রাঙ্গামাটি পৌর এলাকাধীন রাজদ্বীপ এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ফরেন চাকমা (৩৫)-এর বাড়িতে তল্লাশী অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের একদল সদস্য। এসময় সেনা ও পুলিশ সদস্যরা মাদক বিরোধী অভিযানের নামে অনেক এলাকাবাসীকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও ঘরবাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে।

লংগদুর জুম্ম গ্রামে সেনা ও সেটেলারদের সদলবলে প্রবেশ ও জায়গা দখলের হুমকি

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সকাল ১০:৩০ টার দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার বামে লংগদু সেনা সাব-জোনের কমান্ডার ক্যাপ্টেন আশিক এর নেতৃত্বে ২০/২২ জনের সেনাবাহিনীর একটি দল এবং ভাইবোনছড়া এলাকার ৬/৭টি ইঞ্জিন চালিত বোট যোগে কমপক্ষে ১৫০/১৬০ জন সেটেলার বাঙালিদের একটি দল যৌথভাবে ৭নং লংগদু ইউনিয়নের কাট্টলী এলাকায় আদিবাসীদের গ্রামে প্রবেশ করে। এসময় তারা প্রায় দুইঘন্টা যাবৎ ছোট কাট্টলী, বড় কাট্টলী, হাইস্কুল পাড়া, রাধামন বাজার এলাকায় কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিচরণ করে এবং সেখানকার যুগ যুগ ধরে স্থায়ীভাবে বসবাসরত আদিবাসী জুম্মদেরকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে হুমকি দেয়। উল্লেখিত এলাকাসমূহ তাদের বাঙালিদের জায়গা বলে দাবি করে এবং অতি শীঘ্রই সেটেলার বাঙালিরা তাদের জায়গায় বসতি স্থাপন করবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়।

বাঘাইছড়ির মেদিনীপুরের ৭ জন গ্রামবাসীকে ক্যাম্পে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

গত ৬ অক্টোবর ২০১৯ সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকায় দুরছড়ি ক্যাম্পের একদল সেনা বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলি ইউনিয়নের মেদিনীপুর খাগড়াছড়ি থেকে নিরীহ সাতজন গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ ও

হয়রানির পর রাত ৭:৩০ টার দিকে সেনারা আটককৃত গ্রামবাসীদেরকে ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেয়। ঘটনার শিকার গ্রামবাসীরা হলেন- সুদৃষ্টি চাকমা (শুক্রমনি) (২৬) পীং জগদীশ চন্দ্র চাকমা; কানন মুনি চাকমা (৩১), পীং রূপায়ণ চাকমা; বিবেক চাকমা (কলিন) (২৭), পীং সুরেশ চন্দ্র চাকমা; অভিষেক চাকমা (হালাক্কো) (২১), পীং সুনীল কান্তি চাকমা; প্রিবেল চাকমা (বেল্যে) (২৩) পীং মৃত জ্যোতিলেশ্বর চাকমা; জুগেশ চাকমা (৩২), সাং- দীঘিনালা ভাঙব্রীজ; এবং সুজয় চাকমা (সুমেন) (৩২) পীং নতুন চন্দ্র চাকমা।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই জুম্মকে গ্রেফতার

গত ৭ অক্টোবর ২০১৯ সেনা সদস্যরা রাঙ্গামাটি পৌরসভার ভেদভেদী এলাকা থেকে রূপায়ণ চাকমা (৪৮) নামে একজনকে এবং রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা বাদলছড়ি এলাকা থেকে পরশ চাকমা (৩৪) নামে আরেকজনকে আটক করেছে। রূপায়ণ চাকমাকে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্য হিসেবে সাজানো হয়। রূপায়ণ চাকমা রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলার সাপমারা গ্রামের যতীন্দ্র চাকমা ধেঙার ছেলে এবং পরশ চাকমা বাদলছড়ি গ্রামের আনন্দ সাগর চাকমার ছেলে বলে জানা গেছে। পরে সেনাবাহিনী রূপায়ণ চাকমাকে রাঙ্গামাটির কোতোয়ালী থানায় এবং পরশ চাকমাকে নানিয়ারচর থানায় সোপর্দ করে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে বিজিবি'র গুলিতে দুই আদিবাসী তঞ্চঙ্গ্যা নিহত

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৯ বিকাল আনুমানিক ৩:০০ টায় বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের ফাত্রাঝিরি এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যদের গুলিতে নিহত হয়েছেন দুই তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসী। নিহত ব্যক্তিরা হলেন মংখিছা তঞ্চঙ্গ্যা (৬০) ও অংচাই মং তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫)। জানা গেছে, হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি বাহ্যত নির্বাচনী সহিংসতা হিসেবে মনে করা হলেও, অভিযোগ রয়েছে যে, ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৮নং ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য একমাত্র আদিবাসী প্রার্থী বাবুল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা'র বিজয় বানচাল করার লক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ব্যতিরেকে বিজিবি কর্তৃক অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহারের কারণেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ১৪ অক্টোবর ২০১৯ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি সদর, সোনাইছড়ি ও ঘুমধুম এই তিনটি ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের সদস্য পদের জন্য আহমদ আলী নামে বাঙালি সম্প্রদায় থেকে একজন এবং বাবুল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা নামে আদিবাসী সম্প্রদায় হতে একজন এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, নির্বাচনের দিন সকাল ১০:০০ টার পর স্থানীয় বাঙালি ও রোহিঙ্গা লোকদের কর্তৃক জাল ভোট প্রদানের অভিযোগের বিষয়ে ফাত্রাঝিরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সম্মুখে ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের

প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সদস্য প্রার্থীর সমর্থকগণ এক উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা জড়িয়ে পড়েন। এই সময় বাবুল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার সমর্থকগণ আহমদ আলীর পক্ষে জাল ভোট প্রদানের চেষ্টার সময় কয়েকজন রোহিঙ্গাকে হাতেনাতে ধরেন। ধরা পড়া ঐ রোহিঙ্গাদের পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এরপর বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ভোটপ্রদান অব্যাহত থাকে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘটনার জের শুরু হয় বিকাল ৩:০০ টার দিকে প্রার্থী আহমদ আলী'র বাঙালি সমর্থকরা যখন ফাত্রাঝিরি পাড়ায় বাবুল কান্তি'র বাড়ির উঠানে শান্তিপূর্ণভাবে বসে থাকা তার সমর্থকদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই সময়ই সেখানে নির্বাচনী দায়িত্বে মোতায়েনকৃত বিজিবি সদস্যরা মুখোমুখী দুই দলকে সরিয়ে দেয়া ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার নামে গুলি চালায়। এতে গুলিতে মংখিছা তঞ্চঙ্গ্যা ঘটনাস্থলেই নিহত হন, অপরদিকে অংচাই মং তঞ্চঙ্গ্যা গুলিবিদ্ধ হয়ে জখম হন। আহত অংচাই মং তঞ্চঙ্গ্যাকে দ্রুত কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলেও বিকাল ৪:৩০ টার দিকে ডাক্তারগণ তাকেও মৃত ঘোষণা করেন।

অভিযোগ রয়েছে যে, আক্রমণকারী বাঙালিদের সরিয়ে দিতে বিজিবি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং বিজিবি সদস্যরা যে সকল তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসী কেবল আক্রমণকারী বাঙালিদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিল তাদের উপরই গুলি বর্ষণ করে। এসময় ঘটনাস্থলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিল না এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়াই বিজিবি সদস্যরা গুলি চালায়। স্থানীয় আদিবাসী জনগণ অভিযোগ করেছেন যে, সেখানে এমন কোন সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি যাতে বিজিবি সদস্যরা গুলি চালাতে বাধ্য হতে পারেন। এটা বিজিবি সদস্যদের অতিরিক্ত ক্ষমতার ব্যবহার ছাড়া কিছু নয় এবং আদিবাসী জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘন করা সহজ বিধায় এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বাঘাইছড়িতে নতুন ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা

সম্প্রতি পার্বত্য চুক্তিকে তোয়াক্কা না করে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার মুসলিম ব্লকের ফকিরা টিলা নামক একটি জায়গায় বাঘাইহাট সেনা জোনের অধীন সেনাবাহিনীর ১২ বীর-এর একটি দল আরও একটি নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গত ২১ অক্টোবর ২০১৯ সেনাবাহিনীর উক্ত দলটি তাবু টাঙিয়ে ফকিরা টিলায় অবস্থান শুরু করে এবং এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সেখানেই তারা অবস্থান করে। ক্যাম্প স্থাপনের জন্য সেনা সদস্যরা ইতিমধ্যে গাছ-বাঁশ সংগ্রহ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। ফলে জায়গার চারজন মালিকসহ সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। জায়গার মালিকরা হলেন- (১) মঙ্গল কুমার চাকমা, পিতা-মৃত রোগ মোহন চাকমা, জায়গার হোল্ডিং নং-৭০/জি, খতিয়ান নং-১৮২, জরিপের দাগ-১৩৮২, ভূমির পরিমাণ-২.৩৮ একর, জায়গার ওয়ারিশ- ঊষা রঞ্জন চাকমা ও অনিমেষ চাকমা, ক্রয়সূত্রে বর্তমান মালিক- কালাধন চাকমা; (২) মৃগেন্দ্র লাল চাকমা, পিতা- মৃত গুলমনি চাকমা, হোল্ডিং নং-১২৬/আরজি, খতিয়ান নং-১৯৬/জি, জরিপের দাগ-১৩৮২, ভূমির পরিমাণ- ২.৫৭ একর, জায়গার ওয়ারিশ- বৃঘুরাম চাকমা, দয়ারাম চাকমা ও পূর্ণ কুমার চাকমা; (৩) নিরোধ রঞ্জন চাকমা, পিতা- মৃত স্বর্বানন্দ চাকমা, হোল্ডিং নং-৬৯/জি, খতিয়ান নং-১৩৪, জরিপের দাগ-১৩৮০, ভূমির পরিমাণ- ১.৯৮ একর, জায়গার ওয়ারিশ- আলো জ্যোতি চাকমা ও দীপ্ত কান্তি চাকমা; (৪) মৃত চন্দ্র কুমার চাকমা, হোল্ডিং নং-৭১/জি, খতিয়ান নং- ৯৩/জি, জরিপের দাগ-১৩৮৩, ভূমির পরিমাণ- ২.৪০ একর, ওয়ারিশ- ধর্মরাম চাকমা ও ধন চাকমা, ক্রয়সূত্রে বর্তমান মালিক রহমত উল্লাহ।

একজন রঙমিস্ত্রী জুম্মকে শিজক ক্যাম্পের চেকপোস্টে হয়রানি

গত ২২ অক্টোবর ২০১৯ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকার সময় বাঘাইছড়ি উপজেলার সার্বোয়াতলী ইউনিয়নাধীন শিজকমুখ বৌদ্ধ বিহারের জায়গায় স্থাপিত অস্থায়ী শিজক সেনা ক্যাম্পের চেকপোস্টে পার্শ্ববর্তী দোকান থেকে বাড়িতে ফেরার সময় সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের কলেজ পাড়ার অধিবাসী নাগচ্য চাকমা (৪০ বৎসর), পিতা- শুক্রচার্য চাকমাকে আটক করে। সেখানে সেনা সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানি করে। একপর্যায়ে সেনা সদস্যরা নাগচ্য চাকমার মুখে তেল মাখিয়ে দেয় ও মাথা ঝাকিয়ে দেয় এবং সাথে সাথে নাগচ্য অস্বস্তিবোধ করতে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরপর আনুমানিক রাত ৮:৩০ টার দিকে সেনা সদস্যরা কলেজ পাড়া ব্রিজে নাগচ্যকে একলা ছেড়ে দিয়ে যায়। মাথা ঝালাপালা অবস্থায় কোন রকমে তিনি বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেন এবং সাথে সাথে ঘুমে লুটিয়ে পড়েন। তিনি পেশায় একজন রঙমিস্ত্রী বলে জানা গেছে।

সংস্কারপন্থী ও এএলপি সন্ত্রাসীদের তৎপরতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করা, আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে দুর্বল করা, সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্র অবাধে বাস্তবায়নের হীনলক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী একদিকে সংস্কারপন্থী খ্যাত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে, অন্যদিকে 'আরাকান লিবারেশন পার্টি' (এএলপি) নামক প্রতিবেশী মিয়ানমারের সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে লেলিয়ে দিয়ে বোমাং সার্কেলে (বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি কিয়দংশ) ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে।

২০০৭-২০০৮ সালে দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালে বিরাজনীতিকরণের অংশ হিসেবে তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্কারের নামে সেনাবাহিনী সারা দেশের মতো জনসংহতি সমিতির কতিপয় উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থান্বেষী নেতৃস্থানীয় সদস্যের নিয়ে সংস্কারপন্থী নামে একটি তাবেদারী গোষ্ঠী গড়ে তোলে। তখন থেকেই সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনী ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজিসহ পার্বত্য চুক্তি বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে আসছে। তারই অংশ হিসেবে ২০১৮ সালের অক্টোবরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে সেনাবাহিনী, পুলিশ, ক্ষমতাসীন মহল ও প্রশাসন প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান করে তাতিন্দ্র লাল ও সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে বাঘাইছড়ি, লংগদু, নান্যাচর ও কাপ্তাই উপজেলার কতিপয় স্থানে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে রিজার্ভ বাজার ও বরকলের সুবলঙে নিরাপত্তা প্রহরায় নিয়ে এসে চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মালবাহী ও যাত্রীবাহী যানবাহন তল্লাসী, জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের উপর হামলা ইত্যাদি অবাধে চালিয়ে এসব এলাকায় এক সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম করে। বিশেষ করে গত ১৪ মে ২০১৯ দীঘিনালা থেকে সেনাবাহিনীর প্রহরায় লংগদু হয়ে সুবলঙে অস্ত্র-শস্ত্রসহ ১৪ জন সংস্কারপন্থী সদস্যদের নিয়ে আসার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সুবলং আর্মি ক্যাম্পের প্রত্যক্ষ সহায়তায় নিকটস্থ সুবলং বাজারে অবস্থান নিয়ে সংস্কারপন্থী সদস্যরা অবাধে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এলাকার জনজীবনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ফেলে।

অপরদিকে বিদেশী সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি), যারা স্থানীয় মারমা জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও সহানুভূতি লাভের লক্ষ্যে বান্দরবান জেলা এবং রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলায় নিজেদেরকে 'মগ পার্টি' নামে পরিচয় দিয়ে থাকে, তারা এসব এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ আশ্রয়-প্রশ্রয়ে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি করে চলেছে। বিশেষ করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতাসীন প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানে এলাকাবাসীকে বাধ্য করার হীনলক্ষ্যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা, রোয়াংছড়ি ও রুমা উপজেলায় এবং রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলায় এএলপি সশস্ত্র দলকে লেলিয়ে দেয়। তখন থেকেই এই এএলপি সন্ত্রাসীরা জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থক এবং সাধারণ জনগণের উপর খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি, হুমকি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এএলপি কর্তৃক এ বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনায় জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠন এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে অন্তত ১৩ জন খুন, ১ জনকে গুলি করে জখম, ১১ জন অপহরণ, ৫ জন মারধর ও অন্তত ১৭ জন হত্যার হুমকির শিকার হয়েছেন।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সংস্কারপন্থী ও এএলপি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অবাধে একের পর এক হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেলেও নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে পক্ষান্তরে এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো কোন ঘটনা ঘটালেই সেসব ঘটনায় জড়িত করে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থক এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সোচ্চার ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, ঘরবাড়ি তল্লাসী, মারপিট ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে।

(ক) সংস্কারপন্থীর সন্ত্রাসী তৎপরতা

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকায় কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ডংনালা এলাকার উপরপাড়ায় ১৪/১৫ জন সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী জনসংহতি সমিতির বাঙ্গালহালিয়া ওয়ার্ড শাখার সদস্য ইছেমং মারমা ওরফে আপিমং এর বাড়ি হানা দেয়। সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে এবং ইছেমং মারমার স্ত্রীকে টানাহেঁচড়া করে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। আরো উল্লেখ্য যে, বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রাক্কালে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ রাত ১১.৩০ ঘটিকায় সংস্কারপন্থী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের যোগসাজশে বাঙালহালিয়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনা রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া

বাজার সংলগ্ন ডাকবাংলা গ্রামে জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী থানা শাখার কৃষি বিষয়ক সম্পাদক থুইহ্লা মারমার বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সকাল ১০ ঘটিকায় রাজস্থলী উপজেলায় জনসংহতি সমিতির বাঙালহালিয়া ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ক্যশৈপ্রু মারমাকে (৪৮) সংস্কারপন্থী ৬/৭ জন সন্ত্রাসীরা বাড়িতে গিয়ে হত্যার হুমকি ও ৪ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। এসময়ে ক্যশৈপ্রু মারমা বাড়িতে ছিল না। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের সাথে দরকষাকষির এক পর্যায়ে ৩ লক্ষ টাকা প্রদানে বাধ্য হয়।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সোমবার দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় রাজস্থলী উপজেলার ৩নং বাঙ্গালহালিয়ায় সংস্কারপন্থী, ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক জনসংহতি সমিতির কার্যালয় ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়। সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী পুলক চাকমার নেতৃত্বে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক-এর ১৫/২০ জন সন্ত্রাসী জনসংহতি সমিতি বাঙ্গালহালিয়া ইউপি শাখা কার্যালয়ের তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে আসবাবপত্র ভাংচুর ও এম এন লারমা'র ফটো তছনছ করে এবং অফিসের কাগজপত্রসহ দু'টি সিলিং ফ্যান লুঠ করে নিয়ে যায়।

গত ৩ মার্চ ২০১৯ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় রাজস্থলী বাজারের মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন ফারুয়া স্টেশনের একটি দোকানে যুব সমিতি ১নং ঘিলাছড়ি ইউপি শাখার সহ-সভাপতি শান্ত লাল তঞ্চঙ্গ্যাকে লক্ষ্য করে সংস্কারপন্থীদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী সেটেলার বাঙালিরা চারটি গুলি ছোঁড়ে। গুলিটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। জানা যায়, হামলাকারী মো: আনোয়ার রাজস্থলী উপজেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক ও তাতিন্দ্র-সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের রাজস্থলী উপজেলার চীফ কালেক্টর এবং অপরজন মো: আলী মিয়া পোষ্ট কালেক্টর হিসেবে নিয়োজিত।

গত ১৪ মে ২০১৯ থেকে সংস্কারপন্থীরা সুবলং এলাকায় আসার পর পর সেখানে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। তারা ১৫ মে সুবলং বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে এক মিটিং করার সময় সংস্কারপন্থীদের সাথে একজন ডিজিএফআইয়ের লোক ছিল এবং ডিজিএফআইয়ের উক্ত লোকের উপস্থিতিতে সংস্কারপন্থীরা অস্ত্র সাথে রাখে। এসময় তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করে বলে জানা যায়।

সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সদস্যরা প্রতিদিন সুবলং আর্মি ক্যাম্পের অদূরে অবস্থিত 'সুবলং মাজার' সংলগ্ন ব্রিজে সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করে। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বোট থেকে চাঁদা আদায় ও ব্যবসায়ীদেরকে নানাভাবে হয়রানি ও জুলুম করে। গত ২০ মে তারিখে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সম্মেলনে যোগদান শেষে ফেরার সময় বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত পিসিপি কর্মীদের তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ, মানসিক নির্যাতন ও হয়রানি করা হয়।

গত ৩ জুন ২০১৯ সকাল ৯:৩০ ঘটিকার সময় আর্মি ও বিজিবিদের সহযোগিতায় সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সদস্যরা তিনটি বোট যোগে বেগেনাছড়ি গ্রামে যায় এবং উক্ত গ্রামের বাসিন্দা কিশোর কুমার চাকমাকে (৪৫) মারধর ও জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেদিন একজনকে ধরে নিয়ে যায়। তার পরদিন ৪ জুন ২০১৯ সংস্কারপন্থী সশস্ত্র দল হাজাছড়া গ্রামে গিয়ে প্রতি বাড়ি থেকে ২০০ টাকা চাঁদা দাবি করে। এছাড়াও প্রায়সময় শীলছড়ি, বাঘাছোলা, দেয়ানচর এলাকায় সেনাবাহিনী ও সংস্কারপন্থী সদস্যরা একসাথে রাতে তল্লাসী চালায় বলে জানা যায়।

গত ২৫ জুলাই ২০১৯ বিকাল ৫:০০ টার দিকে পরীক্ষা দিয়ে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে কাচালং কলেজের ছাত্র টিটন চাকমাকে বাঘাইছড়ি উপজেলা বাজারের চৌমুহনীর অনুপম লাইব্রেরি নামক দোকানের সামনে থেকে আগে থেকেই ঘাপতি মেরে থাকা ৭/৮ জন সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বাঘাইছড়ি-দীঘিনালা রোডের তিনকিলো নামক স্থানের দিকে তুলে নিয়ে যায়। রাতভর অমানুষিক নির্যাতনের পর ২৬ জুলাই দুপুর ১২:০০ টার দিকে মুমূর্ষ অবস্থায় টিটন চাকমাকে ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করার কারণে তার সারা শরীরে জখমের চিহ্ন, কালো দাগ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোস্কা দেখা দেয়।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাত আনুমানিক ১১:০০ টায় সংস্কারপন্থী সশস্ত্র একটি দল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের রাঙাপানি ছড়া এলাকার বাসিন্দা পুলিন চাকমা (৪২) পীং-মৃত থকশিরা চাকমা ও বিমল বিহারী চাকমা (৫০) পীং-মৃত ইন্দ্রসেন চাকমা নামের দুই গ্রামবাসীকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

গত ৩ অক্টোবর ২০১৯ সকালের দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরের বাজার এলাকা থেকে সংস্কারপন্থীদের হাতে ৫ নিরীহ গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হয়। জানা গেছে, মূলত চাঁদা ও মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে এই অপহরণ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। অপহৃতরা হলেন– (১) পূর্ণ কিশোর চাকমা, পীং-লালন বিহারী চাকমা, সাং-তলে বাঘাইছড়ি, ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউপি, (২) সত্য লাল চাকমা, পীং-মৃত যাত্রা মোহন চাকমা, (৩) সজীব চাকমা, পীং-কালীচরন চাকমা,সাং-মধ্যম বাঘাইছড়ি, ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন, (৪) কালা চিজি চাকমা, পীং-বেলা

চাকমা, সাং-উগলছড়ি,৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন ও (৫) বাবুল্যা চাকমা, পীং-মৃত ভারত চন্দ্র চাকমা, সাং-উত্তর শিজক, ৩০ নং সার্বোয়াতুলী ইউনিয়ন। জানা গেছে, অপহৃতদের মধ্যে পূর্ণ কিশোর চাকমা ও বাবুল্যা চাকমা ঐ দিনই বিকেলের দিকে এবং তারপর দিন অবশিষ্ট অপহৃতদের মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই অপহরণকারীদের দলে নেতৃত্ব দেয় অংশুমান চাকমা ও আপন চাকমা।

গত ৮ অক্টোবর ২০১৯ দুপুর আনুমানিক ২:৩০ ঘটিকার দিকে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের পানছড়ি পাড়ার মৃত মংশেপ্রু মারমার পুত্র উশুইঅং মারমা বাঙ্গালহালিয়া বাজারে গেলে সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেদিন বিকালে বিহারের বিহারাধ্যক্ষসহ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াবাসী যোগাযোগ করতে গেলে সংস্কারপন্থীরা সাক্ষাত না করে অপহরণের কথা অস্বীকার করে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আনুমানিক ৭:৩০ ঘটিকার সময় একই ইউনিয়নের কাকড়াছড়ি পাড়ার পাশ্ববর্তী জঙ্গলে এনে গুলি করে হত্যা করে। তার পরদিন ৯ অক্টোবর সকালে পাড়াবাসী জলপাই রঙের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেশীয় একটি এলজিসহ উশুইঅং মারমার মৃতদেহ দেখতে পেলে চন্দ্রঘোনা থানা পুলিশকে খবর দেয় এবং পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

গত ২১ অক্টোবর ২০১৯ সকাল আনুমানিক ১০.০০ ঘটিকার দিকে সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার ভাইবোনছড়া বাজার থেকে এক ষাটোর্ধ বৃদ্ধ জুম্ম গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহৃত ব্যক্তিটি হচ্ছেন অন্নপূর্ণ চাকমা, বয়স ৬৮ বছর, পিতা-মৃত জ্বলন্ত চাকমা, গ্রাম- বড় খারিকাবা, ৭নং লংগদু ইউনিয়ন, লংগদু উপজেলা। অপহৃত অন্নপূর্ণ চাকমা একজন সাধারণ চাষী, এইদিন বাজার বার বিধায় তিনি বাজারে এসেছিলেন। জানা গেছে, ঐদিন সকালের দিকে সুবলং ইউনিয়নের উকছড়ি গ্রামের নিবারন চাকমা কাল্যার ছেলে বাত্যা চাকমা ওরফে ঝিমিতের নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী গ্রুপের ৫-৬ জনের একটি সশস্ত্র দল লংগদু থেকে স্পীডবোট যোগে ভাইবোনছড়া বাজারে এসে বাজারের আর্মড পুলিশের চেক পোষ্টের সামনে থেকেই অন্নপূর্ণ চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রিপোর্টটি লেখা পর্যন্ত অপহৃতের মুক্তি বা অপহরণের কারণ বিষয়ে জানা যায়নি।

গত ২৪ অক্টোবর ২০১৯ সকাল ১১.০০ ঘটিকার সময় লংগদু উপজেলার লংগদু ইউনিয়নের কাট্টলী বরকলক এলাকার মুরুব্বী (১) অশোক কুমার চাকমা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, (২) পংকজ কান্তি চাকমা, বর্তমান ইউপি মেম্বার, (৩) পূন্যচক্র চাকমা ও (৪) দেবজ্যোতি চাকমা (ভাক্তা) প্রমুখদেরকে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা লংগদু উপজেলা সদরে ১০ নভেম্বর উদযাপনের আলোচনার কথা বলে মোবাইল করে ডেকে নেয়। লংগদু আসার পরে তাদের মধ্যে অশোক কুমার ও পংকজ কান্তি কাছ থেকে ৩ লক্ষ করে ৬ লক্ষ টাকা করে এবং পূন্যচক্র ও দেবজ্যোতি থেকে ৫ লক্ষ করে ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করেছে বলে জানা গেছে। পরবর্তী ৫ দিনের মধ্যে লংগদু উপজেলা সদরে সংস্কারপন্থীদের লংগদু উপজেলা সভাপতি অনঙ্গ লাল চাকমা ও বাত্যা চাকমা (জিমিত) সাথে যোগাযোগ করে চাঁদা জমা দিতে নির্দেশ প্রদান করে।

(খ) এএলপি সন্ত্রাসীর তৎপরতা

সম্প্রতি বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন স্থানে আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) নামের একটি বহিরাগত সশস্ত্র গোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সাধারণ জনগণের উপর খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি, হুমকি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড জোরদার হতে দেখা গেছে। জানা গেছে, এএলপি নামে পরিচিত সর্বসাকুল্যে ৩০-৩৫ সদস্য বিশিষ্ট এই দলটি মিয়ানমারের আরাকান ভিত্তিক মূল এএলপি'র ছিটকে পড়া একটি গোষ্ঠী। স্থানীয়ভাবে 'মগ পার্টি' হিসেবে পরিচিতি দেওয়া এএলপি'র এই দলকে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগেরই স্থানীয় নেতৃত্ব ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ গোষ্ঠী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থক জনগণকে দমন-পীড়ন ও চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে বাধা সৃষ্টিসহ নিজেদের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আশ্রয়, প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে আসছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সংক্ষেপে এএলপি কর্তৃক সংঘটিত কিছু ঘটনা তুলে ধরা হল:

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ রাত আনুমানিক ৯:০০ টায় খইহ্লা মারমা ও মংখ্যাচিং মারমার নেতৃত্বে এএলপির'র একটি সশস্ত্র দল রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উপজেলা কমিটির সভাপতি উক্য নু মারমার বাড়ি ঘেরাও করে। এ সময় উক্য নু মারমা বাড়িতে ছিলেন না। এএলপি সদস্যরা উক্য নু মারমার পরিবারকে এই মর্মেনির্দেশ দিয়ে যায় যে, অবিলম্বে উক্য নু মারমা যেন তাদের সাথে দেখা করে, না হলে তাকে মেরে ফেলা হবে।

গত ১১ মার্চ ২০১৯ সকাল আনুমানিক ১১টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নে খাইনাঙ, সাবেক ইউপি সদস্য শৈলামং মারমা, সাবেক কার্বারি সুইচিং মারমা'র নেতৃত্বে এএলপি'র একটি সন্ত্রাসী দল জনসংহতি সমিতির সদস্য উচিং মং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির

সদস্য চিংসাউ মারমা ও গবছড়া গ্রাম যুব সমিতির সদস্য অংথোয়াই চিং মারমাকে অমানবিকভাবে মারধর করে। এএলপি সন্ত্রাসীরা উক্ত তিন ব্যক্তিকে মারাত্মক জখম করে ফেলে রেখে যায় এবং যাওয়ার সময় কোন হাসপাতালে ভর্তি না হতে নির্দেশ দেয়, এর অন্যথা হলে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হবে বলে জানায়।

গত ১৪ এপ্রিল ২০১৯ রাত আনুমানিক ১০:৩০ টায় এএলপি'র একটি সশস্ত্র দল বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার রাজভিলা ইউনিয়নের তৈনখালি বাজার এলাকায় জনসংহতি সমিতির রাজভিলা ইউনিয়ন কমিটির সদস্য অংক্যচিং মারমাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে চলে যায়। মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে অংক্যচিং মারমা মারাত্মকভাবে আহত হন। ঘটনার পরপরই পরিবারের লোকজন এগিয়ে এসে আহত অংক্যচিং মারমাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান।

গত ২৩ এপ্রিল ২০১৯ ভোর রাত আনুমানিক ৪:০০ টায় মংখ্যচিং মারমার নেতৃত্বে এএলপি'র একদল সশস্ত্র সদস্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের কেরেঙ্গাছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ি হতে জেএসএস'র রাজস্থলী থানা কমিটির সদস্য ও গাইন্দ্যা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মংক্য সিং মারমাকে প্রব্রজ্যা অবস্থায় অপহরণ করে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃতকে মুক্তি দেয়া হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, অপহৃতকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

গত ৭ মে ২০১৯ রাত আনুমানিক ৯:৩০ টায় এএলপি'র সন্ত্রাসীরা বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর উপজেলাধীন রাজভিলা ইউনিয়নের রাবার বাগান এলাকার শৈলপাড়া গ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাজভিলা ইউনিয়ন কমিটির সদস্য বিনয় তঞ্চঙ্গ্যাকে গুলি করে হত্যা করে। একই সময় সন্ত্রাসীরা একই গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে ফোলাধন তঞ্চঙ্গ্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ধারণা করা হয়, অপহরণের পর ফোলাধন তঞ্চঙ্গ্যাকেও হত্যা করা হয়।

গত ৯ মে ২০১৯ রাত আনুমানিক ৮:০০ টায় এএলপি'র একদল সশস্ত্র সদস্য বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের ৩নং রাবার বাগান এলাকার তঞ্চঙ্গ্যা পাড়া গ্রামে জয়মনি তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক মধ্যবয়সী ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা প্রথমে হত্যার শিকার জয়মনি তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি ঘেরাও করে এবং তার ছেলে যুব সমিতি'র সদস্য রিপন তঞ্চঙ্গ্যার (২৮) খোঁজ করে। রিপন তঞ্চঙ্গ্যা এ সময় বাড়িতে ছিল না। এরপরই সন্ত্রাসীরা রিপন তঞ্চঙ্গ্যার বাবা জয়মনি তঞ্চঙ্গ্যাকে গুলি করে হত্যা করে চলে যায়। এছাড়া আরও জানা যায় যে, একই গ্রামের আরও দুই তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসী এএলপি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক হত্যার শিকার হন। তবে ধারণা করা হয়, উক্ত দুই তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীর মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। আরও হামলার ভয়ে স্থানীয় জনগণ এব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ বলে জানা গেছে।

গত ১৩ মে ২০১৯ এএলপি'র সদস্যরা বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান শহরের ক্রমংঞিও পাড়ার ১২ বাসিন্দাকে হত্যার হুমকি দেয়। অন্যদিকে ১৫ মে ২০১৯ এএলপি'র সন্ত্রাসীরা বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেখ্যং ইউনিয়নের সাধু হেডম্যান পাড়ার শান্তি লাল ত্রিপুরা এবং উপজেলার খামতাং খিয়াং পাড়ার এক ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে।

গত ১৮ মে ২০১৯ রাত আনুমানিক ৯:০০ টায় এএলপি'র সন্ত্রাসীরা বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন উপজেলা সদরের রাজভিলা ইউনিয়নের চিংথ্যং পাড়া হতে জনসংহতি সমিতির রাজভিলা কমিটির সদস্য উনু মং মারমা, পীং-রেংনং মারমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অপহৃতের মুক্তির খবর পাওয়া যায়নি। আশংকা করা হচ্ছে, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

গত ১৮ জুলাই ২০১৯ এএলপি'র সশস্ত্র সদস্যরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার গাইন্দ্যা ইউনিয়নের (১) উহাইনু মারমা (৩৭) পীং-মৃত উথোয়াই চিং মারমা, সাং-পাইডং পাড়া ও (২) সুইক্য চিং মারমা (৫৫) পীং-মৃত পাইসা প্রু মারমা, সাং- টুরুগুমুখ পাড়া নামের দুই নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ নিয়ে যায়। পরদিন ১৯ জুলাই ২০১৯ মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়। জানা গেছে, সুইক্য চিং মারমাকে মুক্তিপণ হিসেবে ৩০,০০০ টাকা দিতে হয়। তবে উহাইনু মারমা ভয়ে তার মুক্তিপণের পরিমাণ প্রকাশ করতে রাজি হননি। উল্লেখ্য, উহাইনু মারমা যুব সমিতির রাজস্থলী থানা কমিটির সদস্য। অপরদিকে সুইক্য চিং মারমা হচ্ছেন ইতোপূর্বে এএলপি সদস্যদের কর্তৃক অপহৃত মংক্যচিং মারমার বড় ভাই।

গত ১৮ আগস্ট ২০১৯ সকাল আনুমানিক ১১:০০ টায় এএলপি'র সশস্ত্র সদস্যরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার পইতু পাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি টহল দলের উপর গুলি বর্ষণ করলে ঘটনাস্থলে ৩ সেনাসদস্য গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে এদের মধ্যে পরে মোঃ নাসিম নামে একজন নিহত হয়। জানা গেছে, পইতু পাড়ার একটি পাহাড় চূড়ার উপর এএলপি'র সশস্ত্র দলটি একটি গোপন আস্তানায় অবস্থানকালে সেনাবাহিনীর দলটি সেই দিকে গেলে এএলপি'র সদস্যরা সেনাদলটিকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে। এসময় উভয়পক্ষের মধ্যে

বন্দুকযুদ্ধ হয় এবং এক পর্যায়ে এএলপি'র সদস্যরা অন্যত্র সরে যায়। এছাড়া আরও জানা যায় যে, বন্দুকযুদ্ধের পর বিকেলের দিকে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলটি তল্লাসী করতে গেলে এসময় একটি মাইন বিস্ফোরণে একজন ক্যাপ্টেনসহ আরও দুইজন গুরুতরভাবে আহত হন।

জানা গেছে, সেনাবাহিনী এএলপি'র গোপন আস্তানার প্রকৃত অবস্থান জানতে চাইলে তখন এএলপি'র এক কালেকটর আবদুর রহমান এএলপি'র গোপন আস্তানা রাজস্থলীর কমলছড়ি এলাকায় অবস্থিত বলে সেনাবাহিনীকে ভুল তথ্য দেয়। যদিও এএলপি'র সশস্ত্র সদস্যরা পইতু পাড়ার স্থানীয় এক বৌদ্ধ বিহারের নিকটবর্তী পাহাড় চূড়ায় অবস্থান করছিল। ধারণা করা হয়, উক্ত আবদুর রহমানের তথ্যকে ভিত্তি করে সেনাদলটি ধরে নেয় যে, সেখানে এএলপি'র কোন অবস্থান বা ক্যাম্প নেই। তাই তারা সেদিন (১৮ আগস্ট ২০১৯) নির্দ্বিধায় উক্ত পাহাড় চূড়ার দিকে এগিয়ে যায়। ফলে খুব সম্ভবত অন্য কোন উপায় না দেখে বা অন্য কোন সশস্ত্র দল মনে করে এএলপি সদস্যরা সেনাদলের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। সেনাবাহিনীও পাল্টা গুলি চালায়। এতে উভয়পক্ষের বন্দুকযুদ্ধ প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হয়।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এএলপি'র সন্ত্রাসীরা বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রুমা উপজেলার সামাখাল পাড়া থেকে বন্দুকের নলের মুখে এক কার্বারি (গ্রাম প্রধান)-সহ ৬ জন মারমা গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অপহৃত গ্রামবাসীদের নাম- প্রুসি অং মারমা (৪৩), মং রুই অং মারমা (৪৫), থোয়াইহ্লা চিং মারমা (৫৬), উহ্লা মং মারমা (৩৫), মং গ্যাই মারমা (৩২) ও চিং থোয়াই মং মারমা (৩৫)। জানা গেছে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিকেলের দিকে এএলপি সন্ত্রাসীদের একটি দল উক্ত সামাখাল পাড়ায় এসে খাবার খুঁজলে, এলাকাবাসী খাবার ও আশ্রয় দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। এর পরদিনই এই অপহরণ ঘটনা ঘটায়। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এএলপি'র সশস্ত্র একটি দল বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার ৬নং কুহালং ইউনিয়নের বালাঘাটার মিনঝিরি পাড়ায় এসে পাড়ার কারবারি বিত্তোসেন তঞ্চঙ্গ্যা (৬০) ও অপর এক গ্রামবাসী শুদ্ধমনি তঞ্চঙ্গ্যা (৩০)-কে বেঁধে মারধর করে বলে জানা যায়। তাদের বিরুদ্ধে গেলে পাড়াবাসীর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকিও প্রদান করে।

গত ৭ অক্টোবর ২০১৯ উবাচিং মারমা (৪২) নামে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলা কার্যালয়ের একজন পিয়নকে তার কর্মস্থল থেকে ডেকে নিয়ে অপহরণ করে রাজস্থলী পুওয়াইতু পাড়ায় নিয়ে যায়। পুওয়াইতু পাড়ায় নিয়ে এএলপি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অমানুষিকভাবে মারধর করে। অপহৃত উবাচিং মারমা রাজস্থলী উপজেলার গাইন্দা ইউনিয়নের লুংগদু পাড়ার সুইহ্লাচিং মারমার ছেলে। উবাচিং মারমা আগে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে এএলপি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ছেড়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, গত ৯ অক্টোবর ২০১৯ সকাল ৯:০০ ঘটিকার দিকে (হাটের দিন) রাজস্থলী বাজারের পার্শ্বে তাইতং পাড়া, ফারুয়া স্টেশন, ডাক্তার পাড়া, মহাজন পাড়া ইত্যাদি এলাকায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর বস্ত্র পরিধান করে সশস্ত্র অবস্থায় এএলপি সন্ত্রাসীরা মহড়া দেয়। এতে এলাকায় জনমনে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, ১৮ আগস্ট রাজস্থলীতে সেনাবাহিনী ও এএলপি মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধের পর পরই সেনাবাহিনী রাঙ্গামাটি জেলাব্যাপী জুম্ম এলাকাসমূহে চিরুণী অভিযান জোরদার করে। এএলপি'র বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বরং উক্ত বন্দুকযুদ্ধ ঘটনাকে দোহাই দিয়ে সেনাবাহিনী তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন জায়গায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, বাড়ি বাড়ি তল্লাসী করে, মিথ্যা মামলা দায়ের করে, বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করে, ক্যাম্পে আটকে রেখে অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে।

> "দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ..এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়।" – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

সংগঠন সংবাদ

‘নির্বাচনে পাহাড়ে নাশকতার ছক জেএসএসের’ শীর্ষক বানোয়াট সংবাদে জেএসএসের প্রতিবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক অনলাইন পত্রিকা chttimes24.com-এ ‘নাশকতার অভিযোগে রাঙামাটি শহরে জেএসএস’র ২ সদস্য আটক’, parbattanews.com-এ ‘নির্বাচনকে ঘিরে নাশকতার পরিকল্পনা: রাঙামাটিতে জেএসএসর সশস্ত্র শাখার দুই কর্মী আটক’, chttoday.com-এ “অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে জনসংহতি সমিতির ২ জন আটক”, দৈনিক আজাদীতে ‘নির্বাচনে পাহাড়ে নাশকতার ছক জেএসএসের’, জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাকে ‘নির্বাচনকে সামনে রেখে জেএসএস’র নাশকতার পরিকল্পনা অস্ত্রসহ দুইজন গ্রেফতার’ শীর্ষক সংবাদগুলোর বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রদত্ত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নগেন্দ্র চাকমা বলেন, উক্ত সংবাদগুলোতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে, “...বুধবার সন্ধ্যায় শহরের তবলছড়ি এলাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জেএসএস এর মিলিশিয়া গ্রুপের দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। আটককৃত উভয়েই সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জেএসএস এর সক্রিয় সদস্য নিশ্চিত করে তারা দু’জনেই রাঙামাটির বিভিন্ন এলাকা থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহ করে গহীন অরন্যে নিয়ে যাওয়ার কাজে নিয়োজিত বলে জানিয়েছেন একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।” আটককৃতদের বুকে টানানো কাগজে তাদের নাম আলোময় চাকমা (৩৯) ও আনন্দ কুমার চাকমা ওরফে ধন চাকমা (৪২) এবং তারা উভয়েই “জেএসএস (মূলদল) এর সশস্ত্র সদস্য” বলে উল্লেখ করা হয়। এমনকি “গত নভেম্বর মাসে জেএসএস (মূল) এর মিলিশিয়া সশস্ত্র গ্রুপে ৭০ জনকে ইতোমধ্যে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে” মর্মে কল্পিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়।

সংবাদে উল্লেখিত তথ্য সর্বৈব মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। জনসংহতি সমিতি কোন ধরনের নাশকতা বা সশস্ত্র তৎপরতার সাথে জড়িত নয়। আলোময় চাকমা ও আনন্দ কুমার চাকমা ওরফে ধন চাকমা নামে জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য আগেও ছিল না, বর্তমানেও নেই। “আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র তৎপরতা বৃদ্ধিতে দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের টার্গেট করে জেএসএস এর জন্য অর্থের বিনিময়ে নতুন সদস্য সংগ্রহ করে দেয়” মর্মে সংবাদে উল্লেখিত বিষয়টিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও শেখানো বুলি। “জেএসএস এর দায়িত্বশীল একজন উর্দ্ধতন নেতা” উদ্ধৃতি দিয়ে “আটককৃত দুইজনকেই আরো অন্তত ছয়মাস আগে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে” মর্মে সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে তাও সম্পূর্ণ বানোয়াট। এ বিষয়ে জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য বা দায়িত্বশীল কোন নেতা এ ধরনের বক্তব্য প্রদান করেনি।

বস্তুত আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের নামে যৌথবাহিনীর চলমান অভিযানে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও নিরীহ জুম্ম জনগণকে টার্গেট করে দমন-পীড়ন চালানোর হীনউদ্দেশ্যেই ভাড়াটে লোক দিয়ে এধরনের কল্পকাহিনী সাজিয়ে গ্রেফতারের নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে এবং সেসব কল্পকাহিনী ও বানোয়াট তথ্য প্রচার করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এ ধরনের ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সংবাদ ও অপপ্রচারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং এধরনের অপপ্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য উল্লেখিত সংবাদপত্র ও পুলিশসহ যৌথবাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

সাজেকে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে দীপংকর তালুকদারের বক্তব্যের প্রতিবাদ

১০ ডিসেম্বর ২০১৮ অনলাইন পোর্টাল chttimes24.com-এ প্রকাশিত “অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন: জেএসএস’র উদ্দেশ্যে দীপংকর” শিরোনামে প্রকাশিত একাদশ জাতীয় সংসদের ২৯৯ রাঙ্গামাটি আসনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী দীপংকর তালুকদারের বক্তব্যের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়।

১১ ডিসেম্বর ২০১৮ প্রদত্ত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের বিনয় কুমার ত্রিপুরা উল্লেখ করেন যে, “তিনি (দীপংকর) বলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলে

জেএসএস অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে গত নির্বাচনে ৯৫% থেকে ৯৬% ভোট ডাকাতি করেছে।" বস্তুত দীপংকর তালুকদারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও গণবিরোধী ভূমিকার কারণে গত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাঙ্গামাটি জেলাবাসী দীপংকরের বিরুদ্ধে ভোট বিপ্লব ঘটিয়েছিল। তাঁর সেই ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিতেই জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে দীপংকর তালুকদার এই মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপপ্রচার চালিয়ে আসছেন। জনসংহতি সমিতি কোন ধরনের অবৈধ অস্ত্রবাজী করে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে পার্বত্যবাসীকে সঙ্গে নিয়েই গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও তাঁবেদারী ভূমিকা নিয়ে দীপংকর তালুকদার যতই অপপ্রচারে লিপ্ত হোক না কেন, পার্বত্যবাসী তাঁর গোয়েবলসীয় অপপ্রচারে কখনোই বিভ্রান্ত হবে না।

দীপংকর তালুকদারের এ ধরনের ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও কল্পপ্রসূত বক্তব্য নির্বাচন আচরণবিধি সরাসরি লঙ্ঘন বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। তাই জনসংহতি সমিতি তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহারের জোর দাবি জানায়।

"রাঙামাটিতে সেনা অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ৩" সংবাদে জেএসএসের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ প্রতিদিন, বাংলা ট্রিবিউন, chttimes24.com, chttoday.com, parbattanews.com ইত্যাদিসহ বিভিন্ন দৈনিক ও অনলাইন নিউজপোর্টালে "রাঙামাটিতে সেনা অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ৩" শীর্ষক সংবাদের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের বিনয় কুমার ত্রিপুরার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, উক্ত সংবাদে রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িপাড়া থেকে সেনাবাহিনী একটি মেশিনগান ও একটি সাব-মেশিন কার্বাইনসহ তিনজন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, আটককৃতরা দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বা জেএসএস (মূল) দল এর সশস্ত্র শাখাসমূহকে অস্ত্র সরবরাহ করে আসছিল বলে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে বিভিন্ন অনলাইন পোর্টালে উল্লেখ করা হয়।

আটককৃতদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। বলাবাহুল্য উক্ত আটককৃত তিনজন ব্যক্তির সাথে জনসংহতি সমিতির কোন সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির কোন সশস্ত্র শাখা নেই। কাজেই জেএসএস (মূল) দল এর সশস্ত্র শাখাসমূহকে অস্ত্র সরবরাহের তথ্য সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। মূলত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের হীনউদ্দেশ্যে সরকারি বাহিনীর একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে এ ধরনের সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে।

বিশ্বস্থ সূত্রে জানা যায় যে, ২২ ডিসেম্বর ২০১৮ বিলাইছড়িপাড়া থেকে আটককৃত তিন ব্যক্তিকে তারও আগে ২২ নভেম্বর ২০১৮ সিলেটের মৌলভিবাজার চা বাগান থেকে র‍্যাব কর্তৃক আটক করা হয়েছিল। এতদিন নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে রেখে একমাস পর রাঙ্গামাটি শহরের উপকণ্ঠ বিলাইছড়িপাড়া থেকে গ্রেফতার করা ও অস্ত্র উদ্ধারের নাটক করা হয়। আটকের পর আটককৃত তিনজনসহ অজ্ঞাতানামা ১৫ জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি সাজানো মামলা দায়ের করা হয় বলে জানা যায়। অজ্ঞাতনামা ১৫ জনের দোহাই দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনরত নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার ও হয়রানির উদ্দেশ্যে এধরনের গ্রেফতারী নাটক ও সাজানো মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর এ ধরনের গর্হিত তৎপরতার বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বাঘাইছড়িতে খুনের ঘটনায় জেএসএস সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ঘটনায় প্রতিবাদ

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বাবুপাড়ায় জনৈক বসু চাকমাকে খুনের ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সদস্যসহ ২৭ জনের বিরুদ্ধে গত ৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাঘাইছড়ি থানায় জনৈক প্রভাত কুমার চাকমা কর্তৃক 'আগ্নেয়াস্ত্র সহকারে গৃহে প্রবেশ করতঃ খুন করার' অভিযোগে একটি মামলা (মামলা নং ০২/০২) এবং বাঘাইছড়ি থানার এসআই হিরু বড়ুয়া কর্তৃক 'অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র গুলি দখলে রাখার' অভিযোগে আরেকটি মামলা (মামলা নং ০৩/০৩) দায়েরের ঘটনায় জনসংহতি সমিতি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করে। উল্লেখ্য, গত ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বাবুপাড়ায় প্রভাত কুমার চাকমার বাড়িতে কে বা কারা গুলি করে বসু চাকমাকে খুন করে বলে ঘটনার

বিবরণে জানা যায়। কিন্তু এ ঘটনার সাথে জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের কোন সদস্য বা সমর্থক জড়িত নয়। জনসংহতি সমিতি এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে ও সন্ত্রাসী রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের কাছে কোন অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র বা গোলাবারুদও নেই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হয়রানি ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই হত্যাকান্ডের ঘটনার সাথে জড়িত করে জনসংহতি সমিতি ও সহযোগীসংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক দয়াসিন্ধু চাকমার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয় এবং পরবর্তী ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে এই মামলা প্রত্যাহারের জন্য প্রশাসন তথা সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়।

সেই সাথে ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এই মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার করা না হলে- পরবর্তী ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ সকাল ৬:০০ টা থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত বাঘাইছড়ি উপজেলায় সড়ক ও নৌপথ অবরোধ করা হবে এবং বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সকল হাট-বাজার অনির্দিষ্টকালের জন্য বর্জন করা হবে বলে জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটি ঘোষণা করে। মামলা প্রত্যাহার না করায় যথারীতি বাঘাইছড়ি উপজেলায় সড়ক ও নৌপথ অবরোধ পালিত হয়।

রাইখালীতে জোড়া খুনের ঘটনায় জেএসএসকে দায়ী করায় তীব্র প্রতিবাদ

রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগর পাড়ায় জনৈক মংসানু মারমা (৪০) ও মো: জাহিদুল ইসলামকে (৩২) খুনের ঘটনায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করা এবং অনলাইন নিউজপোর্টালসহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নগেন্দ্র চাকমার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের কারিগরপাড়ায় জনৈক মংসানু মারমা (৪০) ও মো: জাহিদুল ইসলামকে (৩২) খুনের ঘটনায় রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে নিহতদের তাদের কর্মী দাবি করে এঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করা হয়েছে। অন্যদিকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে তাতিন্দ্র লাল চাকমা-সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীরাও মংসানু মারমাকে তাদের কর্মী দাবি করে এঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করেছে।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় "রাঙামাটিতে দুই আ'লীগ কর্মী'কে গুলি করে হত্যা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে- "রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক রফিক আহমেদ তালুকদার এক বিবৃতিতে এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্তু লারমা নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করেছেন।" অথচ একই সংবাদে প্রকাশিত চন্দ্রঘোনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: আশরাফ উদ্দিন বলেছেন, "কারা কী কারণে তাদের গুলি করে হত্যা করেছে, সেটা কেউ জানাতে পারছে না। এর পেছনের কারণ বের করতে পুলিশ চেষ্টা করছে।" চন্দ্রঘোনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: আশরাফ উদ্দিন গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনলাইন নিউজপোর্টাল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, "আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে থাকতে দেখতে পাই। কারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত সেই বিষয়ে তদন্ত চলছে।" অর্থাৎ কারা কী কারণে মংসানু মারমা ও মো: জাহিদুল ইসলামকে গুলি করে হত্যা করেছে সে বিষয়ে কোন কিছু এখনো জানা যায়নি।

রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগ ও তাতিন্দ্র লাল চাকমা-সুদর্শন চাকমার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থী কর্তৃক নিহতদের নিজের কর্মী দাবি করে এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করা হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র বৈ আর কিছু নয়। বস্তুত এ ঘটনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জড়িত নয়। জনসংহতি সমিতি এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে ও সন্ত্রাসী রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে এ ধরণের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এভাবে কোন ঘটনা ঘটলেই প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের, গ্রেফতার, হয়রানি, ধর-পাকড়, নির্যাতন-নিপীড়ন করা হচ্ছে।

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন (ডাকসু) উপলক্ষে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবিতে) অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীবৃন্দের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় তথ্য প্রচার সম্পাদক ও আয়োজনের সমন্বয়ক সুলভ চাকমার সঞ্চালনায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি নিশৈমং মারমা এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন (বাগাছাস) ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জেউন্স রিচার্স ঘাগড়া। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সান্তাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (সাসু) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস মুরমু, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাবি শাখার সভাপতি অমর শান্তি চাকমা, ঢাবি জুম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি কিংশুক চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য রুনি চাকমা, ঢাবি ফিল্ম সোসাইটির সহ-দপ্তর সম্পাদক জয়শ্রী চাকমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামের সাবেক সভাপতি অসিম রায় ত্রিপুরা, বাগাছাস ঢাকা মহানগরের সহ-সভাপতি সাইমন রিছিল, ঢাবির সিনিয়র শিক্ষার্থী ম্রাগিয় প্রু মারমাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীবৃন্দ।

মূল বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে দীর্ঘ অচলায়তন ভেঙ্গে ঢাবি প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপামর শিক্ষার্থীর প্রাণের দাবি ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগকে ঢাবিতে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীরা আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিশৈমং মারমা বলেন, অন্যান্য আপামর সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই ঢাবিতে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীরাও মনে করে শিক্ষার্থীবান্ধব, আধুনিক, মননশীল এবং গবেষণাভিত্তিক ঢাবি নির্মাণের জন্য দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ।

সংবাদ সম্মেলনের সভাপতি জেউন্স রিচার্স ঘাগ্রা বলেন, একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি ক্যাম্পাসের যাবতীয় সহশিক্ষা কার্যক্রম, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা প্রভৃতি অঙ্গনে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়তে আসা আদিবাসী শিক্ষার্থীদের রয়েছে স্বকীয় ভাষা-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ। স্বকীয় আদিবাসী সংস্কৃতি শুধুমাত্র আদিবাসীদের নয় বরং গোটা দেশেরই সম্পদ। আদিবাসী ছাত্ররা চায় দেশের মূলধারার সংস্কৃতির সাথে স্বকীয় আদিবাসী সংস্কৃতির পারস্পরিক মেলবন্ধন ঘটুক। এটা প্রত্যাশা করা হয়, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান বৃদ্ধি পাবে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে ডাকসু নির্বাচনে ঢাবির আদিবাসী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে প্রত্যাশা উত্থাপন করা হয় যে, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যেন ডাকসুতে ন্যূনতম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে; ঢাবিতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য ৫% শিক্ষা কোটা বাস্তবায়ন হবে; ঢাবিতে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আবাসিক সিট সংরক্ষিত থাকবে, আদিবাসী নারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসিক সিট সংরক্ষিত থাকবে; জগন্নাথ হলে নির্মিতব্য রবীন্দ্রভবনে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সিট সংরক্ষিত থাকবে; বৈচিত্র্যময় আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে মূলধারার সংস্কৃতির মেলবন্ধনের লক্ষ্যে সক্রিয় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রম চর্চা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে নির্দিষ্ট কক্ষ থাকবে; ঢাবিতে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা প্রদান করা হবে; ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি সংগ্রহশালা নির্মাণ করা ও ঢাবি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে আদিবাসী বিষয়ক নানান জার্নাল ও পুস্তক সংরক্ষিত থাকবে; পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রধানতম সামাজিক উৎসব (বিজু-সাংগ্রাই-বৈসুক-বিহু-বিষু) উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক ছুটির ব্যবস্থা থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রধান সামাজিক উৎসবগুলো পালন করার জন্য ঐচ্ছিক ছুটির ব্যবস্থা থাকবে; এবং অসচ্ছল আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য ট্রাস্ট ফান্ড থাকবে এবং বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে।

চবিতে 'মহান নেতা এম এন লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৯' অনুষ্ঠিত

গত ৩ মার্চ ২০১৯ দুপুর ২:০০ ঘটিকার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা কর্তৃক চবিতে অধ্যয়নরত আদিবাসী ছাত্রদের নিয়ে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৯ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চবি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন চবির প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: সাইদুল ইসলাম। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চবির প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা, চবির ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শরৎ জ্যোতি চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রামভাই পাংখোয়া, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক বাবলু চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি চবি শাখার সভাপতি মিন্টু চাকমা ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক কৃতি চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৯ এর আয়োজক কমিটির আহবায়ক ও পিসিপি চবি শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রাবণ চাকমা।

টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় হিল ব্রাদার্স (২০১৬-১৭ সেশন) ও হিল গ্যাং (২০১৫-১৬ সেশন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অনুষ্ঠানটির শুরুতে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যারা শাহাদাৎ বরণ করেছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

খেলায় প্রথম ইনিংসে হিল ব্রাদার্স ব্যাটিং করে হিল গ্যাং'কে ১৫২ রানের টার্গেট প্রদান করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে হিল গ্যাং ৮৯ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ফলে হিল ব্রাদার্স চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং রানার্স আপ হয় হিল গ্যাং। এছাড়াও ম্যান অফ দ্যা ফাইনাল হিল ব্রাদার্স এর খেলোয়াড় কিরণ চাকমা (ব্যক্তিগত ৫৫ রান, ৩ উইকেট), টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী হিল ব্রাদার্স এর খেলোয়াড় লেমন চাকমা (ব্যক্তিগত ৩০২ রান), টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী উইন চাকমা (ব্যক্তিগত ৯ উইকেট) নির্বাচিত হন।

এরপরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পিসিপি চবি শাখা চবিতে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। খেলার মাধ্যমে প্রত্যেকের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করার জন্য এই টুর্নামেন্টের আয়োজন। বক্তারা আরো বলেন, পিসিপির জন্ম হয়েছে লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সচেতন শিক্ষার্থী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে জানতে হবে। পাহাড়ের মানুষের উপর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। পিসিপির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতে না পারলেও অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। আন্দোলন করা শুধুমাত্র পিসিপির কর্মীদের দায়িত্ব নয়, সকল সচেতন শিক্ষার্থীকে আন্দোলনে অংশ নিতে হবে। রাজনৈতিক দল ছাড়া বিপ্লব সংঘটিত করা সম্ভব নয়। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শুধুমাত্র পাহাড়ের মানুষের জন্য নয়, সারা দেশের মেহনতি মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন। মহান নেতা সেইসময় অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি দেশের স্বপ্ন দেখেছেন।

এরপর চ্যাম্পিয়ন দলকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও মেডেল এবং রানার্স আপ দলকে রানার্স আপ ট্রফি ও মেডেল তুলে দেয়া হয়। সেই সাথে ম্যান অফ দ্যা ফাইনাল, সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী, সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ হতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সেশন ভিত্তিক ১২টি দলের অংশগ্রহণে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৯ শুরু করা হয়।

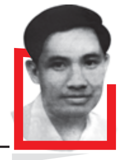

বাঘাইছড়ি ও বিলাইছড়ি হত্যা ঘটনায় জেএসএসকে জড়িত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

গত ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে ৫ম উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই অজ্ঞাতনামা অস্ত্রধারী কর্তৃক বাঘাইছড়ি উপজেলার নয় মাইল এলাকায় ব্রাশ ফায়ার করে ৭ জন নিরীহ নির্বাচন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে হত্যা ও অনেককে আহত করার ঘটনায় এবং গত ১৯ মার্চ সকালের দিকে বিলাইছড়ি উপজেলায় উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সুরেশ তঞ্চঙ্গ্যাকে কে বা কারা গুলি করে হত্যা করার ঘটনায় একটি মহল কর্তৃক জাতীয় দৈনিক ও টিভি চ্যানেলসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে মনগড়া, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও প্রতিহিংসামূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে অভিযোগ করার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গভীর উদ্বেগ ও তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের বিনয় কুমার ত্রিপুরার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়ার পূর্বেই এই ঘটনায় মনগড়া ও কাল্পনিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করে বক্তব্য প্রদান কোনভাবে যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত হতে পারে না। এ ধরনের বক্তব্য প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে সুষ্ঠু তদন্তকে যেমনি বাধাগ্রস্ত করবে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেবে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কোনভাবে উক্ত হামলা ও হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত নয়। জনসংহতি সমিতি উক্ত সহিংস ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রকৃত অপরাধীদের যথাযথ বিচারের দাবি জানায়। জনসংহতি সমিতি উক্ত ঘটনায় নিহত ও আহত ব্যক্তিদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে এবং আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। একই সাথে এধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তৎউদ্দেশ্যে এবং পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানায়।

পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার ২১তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ২২ মার্চ ২০১৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) রাজশাহী মহানগর শাখার ২১তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। "প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও চুক্তি বিরোধীদের প্রতিহত করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ছাত্র-যুব সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়ুন" শ্লোগানকে সামনে রেখে পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার

সভাপতি দীপন চাকমার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাসেল চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রামভাই পাংখোয়া, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মংক্যাওয়ান রাখাইন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন "প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন দুর্নীতি, একতরফা শাসন-শোষণ, নিপীড়ন, জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে পিসিপির অবস্থান ছিল দৃঢ় ও অদম্য। পিসিপির সেই অদম্য আন্দোলনে রাজশাহী মহানগর শাখা একাত্মতা প্রকাশ করছে"।

কাউন্সিলের আলোচক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রামভাই পাংখোয়া বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাগুলো জানতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সুদীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হবে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পিসিপির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে সামিল হতে তিনি আহবান জানান।

কাউন্সিলে রাসেল চাকমাকে সভাপতি, রাসকিন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং জীনিচ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে পিসিপি রাজশাহী মহানগরের ২১তম কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা।

ঢাবিতে তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী জুম্ম শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ মার্চ ২০১৯ দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি), ঢাকা মহানগর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখার সার্বিক তত্ত্বাবধানে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাবির জগন্নাথ হলের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঢাবি, চবি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়তে (জাবি) পড়ুয়া আদিবাসী জুম্ম শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিলনমেলা। দেশের প্রথম সারির এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিন শতাধিক আদিবাসী শিক্ষার্থীর প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন খেলাধুলা, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলনের সহভাগিতা ও পারস্পরিক সৌহার্দের মধ্য দিয়ে এ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মিলনমেলায় চবির শতাধিক, জাবির অর্ধশতাধিক এবং ঢাবির দেড়শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। মিলনমেলার শুরুতেই সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় জগন্নাথ হলের খেলার মাঠে ঢাবি বনাম চবি'র আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। মুহূর্মুহূ করতালি আর উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে এ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচটি সমাপ্ত হয় ৩৩ রানের ব্যবধানে চবির আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জয়ের মধ্য দিয়ে। এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে ঢাবির আদিবাসী শিক্ষার্থীরা হারলেও তারা দুপুরের খাবারের আয়োজনে চবি এবং জাবি থেকে আগত আদিবাসী বন্ধুদের নিজেদের ক্যাম্পাসের খাবারের সুন্দর আপ্যায়ন করতে ভুলেননি এই মিলনমেলার অন্যতম আয়োজক ঢাবি আদিবাসী জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবার। এছাড়া এরই মধ্যে চবি বনাম জাবি'র আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয় একই মাঠে। ম্যাচটিতে ১-০

ব্যবধানে জাবি'র আদিবাসী শিক্ষার্থীরা হেরে যায় চবির আদিবাসী শিক্ষার্থীদের কাছে।

খাবারের পরেই খানিক বিশ্রামের মধ্যে গল্প-সল্পের ফাঁকে আবারো জমে ওঠে মিলনমেলার আসর। তিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একত্র হওয়া আদিবাসী নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার মিউজিক্যাল বল খেলা বেশ জমে ওঠে গানের তালে তালে। সাথে গানের সুর সচল থাকে পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের চিরচেনা সেই সুর– "পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রী দল, জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এগিয়ে চল, ওরে এগিয়ে চল এগিয়ে চল।" মিউজিক্যাল বলের পরে ঢাবি বনাম চবি নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার রশি টানাটানি প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

মিউজিক্যাল বলের পরেই শুরু হয় দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দল চবি এবং ঢাবি জুম্ম সেরা একাদশের মধ্যেকার প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। করতালি এবং তুমুল উত্তেজনা এবং জগন্নাথ হলের উপাসনালয়, গ্যালারি এবং মাঠের চারপাশ দর্শক পরিবেষ্টিত এক উত্তেজনাকর ফুটবল ম্যাচ। চবি'র মাঠে বিগত মিলনমেলায় ঢাবির জুম্ম একাদশের কাছে শোষণীয় পরাজয়ের পর নিজেদেরকে শক্তভাবে প্রস্তুত করে মাঠে নামে চবি'র সেরা জুম্ম একাদশ। কিন্তু নিজেদের ঘর বলে কথা। ৫-০ গোলে ঘরের মাঠে আবারো নিজেদের জয় ধরে রাখলো ঢাবি আদিবাসী শিক্ষার্থীরা।

প্রীতি ফুটবল ম্যাচের পর তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই মিলনমেলাকে কেন্দ্র করে সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসীদের অধিকার আন্দোলনের সাথে যুক্ত কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা এবং তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আলোচনায় অংশ নেন ডাকসুর একমাত্র আদিবাসী সদস্য যোশীয় সাংমা চিবল। আলোচনায় অংশ নিয়ে পিসিপি চবি শাখার সভাপতি মিন্টু চাকমা বলেন, আমাদের জীবনগুলো এখনো এক অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ। এর থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের মধ্যেকার ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব আরো দৃঢ় করা জরুরী। সেজন্য আজকের মিলনমেলা আমাদেরকে আরো ঋদ্ধ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করবে বলে মত দেন। তিনি আগামীতে আবারো অন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিয়ে আরো বড় পরিসরে এই মিলনমেলা আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাবির শিক্ষাথী ও পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার স্কুল ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক রেঙ ইয়ং ম্রো আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আমরা তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এতগুলো শিক্ষার্থী কেন একত্র হয়েছি! এর একটাই কারণ, আমরা ভালো নেই। আমাদের এই ভালো না থাকা ব্যাপারগুলোকে সহভাগীতার জন্য একত্র হওয়া। আমরা চাই, আমাদের সমসাময়িক যেসকল আদিবাসী তরুণরা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনা করছি তারা যেন পড়ালেখার পাশাপাশি আমাদের শেকড়ের প্রতি দায় নিয়ে কাজ করতে পারি। সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই আয়োজন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ডাকসু সদস্য যোশীয় সাংমা চিবল বলেন, ঢাবির ক্যাম্পাসে প্রথমেই আমার পরিচয় আমি একজন আদিবাসী। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমরা লড়ে যাচ্ছি আমাদের অধিকারের দাবিতে। এই অধিকারের প্রশ্নে আমাদেরকে এভাবেই প্রথমে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি আদিবাসী অধিকারের প্রশ্নে ডাকসুর সদস্য হিসেবে তার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার কথা ব্যক্ত করেন।

আদিবাসী অধিকারকর্মী কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সময়কার আমরা প্রত্যন্ত আদিবাসী অঞ্চলে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এ উদ্যোগ আমাদের অনুজরা এখনও চালু রেখেছে। এই ভালো কাজগুলো এখনো আদিবাসী শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পরিসরের বাইরে চলমান রয়েছে কেননা আমরা আমাদের শেকড়ের প্রতি দায়বোধ এখনো রাখি। তিনি এই ধরনের মিলনমেলা আয়োজনের উদ্যোগকে প্রশংসা করেন এবং এই ধরনের সংহতি, ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে আগামীতে আদিবাসীর জীবন আলোর মুখ দেখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে পিসিপি ঢাবি শাখার সভাপতি অমর শান্তি চাকমা মিলনমেলায় উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই মিলনমেলায় বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজনে (ফুটবল, ক্রিকেট, রশি টানাটানি) কেউই হারেনি কেউই জিতেনি কেবল জিতেছে আমাদের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও ঐক্য। এই ঐক্য বিনির্মাণের জন্য এ ধরনের উদ্যোগের বিকল্প নেই। আগামীতে আবারো বৃহৎ পরিসরে এই মিলনমেলা আয়োজনের আশাবাদ পুনর্ব্যক্ত করেন ঢাবির সিনিয়র এই শিক্ষার্থী।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুলভ চাকমা, পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি নিপন ত্রিপুরাসহ সংগঠনের চবি শাখা, ঢাকা মহানগর ও ঢাবি শাখার বিভিন্ন দপ্তরের নেতৃবৃন্দ। পিসিপি ঢাবি শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক রিবেং দেওয়ানের পরিচালনায় এই ঐতিহাসিক মিলনমেলার আলোচনা সভার মাধ্যমেই আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়। এবারের মিলনমেলার মূল সুর নির্ধারণ করা হয়েছিল– "এসো মিলি প্রাণে প্রাণে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে।"

সেনাজোনে ডেকে নিয়ে কেএস মং ও ক্যবামংকে গ্রেফতারে জেএসএসের নিন্দা ও মুক্তির দাবি

গত ২৫ মে ২০১৯ বান্দরবান সেনা জোন কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কেএস মং মারমা এবং বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমাকে বান্দরবান সেনাজোনে ডেকে নিয়ে অবৈধ গ্রেফতারের ঘটনায় জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

২৬ মে ২০১৯ তারিখে জনসংহতি সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক গুণেন্দু বিকাশ চাকমার স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সেনাজোন থেকে খবর দিলে ২৫ মে অপরাহ্ন ২:০০ ঘটিকায় আলোচনার জন্য কেএস মং মারমা ও ক্যবামং মারমা বান্দরবান সেনাজোনে যান। সেনাজোনে তাদেরকে দুই ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর অবৈধভাবে গ্রেফতার করে বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় সেনাজোন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বান্দরবান থানায় সোপর্দ করে। অপরদিকে সেদিন কোলক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান থোয়াইহ্লা প্রু মারমা ও জর্ডান পাড়ার কার্বারী মংহ্লা ত্রিপুরাসহ আরো তিনজনকে আটক করে থানায় নেয়া হয় বলে জানা যায়। তাদের সকলের বিরুদ্ধে গত ২২ মে বান্দরবান জেলার কুহালং ইউনিয়নের উজিমুখ হেডম্যান পাড়া থেকে বান্দরবান পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও পৌর আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি চ্যথুইমং মারমাকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহরণ ও হত্যার ঘটনায় মিথ্যাভাবে জড়িত করে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ও নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় স্থানীয়ভাবে মগ পার্টি নামে খ্যাত আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি)-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বান্দরবান সদর উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক হত্যা, অপহরণ, হুমকি, চাঁদাবাজি চালিয়ে আসছে। যেমন- ১৮ ফেব্রুয়ারি পিসিপির রাজস্থলী শাখার সভাপতি উক্যনু মারমার বাড়ি ঘেরাও; ১১ মার্চ কাপ্তাইয়ের রাইখালীতে যুব সমিতির চিংসাউ মারমা, জনসংহতি সমিতির উচিংমং মারমা ও যুব সমিতির অংথোয়াইচিং মারমাকে মারধর করে আহত করা; ১৪ এপ্রিল রাজস্থলীতে জনসংহতি সমিতির রাজবিলা শাখার সদস্য অংক্যচিং মারমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা; ২৩ এপ্রিল জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী শাখার সদস্য ও গাইন্দ্যা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মংক্যসিং মারমাকে অপহরণ (এখনো নিখোঁজ); ৭ মে বান্দরবানের রাজবিলা ইউনিয়নের রাবার বাগানে যুব সমিতির বিনয় তঞ্চঙ্গ্যাকে গুলি করে হত্যা এবং ফোলারাম তঞ্চঙ্গ্যাকে অপহরণ; ৯ মে বান্দরবানের কুহালং ইউনিয়নের ৩নং রাবার বাগানে জয়মণি তঞ্চঙ্গ্যাকে গুলি করে হত্যা; ১৩ মে বান্দরবান শহরের উপকণ্ঠে প্রুমংপ্রো পাড়ায় ১২ গ্রামবাসীকে হত্যার হুমকি; ১৫ মে রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের সাধু হেডম্যান পাড়ায় শান্তিলাল ত্রিপুরাসহ দুইজনকে গুলি করে হত্যা; ১৮ মে রাজবিলা ইউনিয়নের চিংক্ষ্যং পাড়া থেকে উনুমং মারমাকে অপহরণ (এখনো নিখোঁজ); ১৯ মে ভোরে রাজবিলা ইউনিয়নের তাইংখালী ৮নং রাবার বাগান পাড়ায় ক্যচিংথোয়াই মারমা নামে এক গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা; ২২ মে চ্যথুইমং মারমাকে অপহরণ ও পরে তার লাশ উদ্ধার ইত্যাদি ঘটনা ঘটিয়েছে। এএলপিকে দায়ী করে এসব অধিকাংশ ঘটনার খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, স্থানীয় আওয়ামীলীগের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও প্রত্যক্ষ মদদে বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন এএলপি কর্তৃক এভাবে একের পর এক হত্যা, অপহরণ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জনসংহতি সমিতি বার বার দাবি করে আসছে। কিন্তু প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উপরন্তু গত ২২ মে চ্যথুইমং মারমাকে অপহরণের ঘটনায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারি বাহিনী কর্তৃক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এবং তাদেরকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, দমন-পীড়ন, এলাকা ছাড়া করা, জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব শূণ্য করা ইত্যাদি ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে গতকাল ২৫ মে সেনাজোনে ডেকে নিয়ে জনসংহতি সমিতির দুই কেন্দ্রীয় সদস্য কেএস মং মারমা ও ক্যবামং মারমাকে অবৈধভাবে গ্রেফতার করা হয়। অপরদিকে সেদিন সারারাত ধরে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বান্দরবান শহরে জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদেরকে অবৈধ গ্রেফতারের হীনউদ্দেশ্যে তাদের ঘরবাড়ি ঘেরাও করে। এএলপি নামক একটি বিদেশী সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলকে অবাধে সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপে মদদ দিয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এসব এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গ্রেফতারকৃত হেডম্যান ও গ্রামের কার্বারীসহ জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য কেএস মং মারমা ও ক্যবামং মারমাকে অচিরেই নিঃশর্তে মুক্তি প্রদান করা; বিদেশী সশস্ত্র সংগঠন- এএলপি'কে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলমান হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধ করা এবং এএলপির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং এসব ঘটনায় জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে জড়িত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, দমন-পীড়ন, এলাকা ছাড়া করার হীন ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জোর দাবি জানায়।

জেএসএসের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে ঢাকায় পিসিপির বিক্ষোভ

গত ২৫ মে ২০১৯ বান্দরবানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কেএস মং মারমা ও বান্দরবান জেলা সাধারণ সম্পাদক এবং রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমাসহ গ্রেফতারকৃত জনসংহতি সমিতি সদস্যদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গত ২৭ মে ২০১৯ ঢাকায় অপরাজেয় বাংলা পাদদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)-এর অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে সমাজবিজ্ঞান চত্বর ঘুরে কলাভবন প্রদক্ষিণ করে আবারো অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গিয়ে সমাপ্ত হয়। পরে সেখানে সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি শুভদেব চাকমার সভাপতিত্বে এবং তথ্য ও প্রচার সম্পাদক ব্যাবিলন চাকমার পরিচালনায় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সদস্য রমেল তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে

সবসময় একটি ভীতিকর অবস্থার মধ্যে রাখার জন্য সেখানে সবসময় কোনো না কোনো সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হয়। আর সে সমস্যাগুলোর অজুহাতে পাহাড়ের জুম্ম জনগণের অধিকারের লড়াইয়ে নেতৃত্বে থাকা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে সবসময় টার্গেট করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে বিগত ২৫ মে বান্দরবানে জনসংহতি সমিতি কেএস মং মারমা ও ক্যাবামং মারমাসহ অপরাপর নেতাকর্মীদেরকে মিথ্যা অভিযোগে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেফতার করা হয়। তিনি উক্ত সমাবেশ থেকে গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিসহ অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তায়নের দাবি জানান।

সংহতি বক্তব্যে পিসিপি ঢাবি শাখার সদস্য সরল তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, বান্দরবানের আওয়ামীলীগের চ্যথুইমং মারমাকে কে বা কারা অপহরণ করে হত্যা করেছে তার দায় একতরফাভাবে কেন জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের উপর চাপানো হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বান্দরবান এবং পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের নির্মমভাবে একের পর হত্যা ঘটনায় তো কাউকে গ্রেফতার করতে দেখা যায়নি। পাহাড়ের প্রশাসনকে তিনি দলকানা না হয়ে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান জানান এবং পাহাড় থেকে সেনা-শাসন তুলে নেওয়ার জোর দাবি জানান। এছাড়া তিনি আওয়ামীগ নেতা চ্যথুইমং মারমার হত্যাকান্ডসহ অপরাপর জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের হত্যাকাণ্ড এবং সকল প্রকার সংঘটিত সহিংসতার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং বিচারের দাবি করেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অলীক মৃ তার সংহতি বক্তব্যে বলেন, পাহাড়কে সবসময় একটি সমস্যার জালে আটকে রাখা হয়। আর সেই জালে জড়ানো হয় জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে। একতরফাভাবে এই দায় চাপানো রাষ্ট্রের পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিয়ে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

সভাপতির বক্তব্যে পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি শুভদেব চাকমা বলেন, আমাদেরকে বার বার কোথাও না কোথাও দাঁড়াতে হয় মিছিল নিয়ে। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য বার বার গ্রেফতার করে জেলে পুড়ানো হয়। কিন্তু পাহাড়ের জুম্ম জনগণের অধিকারের লড়াইয়ে নিয়োজিত অধিকারকর্মীরা আবারো প্রজ্বলিত হয় বলে দাবি করেন এই ছাত্র নেতা। তিনি গ্রেফতারকৃত জেএসএস এবং পিসিপি'র সকল নেতাকর্মীদের মুক্তি দেওয়ার জোর দাবি করেন এবং অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি করেন। অন্যথায় পাহাড়ে অনাগত দিনে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির দায় রাষ্ট্রকে নিতে হবে বলে হুশিয়ার করেন তিনি। এছাড়া উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা সুলভ চাকমা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বিগত ২২ মে ২০১৯ বান্দরবান জেলার কুহালং ইউনিয়নের উজিমুখ হেডম্যানপাড়া থেকে বান্দরবান পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও পৌর আওয়ামীলীগ সহ-সভাপতি চ্যথুই মং মারমাকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে হত্যা করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৫ মে ২০১৯ কেএস মং মারমা ও ক্যাবামং মারমাকে আলোচনার জন্য সেনাজোনে ডেকে নিয়ে গ্রেফতার করানো হয়। অপরদিকে কোলক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান থোয়াইহ্লা প্রু মারমা, উজিপাড়ার কার্বারী হ্লাচিং মং মারমা এবং জর্দান পাড়ার কার্বারী মংহ্লা ত্রিপুরাকে আটক করে থানায় নেয়া হয়।

বরকলে জেএসএস সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন সুবলং এলাকায় গত ২৭ জুন ২০১৯ স্মৃতিময় চাকমা কোকো নামে সুধাসিন্ধু-তাতিন্দ্র-এর নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের একজন সশস্ত্র সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি করতে গিয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থক ৬০ জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করার ঘটনায় জনসংহতি সমিতি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করে।

১ জুলাই ২০১৯ তারিখে জনসংহতি সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক গুণেন্দু বিকাশ চাকমার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা ও চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ ও গোয়েন্দা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীকে নানাভাবে মদদ প্রদান করে আসছে। উল্লেখ্য, ২০০৭-২০০৮ সালে দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক সুধাসিন্ধু-তাতিন্দ্র নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের জন্ম দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি বিরোধী

সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম করা হয়। তারই অংশ হিসেবে গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও সেনাবাহিনী কর্তৃক পূর্ণ নিরাপত্তা ও সহায়তা দিয়ে সশস্ত্র সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদেরকে বাঘাইছড়ি, লংগদু, নান্যাচর, কাপ্তাই ও রাজস্থলীতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তারা অস্ত্রের মুখে অবাধে চাঁদাবাজি ও একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও নিরাপত্তা বাহিনী একইভাবে স্থানীয়ভাবে মগ পার্টি নামে খ্যাত বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন আরাকান লিবারেশন পার্টির (এএলপি) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকে বান্দরবান সদর উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী ও কাপ্তাই উপজেলায় নিয়ে এসে এসব এলাকায় তাদেরকে অবাধে একের পর এক হত্যা, অপহরণ, হুমকি ও চাঁদাবাজি চালিয়ে যেতে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে থাকে।

সর্বশেষ গত ১৪ মে ২০১৯ তারিখে সেনাবাহিনী স্কর্ট দিয়ে দুইটি মাইক্রোবাস যোগে সংস্কারপন্থীদের ১৪ জনের একটি সশস্ত্র দলকে দীঘিনালা থেকে লংগদু লঞ্চ ঘাটে নিয়ে আসা হয়। সেদিন সকাল ১১:৪৫ ঘটিকায় লংগদু লঞ্চঘাটে পৌঁছার সাথে সাথে আগে থেকে ভাড়া করে রাখা তিনটি স্পীড বোটে তুলে সংস্কারপন্থীদেরকে বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নের শুভলং বাজারে নিয়ে আসা হয়। স্পীডবোটগুলো ফোরেরমুখ পার না হওয়া পর্যন্ত লংগদু উপজেলায় দায়িত্বরত ডিজিএফআই মো: বেলাল এবং লংগদুতে পৌঁছিয়ে দেওয়া সেনাবাহিনীর গাড়িটি লংগদু ঘাটে অবস্থান করে। সংস্কারপন্থীদের বহনকারী স্পীডবোটগুলো কাপ্তাই হ্রদে পৌঁছালে তারপর সেনাবাহিনীর গাড়িটি দীঘিনালার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং মো: বেলালও সেখান থেকে চলে যান।

সুশীল চাকমা ওরফে প্রবেশ ও পূর্ণাঙ্গ চাকমার নেতৃত্বে ১৪ জনের উক্ত সংস্কারপন্থী দল সুবলং এলাকায় আসার পর পরই এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় তারা সুবলং বাজারে চেক পোস্ট বসায়। মালবাহী ও যাত্রীবাহী সকল প্রকার জলযান তারা অবাধে চেক করতে থাকে এবং নিরীহ যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। ব্যবসায়ী ও সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে জোরপূর্বক চাঁদা ধার্য করে আদায় করতে থাকে। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে খবর দিয়ে গ্রাম ভিত্তিক গণহারে চাঁদা আদায় করতে থাকে। সংস্কারপন্থীদের হয়রানিতে সুবলং বাজার দিয়ে যাতায়াত করতে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠনকে মদদ দিয়ে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস চালানো এবং কোন ঘটনা ঘটলেই জনসংহতি সমিতির সদস্য ও প্রতিবাদী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করার ক্ষমতাসীন মহল ও সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ ঘটনা সংঘটিত হয় গত ২৭ জুন ২০১৯ সকাল ৯:০০ ঘটিকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ঐদিন চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে সুবলঙে অবস্থানরত সংস্কারপন্থী দলের তিনজন সশস্ত্র সন্ত্রাসী একটি স্পীড বোট যোগে একটি বালুবাহী দেশীয় বোট ধাওয়া করতে গেলে স্মৃতিময় চাকমা কোকো নামে একজন সংস্কারপন্থী হ্রদের পানিতে পড়ে ডুবে গেলে ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এসময় সুবলঙে অবস্থানরত অপর সংস্কারপন্থী সদস্যরা ও সুবলং ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য গিয়ে বালুবাহী বোট ধাওয়ারত সংস্কারপন্থী সশস্ত্র চাঁদাবাজদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, সংস্কারপন্থী অস্ত্রধারী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মদদে জনৈক প্রীতিময় চাকমা কর্তৃক জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয়, জেলা, থানা ও বিভিন্ন স্তরের সদস্যসহ ৬০ জন নিরীহ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উক্ত ঘটনার সাথে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জড়িত করে বরকল থানায় একটি সাজানো, ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এধরনের ষড়যন্ত্র চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান নস্যাৎ করা হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, যা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে কখনোই শুভফল বয়ে আনতে পারে না।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রীতিময় চাকমা কর্তৃক জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয়, জেলা, থানা ও বিভিন্ন স্তরের সদস্যসহ ৬০ জনের নিরীহ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বরকল থানায় দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা এবং সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট সুবলঙে অবস্থানরত সশস্ত্র সংস্কারপন্থীদের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধ করার জোর দাবি জানায়।

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে নবীনবরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ জুলাই ২০১৯ "কাঁদছে ভূমি, ডাকছে পাহাড় শোনরে নবীন প্রাণ, ভাসাও এবার রণতরী গাও যৌবনের গান"- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের "নবীনবরণ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ২০১৯"

অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক খোকন চাকমার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি জগদীশ চাকমার সভাপতিত্বে নবীনবরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা-২০১৯ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য চাথোয়াইপ্রু মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রামভাই পাংখোয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাগর ত্রিপুরা নান্টু, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সভাপতি সুমিত্র চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি শান্তনা তালুকদার এবং নবীনদের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সৌরভ চাকমা এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস প্রীতি।

অনুষ্ঠানে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের জন্য। কিন্তু এই চুক্তি বাস্তবায়ন না করে পার্বত্য সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি কারাগারে পরিণত করা হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চাথোয়াইপ্রু মারমা বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চাকরি করা নয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া দরকার জ্ঞান অর্জন করা। নিজেকে জানা, নিজের জাতিকে জানা, নিজের সংস্কৃতিকে জানা। এম এন লারমা যে আদর্শকে বুকে ধারণ করে বেজাতীয় অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছিলেন সে আদর্শকে জানতে হবে। তিনি নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, অর্জিত শিক্ষাকে সমাজে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি (উপজাতীয়) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পাহাড়ি (উপজাতীয়) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য যাতে ক্ষুণ্ন হয় তার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে শাসকগোষ্ঠী। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে না পারে তা নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে বলেও অভিযোগ করেন।

ঢাকায় পিসিপি'র বিভিন্ন শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ২০ জুলাই ২০১৯ 'জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ছাত্র-যুব সমাজের বৃহত্তর ঐক্য গড়ি তুলুন" শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ের জুম্ম জনমানুষের অধিকার আদায়ে নেতৃত্বদানকারী ছাত্র-যুব সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ঢাকা মহানগর শাখা এবং তার অধিনস্থ শাখা কমিটিগুলোর কাউন্সিল সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক অমর শান্তি চাকমার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি নিপন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে কাউন্সিল ও ছাত্র সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী মনিরা ত্রিপুরা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অলিক মৃ এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক সুলভ চাকমা প্রমুখ। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের যে সকল কর্মী নিজের জীবনকে বলি দিয়েছিলেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া কাউন্সিল ও ছাত্র সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক ব্যাবিলন চাকমা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আধিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অলীক মৃ বলেন, পিসিপি পাহাড়ের একটি জ্বলন্ত মশালের নাম, যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই সংগ্রাম করে চলেছে। এই লড়াইকে আরো অধিকভাবে বেগবান করার জন্য বর্তমান তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, পাহাড় এবং সমতলের আদিবাসীদের একিভূত আন্দোলনই দেশের আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সুলভ চাকমা বলেন, পিসিপির কর্মীরা হলেন পাহাড়ের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের বীজ বোনার প্রথম ধাপ। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদই জুম্ম জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পিসিপির কর্মী হিসেবে হতাশ হওয়া যাবে না। তিনি পাহাড়ের তরুণ ছাত্র-যুবদের স্বকীয় চেতনা দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে লড়াই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও আহ্বান জানান।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী মনিরা ত্রিপুরা বলেন, শাসকগোষ্ঠী মনে করে তাদের ক্রমাগত নিপীড়নের ফলে আদিবাসীদের আন্দোলনে ভাটা পড়বে। ক্রমাগত মিথ্যা মামলা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেও মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র লড়াকু আদর্শ এবং চেতনা জুম্ম জনগণকে আলো দিয়ে যাবে বলেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দীপায়ন খীসা বলেন, শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক যতই জুমিয়া জীবনের সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হোক তা সম্ভব হবে না। জুমিয়া জীবনকে আমাদের মত করে গড়ে তোলার আন্দোলনে পিসিপির প্রত্যেকটি সেনানীকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান পাহাড়ের এই নেতা। সম্প্রতি সুবলংয়ে এক হত্যাকান্ডকে ঘিরে জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঢালাও মামলা এবং তাদেরকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আমাদের জীবনকে সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। ক্রমাগত মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এই যে আমাদের জীবনকে পিষে মারার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে চুরমার করতে পিসিপির কর্মীদের হতে হবে অগ্রণী। তিনি বলেন, আগামী দিনে পাহাড়ের মানুষের জীবন আমাদের হবে কী না সেই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে পিসিপিকে আমাদের না হওয়া জীবনকে খুঁজে নিতে হবে।

পরবর্তীতে নিপন ত্রিপুরাকে সভাপতি, রেঙ ইয়ং ম্রোকে সাধারণ সম্পাদক এবং ব্যাবিলন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। আর নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় পিসিপির সহ-সাধারণ সম্পাদক সুলভ চাকমা। রিবেং দেওয়ানকে সভাপতি, জিনেট চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সরল তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গঠন করা হয় এবং নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি'র কেন্দ্রীয় তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অমর শান্তি চাকমা। অন্যদিকে রমেল তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি,

উহ্লামং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সাথোই মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট বাসাবো কমিটি; অনেষ চাকমাকে সভাপতি, দীপন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং অন্তর চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট মিরপুর কমিটি এবং রিপেন চাকমাকে আহ্বায়ক ও রিকো চাকমাকে সদস্য-সচিব করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা পলিটেকনিক আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। তাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সহ-সভাপতি দুলাল চাকমা।

পিসিপি ঢাবি শাখার উদ্যোগে নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ২০ জুলাই ২০১৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার আয়োজনে ঢাবির কলাভবন ক্যাফেটেরিয়ার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাবিতে ভর্তি হওয়া নবীন জুম্ম শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি ঢাবির সভাপতি রিবেং দেওয়ানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জিনেট চাকমার পরিচালনায় অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাবির সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. খায়রুল চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসা বলেন, আমাদের মনকে উপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব বেশ আগ্রাসন করেছে। আসন্ন আদিবাসী দিবসের জাতিসংঘের মূলসুর হচ্ছে– আদিবাসী ভাষা। কিন্তু দুভার্গ্যজনক হলেও সত্যি যে আমাদের চাকমা ভাষার মধ্যে বাংলা, মারমা ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা, ত্রিপুরা ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা এমনকি বাংলা ভাষার মধ্যেও ইংরেজীর ভয়ানক আগ্রাসন চলছে। চাকমা, মারমা কিংবা ত্রিপুরা'র পাশাপাশি বাংলা বা ইংরেজী বলতে পারার মধ্যে জুম্ম প্রজন্মের যে 'নাগরিকী' হয়ে ওঠার ভাবনা খুব ভয়ানক বলে তিনি জানান। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের শেকড়কে সাথে নিয়ে জীবনকে খুঁজে নিয়ে বিকশিত হওয়ার আহ্বান জানান জনসংহতি সমিতির এই নেতা।

পিসিপির সাবেক এই ছাত্র নেতা আরো বলেন, তোমাদের অবশ্যই শত শত বছরের জুম পাহাড়কে জানতে হবে। না হলে জ্ঞানের চরম শীর্ষে যাওয়া যাবে না। আমরা যতই ঢাকাই থাকি না কেন, নাগরিক হয়ে ওঠার নানা কসরতে থাকি না কেন আমাদেরকে অবশ্যই পাহাড়কে নিয়ে ভাবতে হবে। পাহাড়ের জুম্মদের নানা মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার আর নারীদেরকে নানা সহিংসতার ও ভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে রেখে পাহাড়ের জুমিয়া জীবনকে নিঃশ্বাসবিহীন করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দীপায়ন খীসা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. খায়রুল চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে গণতন্ত্র চর্চা ও তার উপস্থিতি নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। নির্বাচিত গণতন্ত্র নাকি জনগণের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র। যেখানে ইউরোপ, আমেরিকার উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে আদিবাসীদেরকে অধিকার দিয়েছে সেখানে গণতান্ত্রিক দেশে

সরকার আদিবাসীদের এখনো অবহেলা করছে বলে অভিযোগ ব্যক্ত করেন এই শিক্ষক। তিনি আরো বলেন, ঢাবিতে পড়ুয়া জুম্ম শিক্ষার্থীদের বিসিএস থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হওয়ার নানা ব্যক্তিগত স্বপ্ন রয়েছে। তারপরেও আমাদের ব্যক্তিগত নানা স্বপ্নের মধ্যে সামষ্টিক স্বপ্নকে যদি বাস্তবায়ন করা না যায় তাহলে ব্যক্তিগত নানা স্বপ্নগুলো পাহাড়ের মানুষদেরকে এত আনন্দ দেবে না। আর সামষ্টিক সেই স্বপ্নটাই হচ্ছে পাহাড়ে যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার সামগ্রিক বাস্তবায়ন। এর জন্য নবীন-প্রবীণ সব শিক্ষার্থীকে এগিয়ে এসে ব্যক্তিগত স্বপ্নগুলোর পাশাপাশি সামষ্টিক স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে টেকসই স্বপ্ন বিনির্মাণ করতে হবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন বিশিষ্ট এই শিক্ষক।

পিসিপি ঢাবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সরল তঞ্চঙ্গ্যার স্বাগত বক্তব্যের পাশাপাশি বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী মনিরা ত্রিপুরা। এছাড়া নবীনদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন ঢাবির শিক্ষার্থী শুভ চাকমা এবং নবীনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থী সৃষ্টি চাকমা।

চবিতে পিসিপির উদ্যোগে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা ’১৯ অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুলাই ২০১৯ “জুম পাহাড় ডাকছে তোমায় করো না হেলা, হে নবীন এসেছে ক্ষণ ভাসাও মুক্তির ভেলা”- এই স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা কর্তৃক চবিতে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ও ২০১৪-১৫ ব্যাচের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনার অনুষ্ঠান চবির সমাজবিজ্ঞান অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে পিসিপি চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক কৃতি চাকমার সঞ্চালনায় ও সভাপতি মিন্টু চাকমার সভাপতিত্বে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও ২৯৯ নং রাঙামাটি আসনের সাবেক সাংসদ ঊষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চবির প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা, ইতিহাস বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা এবং পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রামভাই পাংখোয়া। নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি চবি শাখার সদস্য রবিধন চাকমা। নবীনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র রবি বিকাশ চাকমা এবং বিদায়ীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী এ্যাঞ্জেলা আকাঙ্ক্ষা থিগিদী।

উদ্বোধকের বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, জীবন মানে সংগ্রাম। আমাদের প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। সেইজন্য আজকের তরুণ সমাজ তথা নবীন সমাজকে তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায়ের পথ বেছে নিতে হবে। তিনি বলেন, পিসিপি প্রতি বছর যে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে সেটির উদ্দেশ্য হলো

নবীন সমাজকে তার দায়িত্ব কর্তব্য, শেকড় সম্পর্কে অবগত করা। তিনি নবীনদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানের সমুদ্র। এই জ্ঞানের সমুদ্রে নিজেকে বিলাসিতায় গা না ভাসিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের চেতনাবোধে উজ্জীবিত হওয়ার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, চেতনার কোনো মৃত্যু নেই। আজকে যারা মনে করছেন জনসংহতি সমিতির আন্দোলন থেমে গেছে তাদেরকে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। যারা জাতিকে বিভক্তি করছে, যারা দালালিপনা করে নিজের অস্তিত্ব বিক্রি করে দিচ্ছে তাদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে তিনি হুশিয়ারি দেন। তিনি সকলকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কাজ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম নবীনদের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা আজকের নবীন স্কুল কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পন করেছে তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে তাদেরকে উদ্যোগী হতে হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই পড়ালেখা শুরু করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা বলেন, আজকে যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞানার্জন করে বিদায় নিচ্ছেন তাদেরকে সেই জ্ঞান দেশ ও সমাজ গঠনে বিনিয়োগ করতে হবে। তাদের সৃষ্টিশীলতা, মেধা দিয়ে সঠিক প্লাটফর্ম খুঁজে নেয়ার অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, আজকে যারা বিদায় নিচ্ছে তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য একটি প্লাটফর্ম গড়ে তোলা দরকার। তিনি মনে করেন এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে সাবেক এবং বর্তমান চবি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি মেলবন্ধন গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, পিসিপির এই ধরনের অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক মেলবন্ধনে সামিল হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পিসিপি চবি শাখা দীর্ঘ দিন যাবত এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কার্যক্রমসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের সাথে সরাসরি যুক্ত আছে। তাই তিনি শিক্ষকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পিসিপিকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রামভাই পাংখোয়া বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হলো উচ্চশিক্ষার বৃহত্তর জায়গা। এখানে যারা অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে তাদেরকে সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষার্থীদের তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামের ইতিহাস, নিজ শেকড় সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। তাই সকলকে নিজ শেকড়কে ভুলে না যাওয়ার অনুরোধ করেন। আমাদের শেকড় সম্পর্কে নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করা জরুরি। আমরা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে না জানি তাহলে ভালো জিপিএ-ও মূল্যহীন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে লক্ষ করলে দেখা যায় আজকে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। নতুনত্ব বলতে আমরা এখনও কিছুই সৃষ্টি করতে পারিনি। তাই আমাদেরকে করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় গিয়ে পাহাড়ের অবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন ও সংগ্রামে সামিল হতে হবে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন।

এরপর চবির আদিবাসী শিক্ষার্থীবৃন্দ ও রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী এবং প্লুং ব্যান্ড শিল্পীদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পিসিপি বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির আহ্বায়ক কমিটি গঠন

গত ৩১ আগস্ট ২০১৯ "সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি সংগ্রামে"- এই স্লোগানকে সামনে রেখে বান্দরবান শহরের মাস্টার গেস্ট হাউস সভাকক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখা কমিটির উদ্যোগে কলেজের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। পিসিপি বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক মংমে মারমার সঞ্চালনায় এবং সহ-সভাপতি নিরন তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে উক্ত কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান জেলা শাখার যুব সমিতির সভাপতি মংস্ত মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মিমি মারমা, সহ-সাধারণ সম্পাদক অলকা তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার সদস্য হালেলুই বম। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান থোয়াই চ প্রু মাস্টার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে এযাবৎ যারা শহীদ হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মংএছা চাক। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসকগোষ্ঠী এবং জুম্ম দালালরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করছে। যার উদাহরণ হিসেবে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে জুম্ম শিক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষার ২.৫০ পয়েন্ট নিচে পাওয়াদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না দেয়ার যে শাসকগোষ্ঠীর দাবার চাল, সে কথা উল্লেখ করেন তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অলকা তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, পাহাড়ে প্রতিনিয়ত নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। উন্নয়নের নামে ভূমি বেদখল করে পর্যটন তৈরি হচ্ছে। তিনি পর্যটনকে বয়কট করার পাশাপাশি পিসিপি যে লড়াই সংগ্রাম, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ইতিহাস বহন করে বলে উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথি হালেলুই বম বলেন, জাত, গোত্র, সম্প্রাদায় বিভেদ না করে আদিবাসীদের ঐক্যের সাথে লড়াই-সংগ্রাম করার প্রতি সোচ্চার হতে বলেন। সকল শহীদদের রক্তের প্রতিদান দিতে সর্বদায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি মংস্ত মারমা বলেন, শুধুমাত্র পাঠ্য-পুস্তক নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও মহান নেতা এম এন লারমার ইতিহাসকে জানার জন্য অধ্যয়ন ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এছাড়া প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের লড়াই-সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তরে দেখতে পাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে।

সভাপতির বক্তব্যে নিরন তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হতে হবে। এম এন লারমার নীতি-আদর্শকে অন্তরের গহীনে লালন পালন করার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান করেন তিনি।

হ্লাওয়াই মারমাকে আহ্বায়ক ও সাংখুব বমকে সদস্য-সচিব করে একাদশ শ্রেণির আহ্বায়ক কমিটি এবং বিজয় চাকমাকে আহ্বায়ক ও ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যাকে সদস্য-সচিব করে দ্বাদশ শ্রেণির আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট একাদশ এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট দ্বাদশ শ্রেণির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুইয়ইমং মারমা।

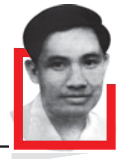

৮০তম জন্মবার্ষিকীতে সংবর্ধিত হলেন বরেণ্য রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পঙ্কজ ভট্টাচার্য এর ৮০তম জন্মদিন উৎযাপিত হলো। ৮০তম জন্মদিন উৎযাপন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক বরেণ্য শিক্ষাবিদ এবং জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা সভায় প্রথমে এই বরেণ্য রাজনীতিবিদকে উৎসর্গ করে এবং তার জন্য শুভকামনা জানিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। তারপর তাঁকে উৎসর্গ করে নৃত্য ও গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে স্পন্দনের নৃত্যশিল্পীরা এবং সমবেত গানের দল সংস্কৃতি মঞ্চ।

নাগরিক সংবর্ধনার শুরুতেই পঙ্কজ ভট্টাচার্যের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের উপর একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয় এবং মানপত্র পাঠ করেন বরেণ্য নাট্য ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ড. অজয় রায়। তিনি বলেন, পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে আমি চিনতাম ষাট দশকের প্রতিবাদী তুখোর ছাত্রনেতা হিসেবে। সাম্প্রদায়িকতার সীমারেখা অতিক্রম করে যারা রাজনীতিটাকে অসাম্প্রদায়িক আদর্শে পরিচালিত করেছেন তাদের মধ্যে পঙ্কজ ভট্টাচার্য একজন বলেও উল্লেখ করেন এই শিক্ষাবিদ।

ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে পঙ্কজ ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দূর থেকে যাদেরকে দেখে আমাদের মনে শ্রদ্ধা জন্মায় তাঁদের মধ্যে পঙ্কজ ভট্টাচার্য অন্যতম। তাঁর জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে বলে উল্লেখ করে এই প্রবীণ রাজনীতিবিদের সুস্বাস্থ্য, নিরোগ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন সরকারের এই প্রতিমন্ত্রী।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান পঙ্কজ ভট্টাচার্যের নিরোগ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার পথে তিনি এই বরেণ্য রাজনীতিবিদের নির্মোহ ও নির্লোভ জীবন যাপনের দিকটি সবার অনুকরণীয় বলে তুলে ধরেন।

এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী আয়েশা খানম, বাংলাদেশ জাসদ এর সভাপতি শরিফ নুরুল আম্বিয়া, পঙ্কজ ভট্টাচার্যের দীর্ঘদিনের সহধর্মিনী নারী নেত্রী রাখী দাশ পুরকায়স্থ, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, ওয়ার্কার্স পার্টির বিমল বিশ্বাস সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া উপরোক্ত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও তাঁকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান গণফোরাম, আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ পথ নাটক পরিষদ, বাংলাদেশ একাডেমী, সাংস্কৃতিক সংগঠন বহ্নিশিখা ও উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, ছাত্র ইউনিয়ন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য চট্টগ্রামের রাউজানের নোয়াপাড়া গ্রামে ১৯৩৯ সালের ৬ আগস্ট শিক্ষক প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য ও তাঁর সহধর্মিনী মনি কুন্তলা দেবীর সংসারে জন্ম নেন। গত ৬ আগস্ট ২০১৯ তাঁর আশি বছর পূর্ণ হয়। '৬০ এর দশকের আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থেকে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে অবদান রেখে যাওয়া নির্মোহ রাজনীতিবিদদের মধ্যে পঙ্কজ ভট্টাচার্য এ যুগের অনুকরণীয় আদর্শ।

পিসিপি চবি শাখার উদ্যোগে শহীদ মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখার উদ্যোগে চবিতে অধ্যয়নরত সমতল ও পাহাড়ি আদিবাসী ছাত্রদের নিয়ে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চবি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিসিপি চবি শাখার সভাপতি মিন্টু চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কৃতি চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চবির প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: সাইদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মংয়ই চিং মারমা, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ চাকমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি নয়ন ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যারা শাহাদাৎ বরণ করেছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শহীদ মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৯ এর আহ্বায়ক ও পিসিপি চবি শাখার তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রুমেন চাকমা।

টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় ইনক্রেডিবল (২০১৭-১৮ সেশন) ও ইভার গ্রীন (১৩-১৪ সেশন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইনক্রেডিবলের অধিনায়ক মংচাইসা মারমার একমাত্র গোলে ইভারগ্রীনকে পরাজিত করে ইনক্রেডিবল টানা দ্বিতীয় বারের মত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দলকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও মেডেল এবং রানারআপ দলকে রানারআপ ট্রফি ও মেডেল তুলে দেন অতিথিরা। এছাড়া টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন ইভারগ্রীনের

খেলোয়াড় টমি ত্রিপুরা, সেরা গোলদাতা নির্বাচিত হন ইভারগ্রীন এর স্ট্রাইকার থোয়াইচিংনু মারমা, সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হন ইনক্রেডিবল এর গোলকিপোর সুশোভন দেওয়ান এবং ম্যান অফ দ্যা ফাইনাল নির্বাচিত হন ইনক্রেডিবল এর খেলোয়াড় প্রেনচ্যুং ম্রো।

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মো: সাইদুল ইসলাম বলেন, জীবনকে সুন্দর ও মানসিকভাবে গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য সবাইকে অবশ্যই নিজেকে খেলাধুলার মধ্যে রাখতে হবে। তার সাথে আমাদেরকে উদার মন-মানসিকতার অধিকারী হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। খেলাধুলার পাশাপাশি লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে হবে বলে তিনি খেলোয়াড় ও শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করেন। কারণ একজন শিক্ষিত মানুষ দেশ ও জাতির জন্য কাজ করতে পারে। তিনি বলেন, আজকের এই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে একমাত্র সচেতন ছাত্র ও যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তার পাশাপাশি ছাত্রসমাজকে দেশ ও জাতির জন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বক্তারা বলেন, এই টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেয়া এবং শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমা সম্পর্কে জানা। পাশাপাশি তার আত্মত্যাগকে অনুসরণ করে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র ও যুব সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সর্বদা প্রস্তুত থাকা।

বক্তারা আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের শেকড়। সেই শেকড়ে আজ অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। সেই বিরাজমান অস্থিতিশীলতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তাই সবাইকে জনসংহতি সমিতি এবং পিসিপির সাথে সামিল হয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হতে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য বক্তারা অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, শহীদ মংচসিং মারমা পিসিপি কাপ্তাই সুইডিস পলিটেকনিক শাখার সক্রিয়কর্মী ছিলেন। ২০১২ সালের ২০শে মে পিসিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অংশগ্রহণ শেষে কাপ্তাইয়ে ফেরার জন্য রাঙ্গামাটির কল্যাণপুরস্থ পেট্রোল পাম্পে সহকর্মী ও বন্ধুদের অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ অপেক্ষামান বাসের পাশ ঘেষে আসা একটি চলমান সিএনজি গতি কমিয়ে কিছু সন্ত্রাসী সেখানে পরিকল্পিতভাবে গ্রেনেড ছুড়ে মারে। সেই গ্রেনেড হামলায় তিনিসহ ৬ জন মারাত্মকভাবে আহত হন। ঘটনার পরপরই তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার তিনদিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনায় অনেকে পঙ্গুত্ববরণ করেন।

পিসিপি চবি শাখা শহীদ মংচসিং মারমার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর শহীদ মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে চবিতে অধ্যয়নরত সমতল ও পাহাড়ি আদিবাসীদের সেশন ভিত্তিক ১১টি দলের অংশগ্রহণে শহীদ মংচসিং মারমা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৯ শুরু করা হয় এবং গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্ট সমাপ্তি হয়।

পিসিপির উদ্যোগে ঢাকায় পালিত হল বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮০তম জন্মবার্ষিকী

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পাহাড় তথা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মহান নেতা বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮০তম জন্মদিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)-এর আয়োজনে দিনের শুরুতেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উক্ত আয়োজনে পিসিপি ঢাবির সিনিয়র সহ-সভাপতি লিটন চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সরল তঞ্চঙ্গ্যার পরিচালনায় একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা। সভায় বক্তব্য রাখেন পিসিপির ঢাবির সদস্য অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, জুম্ম শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সংগঠন ঢাবি জুম্ম লিটারেচার এন্ড কালচারাল সোসাইটির সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ঐতিহ্য চাকমা, পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার অর্থ সম্পাদক জিনেট চাকমা প্রমুখ। ঢাবির জগন্নাথ হলের শহীদ মিনারে এই আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তারা বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তরুণ ছাত্র যুবাদের কাছে সকল সময়ের জন্য অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয় আদর্শ। মানবিক গুণের অধিকারী এ মানুষটি পাহাড়ের প্রত্যন্ত জুমিয়া জনপদ থেকে শুরু করে গণপরিষদ তথা সংসদেও স্বকীয় জাতিসত্তার অধিকারের প্রশ্নে ছিলেন সরব এবং প্রতিবাদী।

এছাড়া পরিচয়ের স্বীকৃতির জন্য গণপরিষদ বিতর্কে তাঁর রেখে যাওয়া যুক্তি ও বক্তব্যগুলো আগামী দিনের তারুণ্যকে লড়াইয়ের মাঠে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাবে বলেও উল্লেখ করেন বক্তারা। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ পাহাড় তথা সকল নিপীড়িত আদিবাসী মানুষের অধিকারের সংগ্রামে এযাৎকালে শহীদ হওয়া সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় পুষ্পস্তবক অর্পণের পর পরই। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র সরল ও বিপ্লবী জীবন দর্শন পাহাড়ের জুম্ম তারুণ্যকে আগামী দিনের পথ দেখাবে এই শপথ নিয়ে উক্ত আয়োজনের ইতি টানেন আলোচনা সভার সভাপতি লিটন চাকমা।

কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা সভা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পাহাড়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদের আয়োজনে বিকালে টিএসসির প্রাঙ্গনে সঞ্জীব চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় মাতৃভাষায় কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভা। উক্ত আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের বন্ধু ঢাবির নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরীন কনা। এছাড়া অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন কেদ্রীয় সংসদের সভাপতি মেহেদী হাসান নোবেল, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য চঞ্চনা চাকমা, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অলীক মৃ এবং পিসিপির ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রেঙ ইয়ং ম্রো প্রমুখ। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, চাক, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যাসহ বিভিন্ন আদিবাসী ভাষার কবিতা পাঠের পাশাপাশি বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনের উপর চলে বক্তাদের আলোচনা।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অলীক মৃ বলেন, বর্তমান তরুণ ছাত্র সমাজকে অবশ্যই এম এন লারমাকে পাঠ করতে হবে। তাঁর সশস্ত্র লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়নের কথাও তুলে ধরেন এই ছাত্র নেতা।

মেহেদী হাসান নোবেল বলেন, ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে যেসব মানুষদের জন্য গর্ব করি তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ছাত্র রাজনীতির অধ্যায় শেষ করে তিনি নিজ জাতিসত্তার মুক্তির লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন যা বিরল বলে উল্লেখ করেন এই ছাত্র নেতা। একজন বিপ্লবী নেতার যেসব গুণ থাকা জরুরী যেসবের সবকিছুই তিনি ধারণ করেন বলেও যোগ করেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি।

চঞ্চনা চাকমা বলেন, তরুণদেরকে অবশ্যই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নারী অধিকারের জন্য সোচ্চার ছিলেন বলেও দাবি করেন তিনি। বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নারীদের নিয়ে বলা– 'সমাজে একজন পুরুষ যে অধিকার ভোগ করবে একজন নারীও একই অধিকার ভোগ করবে' বলে স্মরণ করেন এই নারী নেত্রী।

রেঙ ইয়ং ম্রো আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে মহান নেতা এম এন লারমার দূরদর্শীতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর দেয়া সংসদীয় বিতর্কে মাঝি-মাল্লা, কামার-কুমোর, কৃষক শ্রমিক এমনকি পতিতার অধিকারের কথা যে তিনি বলেছিলেন তাঁর কথার প্রতিফলন যদি বর্তমান সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণীতে থাকতো তাহলে আজকের মত দুর্নীতি ও লুটপাটে ছেয়ে যেতো না দেশ বলেও মত দেন এই ছাত্র নেতা।

এছাড়া সভার প্রধান অতিথি ঢাবির নৃবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরীন বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন মানবিকতাবোধে উদ্দীপ্ত একজন মানুষ। তিনি তাঁর জনগোষ্ঠীর যে স্বীকৃতি তৎকালীন সংবিধানে চেয়েছিলেন তা বুঝতে পারেননি তৎকালীন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা। এদেশ বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির মানুষের দেশ বলে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দর্শন হতে পারে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সকল তরুণের পাঠেয়। পাহাড়ে চলমান নির্যাতন নিপীড়ন অবসানের জন্য সরকারকে আরো সংবেদনশীল হওয়ারও আহ্বান জানান বিশিষ্ট এই লেখিকা।

জুম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক জশোয়া দেওয়ানের পরিচালনায় এবং সভাপতি পরেশ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উক্ত কবিতা পাঠ এবং আলোচনা সভার স্লোগান ছিল– 'লারমা তোমার চেতনা, হারিয়ে যেতে দেব না।'

পিসিপির উদ্যোগে ঢাকায় নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)-এর টিএসসি মিলনায়তনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ঢাকা মহানগরের উদ্যোগে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাবিসহ ঢাকাস্থ বিভিন্ন পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান এবং এ উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমদ। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাবির সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. খায়রুল চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য অনন্ত বিকাশ ধামাই, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অলীক মৃ এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় স্কুল ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক পলাশ চাকমা প্রমুখ।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেঙ ইয়ং ম্রো এর পরিচালনায় এবং সভাপতি নিপন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে উক্ত আয়োজনে শুরুতেই জাতীয় সংগীত ও সংগঠনের দলীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়া নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন ঢাবির তৃতীয় বর্ষের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী রাতুল তঞ্চঙ্গ্যা এবং নবীনদের পক্ষে মানপত্র গ্রহণ করে স্বীয় অনুভূতি ব্যক্ত করেন ঢাবির অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী দনওয়াই ম্রো।

দনওয়াই ম্রো তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, "আমি এমন এক প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদ থেকে উঠে এসেছি যেখানে এতবড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার স্বপ্ন দেখাটা খুবই অবান্তর ছিল। পরিবার থেকে দীর্ঘ ১২ বছর দূরে থেকে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এতদূর আসতে সক্ষম হয়েছি"। পাহাড়ের বাতিঘর খ্যাত 'মোনঘর' থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ের এই মেধাবী শিক্ষার্থী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিসিপির কেন্দ্রীয় স্কুল ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক বলেন, পাহাড় আগের যেকোনো সময়ের চাইতে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই ক্রান্তিকালীন সময় থেকে উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন নবীন তারুণ্যের দ্রোহী প্রতিরোধ। তিনি নবীন শিক্ষার্থীদেরকে পড়ালেখা শেষে বিবর্ণ পাহাড়ে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এছাড়াছা বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অলীক মৃ বলেন, শাসকগোষ্ঠী পাঠ্য-পুস্তকে আদিবাসীদের সহজ-সরল বলে তুলে ধরে। কিন্তু সবচেয়ে দমন-পীড়ন জারি রাখে এই আদিবাসীদের উপর। তিনি আদিবাসী শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের দেশ ও জাতির কান্ডারী হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান।

অন্যদিকে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য অনন্ত বিকাশ ধামাই বলেন, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়াশুনা করা জুম্ম শিক্ষার্থীদের প্রধান লক্ষ্য কেন শুধু বিসিএস হবে। যেখানে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা নাসা থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন প্লাটফর্মে নিজেদের মেধা এবং যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন সেখানে পাহাড়ের জুম্ম শিক্ষার্থীরা কেন এই সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। তিনি নবীন শিক্ষার্থীদেরকে পাহাড়ের সংকট উত্তরণে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে ঢাবির সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. খায়রুল চৌধুরী বলেন, 'জাতিভেদ একটি ঐতিহাসিক বিকাশ। জাতিরাষ্ট্র গঠনের সাথে সাথে পৃথিবীর মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি এবং রাষ্ট্রবিহীন জাতি। এই রাষ্ট্রবিহীন জাতির মানুষরাই হল আদিবাসীরা।' এছাড়া তিনি বলেন, ১৮৬০ সালের আগে পাহাড়ে কোনো 'রাষ্ট্র' ছিল না। তিনি সাম্প্রতিক জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আরো বলেন, বিশ্বের আদিবাসীরা টিকে না থাকলে বিশ্ব যেমন টিকবে না তেমনি বাংলাদেশের আদিবাসীরা টিকে না থকলে বাংলাদেশও টিকে থাকতে পারবে না। আদিবাসীদের জীবনের লড়াইয়ে সমগ্র মানব জাতির টিকে থাকার লড়াই বলেও উল্লেখ করেন বিশিষ্ট এই আদিবাসী গবেষক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. নাসরীন আহমদ বলেন, পাহাড় থেকে উঠে এসে যারা এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পড়ে তাদের দায়টা একটু বেশি। কাজেই পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা যারা ঢাবিতে এবং ঢাকাস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে তাদেরকে কেবল মাত্র বিসিএস-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রাখতে হবে। স্বপ্ন দেখেই এতদূর আসতে পেরেছে বলে দাবি করে তিনি নবীন শিক্ষার্থীদেরকে স্বপ্ন হারিয়ে না ফেলার অনুরোধ জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি নিপন ত্রিপুরা'র সমাপনি বক্তব্যের পরপরই ঢাবি জুম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ এবং ঢাকাস্থ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জুম্ম শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। 'ঘুনধুম থেকে ধুধুকছড়ার বিবর্ণ পাহাড়ের ডাক, প্রতিরোধের মশাল হোক জুম নবীনের হাঁক' এই স্লোগানে অনুষ্ঠিত হওয়া উক্ত আয়োজন সমাপ্ত হয় শতাধিক নবীন জুম্ম শিক্ষার্থীকে ফুল এবং ক্রেস্ট বিতরণের মধ্য দিয়ে।

> গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। ...আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ—কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। আমি আজ কামনা করি, তাই হোক।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

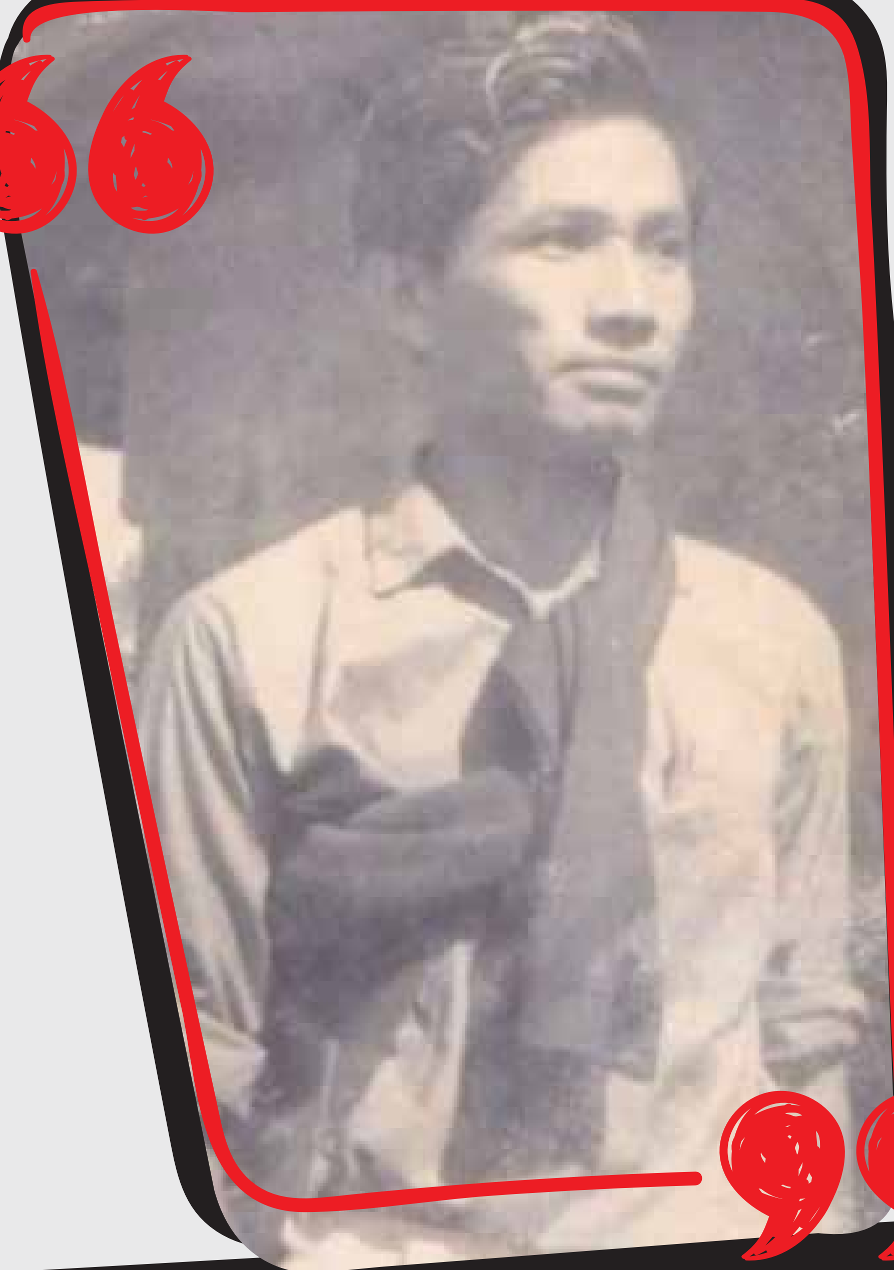

আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই গণপরিষদ-এ এইভাবে গৃহীত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে, সে আপত্তি হল, আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না।

–মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.info@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা